মিত্র-ঘোষ পেপার-ব্যাক ক্লাসিকস

পথে প্রবাসে

অন্নদাশঙ্কর রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬০

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও উপেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস, ১৬ ভীম ঘোষ লেন,
কলি-৬ হইতে সত্যহরি পান কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন
অজিত গুপ্ত

উৎসর্গ

শ্রীসরলা দেবী

আয়ুষ্মতীষু

এই গ্রন্থের রচনাস্থল ইউরোপ ও রচনাকাল ১৯২৬-২৯। পরে পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি যার ফলে এক বয়সের রচনা অন্য বয়সের রচনায় পর্যবসিত হতে পারে।

একজন অপরিচিত লেখকের রচনা পত্রস্থ করে "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাকে পাঠকসমাজে পরিচিত হতে দেন এবং শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় সেটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে লেখককে নিশ্চিন্ত করেন। আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিকা লিখে দেন কথাগুরু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। এই তিনজনের কাছে লেখক চিরকৃতজ্ঞ।

"বিচিত্রা"য় প্রকাশিত প্রথম কিস্তি নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ষষ্ঠ সংস্করণে সেটি "পূর্বকথা" রূপে সংযোজিত হয়।

ভূমিকা

আমি যখন "বিচিত্রা" পত্রিকায় প্রথম 'পথে প্রবাসে' পড়ি, তখন আমি সত্য সত্যই চমকে উঠেছিলুম। কলম ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও পারে না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই মনে হয় যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে। এ গদ্যের কোথাও জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আমরা যারা বাঙলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, আমরা জানি যে, ভাষাকে যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কতদূর আয়াসসাধ্য। সুতরাং এই নবীন লেখকের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ ভাষার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন যে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই সমান সজাগ, আর তাঁর চোখে ও মনে যখন যা ধরা পড়ে তখনই তা ভাষাতেও ধরা পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে, এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই খোলা, আর প্রবাসে গিয়ে তাঁর চোখ কান মন আরও বেশ খুলে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন—"আমার চোখজোড়া অশ্বমেধ ঘোড়ার মতো ভূ-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।" তিনি চোখ বুঁজে পৃথিবী ভ্রমণ করেন নি, তার প্রমাণ 'পথে প্রবাসে'র পাতায় পাতায় আছে। আমরা, অর্থাৎ এ যুগের ভারতবাসীরা অর্ধসুপ্ত জাত, আমরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে আসি, আর কিছুদিন থেকে চলে যাই। মাঝামাঝি সময়টা একরকম ধ্যানস্তিমিত লোচনেই কাটাই। এর কারণ নাকি আমাদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য। আমাদের এই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন :

"চুপ করে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ করে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো"—কিন্তু এ ভালো তিনি চাননি, কারণ তিনি বৈরাগ্যবিলাসী নন। এর ফলে তাঁর

'পথে প্রবাসে'র মধ্যে থেকে, "মানবমানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক, কত ভঙ্গীর সাজ, কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ" পাঠকের চোখের সুমুখে আবির্ভূত হয়েছে।

শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে—"নতুন দেশে এলে কেবল যে সব ক'টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা নয়; সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে, তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট্ করে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না।"

সমগ্র 'পথে প্রবাসে' এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইউরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখকের মন বিশেষ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। এর কারণ, ইউরোপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ। আর যিনি কখনো ও-দেশে গিয়েছেন, তাঁর কাছেই এ সত্য ধরা পড়েছে যে, সে দেশটা ঘুমের দেশ নয় মহাজাগ্রত দেশ। জাগরণ অবশ্য প্রাণের ধর্ম, আর তার বাহ্যলক্ষণ হচ্ছে দেহ ও মনের সক্রিয়তা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা দেশের বিষয়ে বলেছেন যে, এ দেশটা স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতিদিয়ে ঘেরা। এক কথায় যদি ইউরোপের বর্ণনা করতে হয় ত বলতে হয় যে সে দেশটা গতি দিয়ে তৈরি আশা দিয়ে ঘেরা।

প্রথম বয়সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সব তাজা থাকে, আর যখন মন বাইরের রূপ বাইরের ভাব স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে গ্রহণ করতে পারে, তখন ও-দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যেটা আমাদের দেশের যুবকরা সব প্রথম মনে ও প্রাণে অনুভব করে, সে হচ্ছে ও-জগতের প্রাণের লীলা। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে তারপর ইউরোপে পদার্পণ করি তখন আমারও মন এই বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেয়।" শ্রীমান অন্নদাশঙ্করের একটি কথায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়, কারণ আমাদের লুপ্তপ্রায় পূর্বস্মৃতি সব আবার স্বরূপে দেখা দেয়—

"ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত

থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।" আজকালকার ভাষায় যাদের তরুণ বলে, তাদের মন এর প্রতি কথায় সাড়া দেবে। কারণ সে হচ্ছে যথার্থ তরুণ, যার হৃদয়মন সহজে ও স্বচ্ছন্দে যা স্বাভাবিক, তাতে আনন্দ পায়। অর্থাৎ যারা কোন শাস্ত্রের আবরণের ভিতর থেকে দুনিয়াকে দেখে না, সে শাস্ত্র দেশীই হোক্ আর বিলেতিই হোক্: শঙ্করের বেদান্তই হোক্ আর Karl Marx-এর Das Kapital-ই হোক্। শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর আমার বিশ্বাস বিলেত নামক দেশটা চোখ চেয়ে দেখেছেন, পুস্তকের পত্র-আবডালের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখেন নি। এর ফলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যথার্থ সাহিত্য হয়েছে।

'পথে প্রবাসে'র ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখতে বসেছি দু-কারণে। বাঙলায় কোন নতুন লেখকের সাক্ষাৎ পেলেই আমি স্বভাবতঃই আনন্দিত হই। বলা বাহুল্য যে যিনি নতুন লিখতে আরম্ভ করেছেন তিনি নতুন লেখক নন। যিনি প্রথমতঃ লিখতে পারেন, আর দ্বিতীয়তঃ যাঁর লেখার ভিতর নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ আছে, তিনি যথার্থ নতুন লেখক। 'পথে প্রবাসে'র লেখকের রচনায় এ দুটি গুণই ফুটে উঠেছে। আমরা, যারা সাহিত্য-জগতে এখন পেন্‌সন্‌-প্রার্থী—আমরা যে নতুন লেখকদেরও যথার্থ গুণগ্রাহী, এ কথাটা পাঠকসমাজকে জানাতে পারলে আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি সত্য সত্যই চাই যে বাঙলার পাঠকসমাজে এই বইখানির প্রচার ও আদর হয়। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত যে একখানি যথার্থ সাহিত্যগ্রন্থ এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যরসের রসিক মাত্রেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। তবে আমি আশা করি যে, ও রসে বঞ্চিত কোনও প্রবীণ অথবা নবীন পাঠক পুস্তকখানিকে শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করবেন না, কারণ, তা করলেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া হবে। পৃথিবীতে জলবুদ্বুদের ন্যায় নানা মত উঠছে ও মিলিয়ে যাচ্ছে। মনোজগতের এই জাতীয় মতামতের উত্থানপতনের ভিতরও অপূর্ণতা আছে। কিন্তু এই সব মতামতকেই মহাবস্তু হিসাবে দেখলেই তা সাহিত্যপদভ্রষ্ট হয়ে শাস্ত্র হয়ে পড়ে। মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নেই, যদি না সে-মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ

পাওয়া যায়। আর এ লেখকের মতামতের পিছনে যে একটি সজীব মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

॥ ১ ॥

বাংলা ভাষায় সার্থক ভ্রমণ-কাহিনী খুব বেশি নেই। তার কারণ কী, বলা কঠিন। একালের বাঙালীকে ঘরকুনো অপবাদ দেওয়া যায় না। এদেশে ইংরেজ শাসন পত্তন হয়েছিল বাংলা বোম্বাই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। তার মধ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল প্রধান। এখানেই ছিল গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের সদর দফতর। কলকাতা বহুকাল ছিল বৃটিশ-শাসিত ভারতের রাজধানী। ১৯১১ সালে রাজধানী উঠে যায় দিল্লীতে। তার পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা ও বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রাধান্য ছিল অবশ্যস্বীকার্য। ইংরেজের সঙ্গে বাঙালী কোথায় না গেছে! ইংরেজ যেমন যেমন ভারত-বর্মা-আফগানিস্তান-মালয় দখল করেছে, বাঙালীও তেমন তেমন ইংরেজ অনুচর হয়ে ঐ সব অঞ্চলে থানা গেড়েছে। বাঙালী ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল আর যুদ্ধের সরবরাহ বা কমিসারিয়েট-বিভাগের কেরানী ভারতের সর্বত্র পৌঁছেছে। আর যেখানেই গেছে সেখানেই গড়েছে একটি করে কালীবাড়ী। গত শতাব্দীর বাঙালীকে তাই ভারতের সব মুল্লুকে দেখতে পাওয়া যেত। ঐ সব এলাকায় বাঙালী নিছক পরিব্রাজক হয়ে যায়নি, গিয়েছিল ইংরেজ অনুচররূপে। তবু নতুন দেশ নতুন লোক-সমাজ নতুন পরিবেশ তাকে আগ্রহী আর উৎসুক করে তুলেছিল। এই শ্রেণীভুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চীন-ভ্রমণবৃত্তান্ত তার পরিচয়স্থল।

উনবিংশ শতকের বাঙালী সাহিত্যে অনেক নতুন পথের সন্ধান দিল। খুলে দিল অনেক নতুন দরজা। মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, সনেট, ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসন, উপন্যাস, ছোটগল্প, গুরুপ্রবন্ধ, লঘু নিবন্ধ, ব্যক্তিক গদ্যরচনা, কমিক নক্শা : সবই দেখা গেল গত শতকে, তদানুপাতে সার্থক ভ্রমণকাহিনীর পরিমাণ অল্প।

সার্থক ভ্রমণকাহিনী রচনা সোজা নয়। তার জন্য চাই পাকা হাত আর সজাগ দৃষ্টি। নতুন দেশে এলে ভ্রমণকারীর মন সজাগ হয়ে ওঠে, দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে পেতে চায় অভিনবকে; জীবনের নব নব আনন্দের জানলা খুলে যায়

তার সামনে। সেই আনন্দ যখন নিপুণভাবে পরিবেষিত হয়—বস্তুপিণ্ড-বর্জিত হয়ে সার পরিবেষিত হয়—তখন পাঠক হয়ে ওঠে ভ্রমণকারীর মানসসঙ্গী। কোনো নতুন শহরে বা বন্দরে বা তীর্থে ভ্রমণের পরিচয় নয় সেখানকার সুস্বাদু ভোজ্য-তালিকা, সুলভ বস্ত্র-তালিকাও নয়, বা হোটেল-বিবরণ নয়। ভ্রমণ-কাহিনী তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু। এই অতিরিক্ত তিনিই দিতে পারেন যাঁর চোখ কান থাকে খোলা, ইন্দ্রিয়গ্রাম থাকে সচেতন।

ভ্রমণকাহিনী ভ্রমণ ও কাহিনীর যোগফল মাত্র নয়, তার চেয়ে স্বতন্ত্র কিছু। এই স্বাতন্ত্র্য তার চরিত্রে, তার মেজাজে, তার উপস্থাপনায়। বাংলা ভাষায় অনেক সময় ভ্রমণকাহিনীর নামে ছদ্মবেশী কাহিনী পরিবেষিত হয়। তাকে বলা উচিত ভেজাল ভ্রমণকাহিনী। ভ্রমণের অছিলায় এক জোড়া নরনারীর হৃদয় আদান-প্রদানের বৃত্তান্তকে ভ্রমণকাহিনী বলা উচিত নয়। আবার ট্রেনের টাইম-টেবিল ধরে ধারাবাহিকভাবে স্টেশন-অনুবর্তী স্থানগুলির বৃত্তান্তও সত্যিকারের ভ্রমণকাহিনী নয়। এই সব ভেজাল ভ্রমণকাহিনীর উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে, সেগুলির উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

সার্থক ভ্রমণকাহিনী কোন্ কারণে বিরলসংখ্যক, তা এতক্ষণে আমরা অনুমান করতে পারছি।

॥ ২ ॥

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ভ্রমণকাহিনীর উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'। তাঁর রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পালামৌ ভ্রমণকাহিনী। তাঁর দৃষ্টির নবীনতা ও সজীবতা 'পালামৌ'-পাঠক পদে পদে অনুভব করেন। পালামৌ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সঞ্জীবচন্দ্র যে ছাঁদে লিখেছেন, তাতে প্রসঙ্গক্রমে আশপাশের নানা কথা এসেছে। পালামৌবাসী কোল সমাজ, আপন বাঙালী সমাজ, অরণ্যপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি, বনবাসীদের সঙ্গে বনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, লেখকের সংস্কার-মুক্ত রূপরসিক মন, লেখকের প্রৌঢ়জীবনের স্বগত চিন্তা—সবই এখানে স্থান পেয়েছে। সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে সঞ্জীবচন্দ্রের মন, যা নতুন জায়গায় সচেতন ও সজাগ হয়ে উঠে আনন্দ আহরণ করতে পারে।

সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন শিল্পী। তাই নিছক 'কবিত্ব' করেন নি, নিপুণ অনিবার্য রেখাপাতে একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। লাতেহার পাহাড়ের বর্ণনাটি তার পরিচয়স্থল :

'নিত্য অপরাহ্ণে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শতকার্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম! চারিটা বাজিতে আমি অস্থির হইতাম। কেন কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ রোগ আমার একার নহে। যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া যে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আর একটি আছে, সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।'

এখানে কবিত্ব করার কোন প্রয়াস নেই, অথচ লেখক তাঁর প্রকৃতি-ব্যাকুলতাকে নিপুণভাবে প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। বিকেলের পৃথিবীর রং ফিরছে, এই দৃশ্য দেখার জন্য প্রত্যেক মানুষই অস্থির হয়ে ওঠে : লেখক এই জীবনসত্যকে এখানে অবলীলায় প্রকাশ করেছেন। শহরের দৈনন্দিন জীবনের নিশ্ছিদ্র অবসরহীন কর্মপ্রবাহে আমরা বিকেলে পৃথিবীর রঙ ফেরা দেখি না, একা আপন মনের মুখোমুখি হই না। তার জন্য প্রয়োজন ছুটি—দৈনন্দিন জীবনের কর্মপ্রবাহ থেকে ছুটি। সেই ছুটি আমরা পাই ভ্রমণে আর সেই ছুটি আনন্দ রূপ পায় সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্যে। এ না হলে সব আয়োজন বৃথা।

অল্প বয়সে—আঠারো-বিশ বছর বয়সে—রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন ইউরোপে। একটি সচেতন অনুভূতিপ্রবণ তরুণ মনের উপর চঞ্চল ইউরোপ যে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার পরিচয়স্থল 'য়ুরোপে প্রবাসীর পত্র' আর 'য়ুরোপ

যাত্রীর ডায়রি'। যৌবনের উন্মাদনা আর চাঞ্চল্য, প্রাণাবেগের উৎসাহ আর স্ফূর্তি শত তরঙ্গভঙ্গে প্রাচী-র প্রতিনিধি তরুণ রবীন্দ্রনাথের চিত্ততটভূমিতে আছড়ে পড়েছে, তারই প্রতিক্রিয়া এ দুই ভ্রমণকাহিনী, এ দুটির মধ্য দিয়ে আমরা এক তরুণ ভ্রমণকারীকে পাই—যাঁর মন সদাজাগ্রত, কৌতূহলী, জীবন সম্পর্কে সদাসচেতন। রবীন্দ্রনাথের সার্থক ভ্রমণকাহিনী—'ছোটনাগপুর' (১২৯২ আষাঢ়)—প্রমাণ করে লেখকের সচেতন মনের ক্রিয়া।

আসল কথা, এই জাগ্রত কৌতূহলী সদাসচেতন মন একটা সার্থক ভ্রমণ-কাহিনীর মূলে সক্রিয় থাকে। নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও তার নিপুণ রূপায়ণ ভ্রমণকাহিনীর সফলতার মূলে অনেকটা কাজ করে। সব সময় এই সব ক'টি উপাদানের সমাবেশ হয় না বলেই অনেক লেখাই সার্থক ভ্রমণকাহিনী হয়ে ওঠে না। নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র' বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিলাতের পত্র' তাই সার্থক হয়ে ওঠে নি। বরং জলধর সেনের 'হিমালয়ে' ভ্রমণকাহিনী হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে। এই লেখকের কোনো সাজ বা ঠাট নেই, আছে সহজ অন্তরঙ্গতা, আছে ঘরোয়া ঢঙ, আছে সাবলীলতা। তিনি যা দেখেছেন তা অন্তরঙ্গভাবে ঘরোয়া ভঙ্গিতে পাঠকের কাছে পেশ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে ভ্রমণকাহিনীতে ভেজাল দেখা যায়। বোধ করি তার সূচনা শরৎচন্দ্রের রচনায়, যদিচ তাঁর সে সচেতন অভিলাষ ছিল না। 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' নাম দিয়ে শরৎচন্দ্র পর্বে পর্বে উপন্যাস লিখেছিলেন; পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তার নাম হয় শ্রীকান্ত। ভ্রমণবৃত্তান্তের শিথিলগ্রথিত কাহিনীর আধারে নরনারীর প্রেমাখ্যান পরিবেষণের সেই সূচনা। পরে এই রীতি বাংলায় বহুল প্রচলিত হয়েছে। বস্তুত বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী কমই লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত তিনটি গ্রন্থ ছাড়া পরবর্তী ভ্রমণবিবরণসমূহ ('জাপানযাত্রী', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী') বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী নয়। এগুলি ডায়ারি—'সচেতন মনের অবিরাম বকুনি'। আর-এক ধরনের রচনা আছে, যা সৌন্দর্য উপভোগের ফল, বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী নয়;—যেমন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কণারক'—যা কণারকের মতোই সৌন্দর্যে মদির হয়ে

উঠেছে। একালের উৎকৃষ্ট ভ্রমণকাহিনীর উদাহরণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পথে বিপথে', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিমালয়-সম্পর্কিত ভ্রমণ গ্রন্থাবলী। প্রথমটিকে বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী বলতে অনেকেই রাজী হবেন না, কারণ এখানে মাঝে মাঝে বাস্তব ও স্বপ্ন, রিয়ালিটি ও ফ্যান্সির সংমিশ্রণ ঘটেছে। পরবর্তী লেখক দুজনের রচনা বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

॥ ৩ ॥

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' (১৯২৯) বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট ভ্রমণকাহিনী। এখানে ভ্রমণের ছলে রেলের টাইম-টেবিল ধরে দ্রষ্টব্য স্থানের বস্তুগত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নি, অথবা ভ্রমণের আড়াল দিয়ে নরনারীর প্রেমাখ্যান পরিবেষিত হয় নি। বিদেশ ভ্রমণ—বিশেষত ইউরোপ ভ্রমণ—একটি তরুণ ভারতীয় মনকে কী ভাবে বদলে দিতে পারে, তার পরিচয়স্থল এই গ্রন্থ। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল, দু বছর অন্নদাশঙ্কর আই. সি. এস. পরীক্ষা উপলক্ষে বিলাতে ছিলেন। তখন পশ্চিম ইউরোপের সকল হৃৎকেন্দ্রে তাঁর চঞ্চল উৎসুক জিজ্ঞাসু মনের স্পর্শ রেখেছেন। সেই জিজ্ঞাসা, ঔৎসুক্য ও জীবনানুরাগের রক্তিম স্বাক্ষর 'পথে প্রবাসে'।

এই দু বছরে তিনি কতটা বদলেছেন—এই প্রশ্ন গ্রন্থ-সমাপ্তে বড় হয়ে উঠেছে। বস্তুত ভ্রমণ সম্পর্কেই এই প্রশ্ন খাটে—যে কোনো স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভ্রমণ আমাদের জীবনে কোনো ছাপ রেখে যায় কিনা তা বিচার্য। পুরীতে বা দার্জিলিঙে গিয়ে অনেকে সমুদ্র বা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাস খেলে, দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত সুবিধাগুলি পেতে চায়, না পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, শেষ পর্যন্ত বাক্স গুছিয়ে ফিরে আসে কলকাতায়—এ ঘটনা বিরল নয়। সেখানেই ভ্রমণ শোচনীয়রূপে ব্যর্থ। দার্জিলিঙ বা পুরী বা কোণারক বা মহাবলীপুরম্ বা কোনো অখ্যাত সুন্দর নির্জন বিশ্রাম-নিকেতন যদি আমাদের কিছুটা না বদলে দিলো, তবে ভ্রমণে লাভ কি। অন্নদাশঙ্করের ভ্রমণকাহিনী আমাদের বদলে দেয়, ব্যাকুল করে, এখানেই এই ভ্রমণকাহিনীর সার্থকতা।

অন্নদাশঙ্কর এই পরিবর্তনের স্বরূপ ও মূল্য গ্রন্থশেষে বিচার করতে চেয়েছেন।

"ভারতবর্ষে ফিরলুম, কিন্তু এ কোন্ ভারতবর্ষ! যাকে রেখে গেছলুম সে নেই। নবীন ভারতবর্ষ আমাকে না দেখে না জেনে আমার অভাব বোধ না করে কোন্ ফাঁকে জন্মেছে ও বেড়েছে। না সে আমাকে চেনে, না আমি তাকে চিনি।......আমি তো জানি সেই আমি নই। দুটি বছরে প্রত্যেক মানুষের জীবন এক থেকে আরেক হয়ে ওঠে, প্রতিদিন দেখি বলে কোনোদিন লক্ষ্য করি নে। আমার সম্বন্ধে ওদের এবং ওদের (পুরানো বন্ধুদের) সম্বন্ধে আমার ঐ প্রতিদিন দেখাটুকু ঘটেনি বলে অন্তরে অন্তরে আমরা পর হয়ে পড়েছি। দুটো মহাদেশের ব্যবধান সেই বিচ্ছেদকে ঘোরালো করেছে। দু'বছর চোখের আড়ালে বেড়েছি, এইটে প্রধান। দু'বছর বিলেতে থেকেছি, এটা অপ্রধান।......কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইউরোপ। মাঝখানে আরব, তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্তান ইত্যাদি কত দেশ পড়ে রইল। বিধাতা কার সঙ্গে কাকে বেঁধে দিলেন।......যেদিন আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতাতে।"

'পথে-প্রবাসে' গ্রন্থে এই অভিলাষ সার্থক হয়েছে। লেখক নতুন দেশ নতুন সমাজ নতুন মানুষ দেখেছেন, তাদের থেকে নিয়েছেন জীবনের বিচিত্র বাণী, বিচিত্র অনুরাগ। বস্তুত ইয়োরোপে পৌঁছে লেখকের মন কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা গদ্যভাষার ঝরণায় অবলীলায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি চলিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু তরুণ মনের নব দেশ আবিষ্কার রূপে 'পথে প্রবাসে' গ্রন্থকে গ্রহণ করতে পারি, আবার এক অর্থে এটি লেখকেরও আত্ম-আবিষ্কার। এই যুগপৎ আবিষ্কারের বস্তু-বিবরণ নয়, সত্য-বিবরণ 'পথে প্রবাসে'। আধুনিক ইয়োরোপ ও আধুনিক ভারতবর্ষ, প্রাচীন ইয়োরোপ ও আধুনিক ইয়োরোপ, প্রাচীন ইয়োরোপ ও আধুনিক ভারতবর্ষ: নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখক তাঁর কালের চেহারাটা দেখেছেন ও দেখিয়েছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়কে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, যথার্থ নতুন লেখক। তাঁর মতে,

যিনি প্রথমতঃ লিখতে পারেন, আর দ্বিতীয়তঃ যাঁর লেখার ভিতর নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ আছে, তিনি যথার্থ নতুন লেখক।

একথা অবশ্য স্বীকার্য, এই অর্থে 'নতুন লেখক' ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায় না। পকেটে টাকা-রেলটিকিট-প্লেনটিকিট থাকলে হুট করে যে-কোনো জায়গা বেড়িয়ে আসা যায়, কিন্তু যার নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ নেই বা নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই, তার পক্ষে লেখক হওয়া পাঠকের পক্ষে বিড়ম্বনা। অন্নদাশঙ্করের 'পথে-প্রবাসে' আমাদের সেই বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছে। এই গ্রন্থে পাঠকের সঙ্গে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ ঘটে পদে পদে।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর লিখিত সাক্ষ্য আছে যে, যৌবনে পদার্পণ করার পরে তরুণ ভারতীয় যখন ইউরোপে পদার্পণ করে, তখন তার মন ইউরোপের বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' সেই বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেওয়ার পরিচয়স্থল।

অন্নদাশঙ্কর কেবল নতুন দেশ আবিষ্কার করেন নি, সেই সঙ্গে আত্ম-আবিষ্কারও করেছেন। শেষোক্ত আবিষ্কার যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি তাঁর দেশগত জীবনে। এ দুয়ের ক্ষেত্রে ইয়োরোপে যে কী গভীর পরিবর্তন ঘটেছে, লেখক বার বার সে-কথা বলেছেন। ইয়োরোপ যখন যৌবনের চর্চা করছে ভারতবর্ষ তখন বার্ধক্যের চর্চা করছে, এ সত্য আবিষ্কারে লেখক পরাঙ্মুখ নন। যৌবন বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস-স্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো নবজন্ম নিয়ে উঠে এসেছে যে জার্মানি (১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কথা), লেখক তার জীবনে দেখেছেন বসন্তের সমাগম। বসন্তের পর্যাপ্ত সমারোহ প্রকাশ পায় সংখ্যাতীত কুঁড়িতে, যার সবগুলিই ফোটে না, বেশির ভাগই ঝরে যায়। সেই ঝরে যাওয়াতেই জীবনের প্রাচুর্য। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, "লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। তবু অপরিসীম লাভ, সেই অপরিসীমতাকে বলি বসন্ত। জীবনের চেয়ে জরা ব্যাধি মৃত্যুই বেশী; তবুও অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।"

অন্নদাশঙ্কর তিরিশের দশকের ইয়োরোপের জীবনে সেই যৌবনকে প্রত্যক্ষ

করেছেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া—লণ্ডন, পারী, বের্লিন, রোম, জেনীভা, ভিয়েনা—পশ্চিম ইয়োরোপের প্রাণকেন্দ্রে তথা জীবনকেন্দ্রে লেখক ঘুরেছেন, অনুভব করেছেন তার হৃৎস্পন্দন, আপন ধমনীতে সঞ্চার করে নিতে চেয়েছেন তার শোণিত প্রবাহবেগ, ব্যগ্র দু বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন যৌবনকে।

এই ভালবাসা আর ব্যগ্রতা, কৌতূহল আর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে এক স্বচ্ছন্দ গদ্যভাষায়। বস্তুত অন্নদাশঙ্কর একালের অন্যতম কুশলী গদ্যলেখক। প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য বলে তিনি পরিচিত হতে চান। গদ্যভাষায় ভার না বাড়িয়ে ধার বাড়াতে চেয়েছেন। গদ্যের ধাবৎশক্তি, সাবলীলতা, স্বচ্ছন্দগতি তাঁর লক্ষ্য। 'পথে-প্রবাসে' তাঁর প্রথম রচনা। তাতেই তাঁর শিল্পসিদ্ধি। এ কারণেই প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রেএকঅচেনা তরুণ—অন্নদাশঙ্করকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। 'পথে প্রবাসে' কেবল চিন্তাঋদ্ধ ভ্রমণকাহিনী নয়, তা সুখপাঠ্যও বটে। এই সুখপাঠ্যতার দরজা দিয়েই লেখক পাঠকের অন্তর-মহলে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তাঁর আসনটি পাকা।

'পথে প্রবাসে'র শিল্পরীতিটিও লক্ষণীয়। সূচনায় নাটকীয় আকস্মিকতা যেমন উপভোগ্য, সমাপ্তিতে বিরহ-দীর্ণ সুরও তেমন মর্মস্পর্শী। সূচনায় বিচ্ছেদ, সমাপ্তিতে বিরহ—দুয়ে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি, কেননা ইতঃমধ্যে নবীন ইয়োরোপের স্পর্শে লেখকের নবজন্ম ঘটে গিয়েছে। সূচনায়— "ভারত-বর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।" আর সমাপ্তিতে—"আমি ভাবি আবার কবে ইউরোপের সঙ্গে মিলিত হব, কথা রাখব। দিনের পর দিন যায়। ইউরোপের স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকে। সত্যি কি কোনোকালে ইউরোপে ছিলুম?" এই স্নেহ-বিচ্ছেদ আর প্রেম-বিরহে মিলে জীবনের সম্পূর্ণতা। অন্নদাশঙ্কর তা আমাদের দিয়েছেন।

পূর্বকথা

আমার পথের আরম্ভ হলো শ্রাবণের এক মধ্যরাত্রে—তিথি মনে নেই, কিন্তু শুক্ল-পক্ষের আকাশে চাঁদ ছিল না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ঘুরে ভারতবর্ষের বাইরে আমার পথ—কটক থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লণ্ডন। বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, পূর্বঘাট পর্বতমালার ধারে ধারে, চিল্কাহ্রদের কোল ঘেঁষে, গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানু জুড়ে আমার পথ—কটক, ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াড়া, সেকেন্দ্রাবাদ, পুনা, বম্বে।

চিল্কার সঙ্গে এবার আমার দেখা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে, সুন্দরী তখন আলোর স্বপ্ন দেখ্‌ছে, তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার অঞ্জন শ্বেতাভ হয়ে আসছে।

তমালবন দেখতে পেলুম না, কিন্তু চিল্কা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত—হয়তো আরো দক্ষিণেও তালীবনের অন্ত নেই। পথের একধারে পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সব ক'টাই রুক্ষ, গায়ে তরুলতার শ্যাম প্রলেপ নেই, মাথায় নির্ঝরিণীর সরস স্নেহ নেই। পথের অন্যধারে ক্ষেত—কিন্তু বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।

প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজতে হয়। মেয়েরা তো রঙীন ছাড়া পরেই না, পুরুষেরাও রঙীন পরে, এমন দেখ্‌তে পেলুম। এদেশে অবরোধ-প্রথা নেই, পথেঘাটে সুবেশা সুকেশীর সাক্ষাৎ মেলে—"সুকেশী", কারণ এদেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না, বিধবারা ছাড়া। এদেশের জীবননাট্যে নারীর ভূমিকা নেপথ্যে নয়। দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না করে পুরুষকে সহজ হবার সুযোগ দিয়েছে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে Wordsworth-এর Lucy যেমন ফুলের মতো ফুটেছিল, মুক্ত সমাজের কোলে মানুষও তেমনি মাধবী লতার মতো সুন্দর এবং সহকারের মতো সবল হতে পায়। বদ্ধ সমাজের অর্ধজীবী নারী-নর এহেন সত্য অস্বীকার করবে জানি,

কিন্তু এদেশের লোককে তর্কের দ্বারা বোঝাতে হবে না যে, মানুষ মানে পুরুষ ও মানুষ মানে নারী। নারীকে নিজের কাছে দুর্লভ করে আমরা উত্তর ভারতের লোক নিজেকে চিনতে ভুলেছি এবং যে আনন্দ আমরা হেলায় হারিয়েছি তার ধারণাও করতে কষ্ট পাচ্ছি। জন্মান্ধের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারী বোধ নেই, যা আছে তার নাম দিতে পারা যায় "কামিনী-জননী-বোধ"।

এখন যার নাম হায়দরাবাদের নিজামরাজ্য আগে তার নাম ছিল গোল-কোণ্ডা। দেশটি সুদৃশ্য নয়, সুজলা সুফলাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি প্রান্তর, কদাচ কোথাও শৈলগুণ্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত। মাঝে মাঝে দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। সন্দেহ হয় পাহাড়টাই দুর্গ, না দুর্গটাই পাহাড়। সমস্ত দেশটাই যেন একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী—জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই, পাখীপাখাল নেই। তা বলে হায়দরাবাদের লোকসংখ্যা বড় অল্প নয়—প্রায় দেড় কোটী। এর পূর্বভাগে তেলেগুদের বাস, পশ্চিমভাগে মারাঠা ও কানাড়ীদের। আর এদেশের রাজার জাত মুসলমানেরা। রেলে যাদের দেখলুম তাদের বেশির ভাগ মুসলমান। উর্দু জবান জানা থাকলে ভ্রমণের অসুবিধা নেই।

কানাড়ী মেয়েদের অবরোধ নেই। তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই মতো কঠিন খাটছে এমন দেখা গেল। পথের ধারে ক্ষেত, কিসের ক্ষেত জানিনে, ধানের নয়, জোয়ারের কিম্বা বাজ্‌রার কিম্বা অন্য কিছুর। ছাব্বিশজন পুরুষের মাঝখানে হয়তো একজন মেয়েও খাটছে, "লজ্জা সরম" নেই। নারী যে কর্মসহচরীও।

মহারাষ্ট্র পাহাড় পর্বতের দেশ—বহিঃপ্রকৃতি রুদ্র সুন্দর। নরনারীর মুখে চোখে কমনীয়তা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। বেশভূষায় নারী যেন পুরুষের দোসর। মালাবারে যেমন পুরুষেও কাছা দেয় না, মহারাষ্ট্রে তেমনি মেয়েমানুষও কাছা দেয়। ফলে, পায়ের পশ্চাদ্ভাগ অনাবৃত ও কটু দেখায়। কিন্তু নারীকে যদি পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছুটোছুটি করতে হয় তবে এ ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমেরিকায় কর্মী মেয়েরা পায়জামা পরে কাজ করে। মারাঠা মেয়েরা কর্মী-প্রকৃতি। তাদের অবরোধ নেই, তরুণীরা পায়ে হেঁটে স্কুল-কলেজে

যাচ্ছে, বয়স্করা attache case হাতে বাজার করতে বেরিয়েছেন, কত মেয়ে একাকী ট্রামে উঠ্‌ছে, ট্রেনে বেড়াচ্ছে. ভয়ডর নেই, লজ্জাসঙ্কোচ নেই, পুরুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার। পায়ে বর্মা চটির মতো হাল্‌কা খোলা চটি, পরনে নীল বা বেগুনী—একটু গাঢ় রঙের—ঈষৎ কোঁচা কাছা দেওয়া শাড়ি, পিঠের ওপর একরঙা শাড়ীর বহুরঙা আঁচল চওড়া ক'রে বিছানো, মাথায় কাপড় নেই, কবরীতে ফুলের পাপ্‌ড়ি গোঁজা কিম্বা ফুলের মালা গোল করে জড়ানো, হৃষ্টপুষ্ট সুবলয়িত দেহাবয়বে অল্প কয়েকখানা অলঙ্কার, প্রশস্ত সুগোলমুখমণ্ডলে সপ্রতিভপুরুষাকারের ব্যঞ্জনা—মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে। তন্বী ওদের মধ্যে চোখে পড়্‌ল না। কিন্তু পৃথুলাও চোখে পড়ে না। সুস্থ সবল ও সপ্রতিভ বলে এদের অধিকাংশকেই সুশ্রী দেখায়, কিন্তু "রমণীয়" দেখায় বললে বোধ হয় বেশি বলা হয়। এদের চাল-চলনে-চেহারায় পৌরুষের ছায়া পড়েছে বলে এদের নারীত্বের আকর্ষণ কমেছে এমনও বলা যায় না। পুরুষের কাছে নারী যদি কাবুলী পায়জামার ওপরে গেরুয়া আলখাল্লা ওগাড়োয়ানী ফ্যাশানের দশ আনা ছ'আনা চুলের ওপরে চিম্‌নী প্যাটার্নের সিল্ক টুপী পরে, তবু পুরুষের কাছে সে এমনি চিত্তাকর্ষক থাকবে। মারাঠা পুরুষের চোখে মারাঠা মেয়েদের যে অপূর্ব রমণীয় ঠেকে এ তো স্বতঃসিদ্ধ, আমার চোখেও তাদের নারীর মতোই ঠেকেছে। দৃষ্টি-কটু বোধ হচ্ছিল কেবল শ্রমিক-শ্রেণীর মেয়েগুলিকে; মালকোচা মারা পালোয়ানদের বুকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাপড় জড়িয়ে বাঁধলে যেমন দেখাত এদেরও অনেকটা তেমনি দেখায়। যেমন এদের ভারবহন ক্ষমতা, তেমনি এদের ছুটে চলার ক্ষিপ্রতা। আমাদের অঞ্চলের পুরুষরা পর্যন্ত এদের তুলনায় কুঁড়ে।

মারাঠা পুরুষদের বাহুবল সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধি আছে সেটা সত্য নয়, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। এদের মনের বল কিন্তু অসাধারণ। মুখের ওপর আত্মসম্মানবত্তার এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতের মধ্যে লক্ষ্য করি নি। অর্থনৈতিক জীবন-যুদ্ধে কিন্তু মারাঠারা গুজরাটীদের কাছে হট্‌তে লেগেছে। বম্বে শহরটার স্থিতি মহারাষ্ট্রেরই জিওগ্রাফীতে বটে, বম্বে শহরের জিওগ্রাফীতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি

গলির বস্তিতে আর গুজরাটের স্থিতি শড়কের চারতলায়। বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারী ঘোঘের বাসা, মারাঠা বাঘের ঘরে তেমনি গুজরাটী ঘোঘের বাসা। গুজরাটী মানে পারসীও বুঝতে হবে। পারসীদেরও মাতৃভাষা গুজরাটী। ইদানীং অবশ্য ওরা কায়-বাক্যে ইংরেজ হবার সাধনায় লেগেছে।

গুজরাটী জাতটার প্রতি আমার কেমন এক রকম পক্ষপাত আছে। শুনেছি ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই ঠিক নীচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ। গান্ধীর মতো ভাব-শিল্পী যে জাতির মনের স্তন্যে পুষ্ট সে জাতির মনকে বাঙালীমনের অনুজ ভাবা স্বাভাবিক। গুজরাটীরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে নানা দেশের ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের মনেরও আমদানী করছে এবং বিদেশী মনের সোনার কাঠি আমাদের মতো ওদের সাহিত্যকেও সোনা করে দিচ্ছে। তফাৎ এই যে, আমরা যা বইয়ের মারফৎ পাই ওরা তা সংসর্গের দ্বারা পায়।

গুজরাটী পুরুষরা যে পরম কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ এ তো আমরা দেশে থেকেও জানি, তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিদিত। গুজরাটী মেয়েদের মধ্যেও এই সব গুণ আছে কিনা জানি নে। তাদের পর্দা নেই, তবে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বলে গতিবিধির স্বাধীনতা মারাঠাদের চেয়ে কিছু কম। গুজরাটী মেয়েদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আমাদের মেয়েদের মতো, কাপড় পরার ভঙ্গীতে ইতর-বিশেষ থাকলেও মোটের ওপর মিল আছে। মারাঠা মেয়েরা সচরাচর যে অন্তর্বাস পরে তার ঝুল বুকের নিচে পর্যন্ত—কোমরের কাছটা অনাবৃত ও শাড়ি দিয়ে ঢাকতে হয়। গুজরাটী মেয়েরা কিন্তু আপাদচুম্বী অন্তর্বাস পরে তার ওপরে শাড়ি পরে। শুনেছি আমাদের মেয়েদের অন্তর্বাস পরা শুরু হয় গুজরাটেরই অনুকরণে ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নীর দ্বারা।

আমাকে সকলের চেয়ে মুগ্ধ করল গুজরাটী মেয়েদের দেহের তনুত্ব ও মুখের সৌকুমার্য। মারাঠাদের সঙ্গে এদের অমিল যেমন স্পষ্ট, বাঙালীদের সঙ্গে এদের মিলও তেমনি স্পষ্ট। তবে বাঙালী মেয়েদের দেহের গড়নের চেয়ে গুজরাটী মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস; এবং বাঙালী মেয়েদের মুখশ্রীতে যেমন স্নিগ্ধতার মাত্রাধিক্য, গুজরাটী মেয়েদের মুখশ্রীতে তেমন নয়।

পারসীরাই হচ্ছে এ অঞ্চলের Leaders of fashion। তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত। পারসী মেয়েদের জাঁকালো বেশভূষার সঙ্গে ইঙ্গবঙ্গদের পর্যন্ত তুলনা করা চলে না। অন্তত তিনপ্রস্থ অন্তর্বাস বাইরে থেকে লক্ষ্য করতে পারা যায়; প্রৌঢ়াদেরও শাড়ির বাহার আছে। মারাঠাদের যেমন আঁচলের বাহার পারসীদের তেমনি পাড়ের বাহার। হাল্কা রঙের আদর এ অঞ্চলে নেই। হাজার হাজার নানা বয়সী মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকজন কিশোরীকেই হালকা রঙের শাড়ি পরতে দেখলুম। শাদার চল্ একমাত্র গুজরাটীদের মধ্যেই পরিলক্ষ্য। বল্তে ভুলে গেছি গুজরাটী ও পারসীরা মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু ঘোমটার মতো করে নয়, খোঁপার সঙ্গে এঁটে। গহনার বাহুল্য নেই—আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলঙ্কার। পারসী মেয়েরা ইংরেজী জুতো পায়ে দেয়—গুজরাটী মেয়েরা সচরাচর কোন জুতোই পায়ে দেয় না—মারাঠা মেয়েরা চটি পরে।

বম্বে শহর কল্কাতার চেয়ে আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে সুন্দর। প্রায় চারিদিকে সমুদ্র, অদূরে পাহাড়, ভিতরেও "মালাবার হিল" নামক অনুচ্চ পাহাড়, তার ওপরে বড় বড় লোকের সাজানো হর্ম্য। শহরের রাস্তাগুলি যেন প্ল্যান করে তৈরি। বম্বেবাসীদের রুচির প্রশংসা করতে হয়—টাকা তো কল্কাতার মাড়োয়ারীদেরও আছে, কিন্তু তাদের রুচির নিদর্শন তো বড়বাজারের "ইটের পর ইট"! বম্বের প্রত্যেকখানি বাড়িরই যেন বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকেরই ডিজাইন স্বতন্ত্র। শহরটা ছবির, কিন্তু আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও বম্বে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়। বম্বের বাস্তুশিল্পের গায়ে যেন ইংরেজী গন্ধ পেলুম, তাও খাঁটি ইংরেজী নয়। তবু কল্কাতার নাই-শিল্পের চেয়ে বম্বের কানা-শিল্প ভালো।

১

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি

পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেইপদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল ; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

জাহাজে উঠে বসে দেখ্‌তে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড় ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে এটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হয়ে আলাদীনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল ফুল পাখি মানুষ হয়ে আজন্ম আমার চেতনা ছেয়েছিল, এত দিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোষ্পদের মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরব সাগর, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেনগলাধাক্কা দিতেদিতে তারচৌকাঠ পার করেদিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষা ঋতু, মনসুনের প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা লকলক করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিক কাৎ ক'রে একবার ওদিক কাৎ ক'রে যেন ফুটন্ত তেলে পাঁপরের মতো উল্টে-পাল্টে ভাজ্‌ছে।

জাহাজ টল্‌তে টল্‌তে চল্‌ল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্র-পীড়ায় প্রথমতিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারুর সঙ্গে দেখাহবার জো ছিল না,প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তাগ্রহণ করতে আপত্তিনা করলেও উদর তারক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে পড়ে পড়ে বমনেও উপবাসে দিনের পররাত রাতেরপর দিনএমন দুঃখে কাটে যে, কেউ বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ বা ভাবে মরতে আর দেরি নেই। জানিনে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি,

দুর্গানাম ক'রে কী হবে। সমুদ্র-পীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের "চয়নিকা",— মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছে করে কেবল চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে, প'ড়ে প'ড়ে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে।

সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সঙ্কল্প করে ফেল্লেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পার্‌বেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিঠে চ'ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্র পথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেল্লুম মার্সেল্‌সে নেবে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়্‌লুম তখন সমুদ্র-পীড়া বাসি হয়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও প'ড়ে গেছে; তখন না মনে পড়্‌ছে দেশকে, না ধারণা কর্‌তে পারা যাচ্ছে বিদেশকে; কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি; কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছিনে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চল্‌তেই ইচ্ছা করে, কোথাও থাম্‌বার বা নাম্‌বার সংকল্প দূর হয়ে যায়।

বিগত ও আগতের ভাবনানা ভেবে উপস্থিতের ওপরে দৃষ্টি ফেল্লুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পান্থশালাটায় মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া-শোওয়া লেখা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে-কোনো বড় হোটেলে থাকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড় নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিন্ধু-জননীর দোল খেয়ে মনে হয় খোকাদের মতো দোলনায় শুয়ে দুলছি। সমুদ্র-পীড়া যেই সারল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কমল। শোবার সময়টা ছাড়া বাকী সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে কাটাতুম। ডেকে চেয়ার ফেলে ব'সে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হয়ে যায়; চারদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশেপাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ চুম্বনে জলের হৃদয়স্পন্দন।

বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্য সাগর। দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘট্‌কালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল— লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেন নি, লেসেপ্‌স্‌ তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ঐটুকুর জন্য ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা কোন্‌ যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখ্‌তে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটাতে গোটাকয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হ'তে হ'তে গত শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী স্থপতি লেসেপ্‌স্‌ একজন বিশ্বকর্মা, তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যাঁরা নিত্য স্মরণ করেন, এই ভেবে তাঁরা একটি অপরাধ মার্জনা করুন।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের যে-কোনো ছোট নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড় জোর দুখানা জাহাজ পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে, কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। কেনালটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন ক'রে লাগানো, যত্ন ক'রে রক্ষিত, অন্যদিকে ধূ ধূ করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। কেনালের

দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন যাদু আছে, দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিউবিস্ট এদের আপন খেয়ালমতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আর এক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্য সাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেড়িয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসী প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাতের ওপর ব'সে খেতে হয়, রাস্তায় চল্‌বার সময় ডানদিক ধরে চল্‌তে হয়। পোর্ট সৈয়দ হলো নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল—কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাকের টাকা আর একজনের ট্যাকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে ব'লে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র ব'লে মিশরীরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশ্‌তে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া আসা কর্‌তে পারছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপীয়দের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে।

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্য সাগরে পড়লুম। শান্তশিষ্ট ব'লে ভূমধ্য সাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন-কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্য সাগর "Honesty is the best policy" কর্‌লে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার ক'রে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হ'লেন। অধিকাংশকে মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেল্‌স্ পর্যন্ত জল ছাড়া দু'টি দৃশ্য ব্যতীত দেখ্‌বার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, ষ্ট্রম্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্‌স্ ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে। ফরাসীদের বন্দেমাতরম্ "La Marseillaise"-এর এই নগরেই

জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসী সহজিয়া কবিদের (troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence—বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্বদিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে ক'রে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেল্‌স্‌কে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাক জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেল্‌স্‌ শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে ক'রে যেতে ডানদিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁদিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেল্‌সের অনেক রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুট্‌পাথ।

মার্সেল্‌স্‌ থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

২

লণ্ডনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হলো গোধূলি লগ্নে। হ'তে না হ'তেই সে চক্ষু নত ক'রে আঁধারের ঘোমটা টেনে দিলে। প্রথম পরিচয়ের কুমার-বিস্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হয়ে যখন অধীর হয়ে উঠ্‌ল তখন মনকে বোঝালুম, এখন এ তো আমারই। আবরণ এর দিনে দিনে খুল্‌ব।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি আকাশ কলের ধোঁয়ায় মুখ কালো ক'রে ছিঁচকাঁদুনে ছেলের মতো যখন তখন চোখের জল ঝরাচ্ছে। সূর্যদেবের ঠিক-ঠিকানা নেই। সম্ভবত তিনি কাঁদুনেটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মাস্টারের ভয়ে দুষ্টু ছেলের মতো ফেরার হয়েছেন। লণ্ডনের চিম্‌নীওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে আকাশের দিকে চেয়ে হাস্‌ছে, আর যে দু-চারটে গাছপালার বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারা আমাদের অসূর্যম্পশ্যাদের

মতো চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতা খস্‌খস্‌ কর্‌তে কর্‌তে হতভাগ্য আকাশটার দিকে ছলছল চোখে তাকাচ্ছে।

ক্রমে জানলুম এইটেই এখানকার সরকারি আবহাওয়া। মাঝে মাঝে এর নিপাতন হয়, গ্রীষ্মকালে এর ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সারা শীতকালটা নাকি এমনি চলে। কদাচ কোনোদিন আকাশের উঠোন নিকিয়ে নির্মল করা হ'লে রূপালী সূর্য উঠে ধূমলা নগরীকে বলে, "গুড্‌ মর্ণিং"। অমনি ঘরে ঘরে খবর রটে, পথে পথে পথিক দেখা দেয়, চেনামুখ চেনামুখকে বলে, "হাও লাভ্‌লী! আজ সারাদিন যদি এমনি থাকে—!" মুখের কথা মুখ থেকে না মিলাতেই সূর্য বলে—এখন আসি, বৃষ্টি বলে—এবার নামি, একদল পথিক ভাবে ছাতা না এনে কী বোকামি করেছি, আরেকদল পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোট্‌খানা সঙ্গে ছিল। ইংলণ্ডের ওয়েদার এমনি খোশমেজাজী যে খবরের কাগজওয়ালারা প্রতিদিন তার ভাবী চালের খবর নেয় ও কাগজের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় সর্বোচ্চে ছেপে দেয়—কাল বাতাস প্রথমে পশ্চিম থেকে ও পরে নৈর্ঋত থেকে বইবে, ক্রমশ তার বেগ বাড়্‌বে, সূর্য গা-ঢাকা দেবে, কিন্তু বৃষ্টি জোর পড়বে না।

এ গেল লণ্ডনের অন্তরীক্ষের খবর। জলস্থলের বৃত্তান্ত বলা যাক।

লণ্ডন শহর টেম্‌স্‌ নদীর কূলে। কিন্তু গঙ্গা গোদাবরীর দেশের লোক আমি টেম্‌স্‌কে নদী বলি কেমন ক'রে? লণ্ডনের যে-কোনো দুটো চওড়া রাস্তাকে পাশাপাশি কর্‌লে টেম্‌সের চেয়ে এক এক জায়গায় কম অপ্রশস্ত হয় না। ছোট হ'লে কী হয়, নদীটি নৌবাহ্য। বড় বড় জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়, বলিষ্ঠ শিশুর তন্বঙ্গী মায়ের মতো। লণ্ডনের যোজনজোড়া জটায় জাহ্নবীর মতো এঁকে বেঁকে নির্গমের পথ খুঁজছে, পিছু হট্‌ছে, মোড় ফির্‌ছে। শহরের বাইরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন, তার ফুল সবুজ মখমলে মোড়া। কিন্তু শহরের ভিতর তার জল কল্‌কাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ, কাশীর গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়। তার ধারে দাঁড়ালে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; বাতাস তো নেই, আছে ধোঁয়া। ঝাপ্‌সা চোখে দু'ধারের দৃশ্য দেখি, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ, তাদের গায়ে বড় বড় হরফে বিজলী আলোর বিজ্ঞাপন—"মদ" কিংবা "সিগারেট্‌"

কিংবা "খবরের কাগজ"। ঐ তিনটে তিন রকমের বিষ এদেশে প্রচুর বিক্রি হয়।

লণ্ডন শহর গোটা সাত আট কল্‌কাতার সমান। আয়তন ছাড়া নতুন কিছু দেখবার নেই। সেই ট্রাম সেই বাস সেই ট্যাক্সি সেই ট্রেন সেই গলি সেই বস্তি সেই মাঠ সেই প্রাসাদ। প্রভেদ এই যে, সমস্তই সুপারলেটিব, সমস্তই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতম অঞ্চলগুলিও প্রত্যেকটি যেন এক একটি দক্ষিণ কল্‌কাতা। ঐশ্বর্যে অতটা না হোক পরিচ্ছন্নতায় অতটা। এত বড় শহর, কিন্তু সেই অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়। অবশ্য কলের কর্কশ আওয়াজে বাড়ির ভিৎ পর্যন্ত নড়ে এবং মোটরের দাপাদাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড়দুড় করে, কিন্তু জনতার মুখে কথা নেই। ভিড়ের মধ্যে ফিসফিস করলেও শোনা যায়। ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁক নেই, তার চলন্ত বিজ্ঞাপন প'ড়ে বুঝতে হয় সে কী বেচতে চায় ও কত দামে। দুধওয়ালা ঘরে ঘরে দুধ বিলি ক'রে যাবার সময় এমন সুরে "milk" বলে যে, শুনলে মনে হয় কোকিলের "কু—উ"। ডাকপিয়ন কাঠ-ঠোকরার মতো দরজায় দুই ঠোক্কর দিলে বুঝতে হয় দরকারী চিঠি এসেছে, রুটিওয়ালা মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব "চি-চিং ফাঁক" আছে, সেই সংকেত শুন্‌লে বন্ধ দুয়ার আপনি খুলে যায়, অর্থাৎ বাড়ির ঝি দরজা খুলে দেয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে এখানে হাটের মধ্যে তেমন হট্টগোল নেই যেমন আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু এতটা নিস্তব্ধতা কি স্বাভাবিক, না সুন্দর? সুর করে "দই নেবে গো, মিষ্টি দই" হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে চুড়ি বাজিয়ে যাওয়া সুন্দর, না পিঠে বিজ্ঞাপন এঁটে বোবার মতো পায়চারি করা সুন্দর? এদেশে নিরক্ষরতা নেই ব'লে এদের কানের ক্লেশ কমেছে, কিন্তু চোখের জালা? বিজ্ঞাপন-ওয়ালারা যেন পণ ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঙুল গুঁজে বোঝাবে যে, বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে শুনতে।

লণ্ডনের পথে পথে রথযাত্রার ভিড়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। পুলিসের বন্দোবস্ত অতুলনীয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, পুলিসের নয়, জনতার। শৃঙ্খলা

মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে, কৌতুহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে, লাইনের পিছনে লাইন, যে লোকটা সকলের শেষে এসে পৌঁছল সে লোকটা মাত্র দুটো কনুইয়ের জোরে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না, যে আগে এসেছে সে আগে, যে পরে এসেছে সে তার পিছনে কিংবা পাশে। রেলের টিকিট করতে হবে, ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি ইতর ভাষায় গালাগালি কোনোটাই কোনো কাজে লাগবে না ; যে আগে আস্‌বে সে আগে দাঁড়াবে, তার পিছনে তার পরের। ড্রিলের ভাষায় যাকে file বলে কিংবা চলতি ভাষায় যাকে queue বলে তেম্‌নি ক'রে সকলে দাঁড়ালে পরে একজনের পর একজন টিকিট্‌ নেবে ; সিঁড়ি দিয়ে একে একে ট্রেনের কাছে যাবে, ট্রেনের থেকে যাদের নামবার কথা তারা নামলে পরে ট্রেনে যাদের ওঠবার কথা তারা উঠবে এবং জায়গা থাকে তো আগে মেয়েরা বসবে, না থাকে তো যারা আগে থেকে ব'সে আস্‌ছে তারা উঠে মেয়েদের জায়গা দিয়ে নিজেরা দাঁড়াবে। এইটুকু কর্‌তে আমাদের দেশে হাত পা মুখ কান সব ক'টা অঙ্গের কস্‌রত হ'য়ে যায়, বিশেষ ক'রে কানের। এদেশের কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে সারা হয়। ট্রেনে চ'ড়ে হনুমানজীর ভজন কিংবা পটলার মার পুনরাবৃত্ত শুনে বধির হ'তে হয় না। কিন্তু এদের এই নিঃশব্দ প্রকৃতি আমার নিছক ভালো লাগেনি। ট্রেনে পাশাপাশি বস্‌তে না বস্‌তেই দেশের কেউ-গায়ে প'ড়ে পিতৃপিতামহের নাম শুধায় না, বিয়ে হয়েছে কি না, ক'টি ছেলেমেয়ে, কত মাইনে, কত উপরি পাওনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেরা করে উত্ত্যক্ত করে না ; কিন্তু ঐ অনাহূতউপদ্রবের মধ্যে মানুষের ওপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক দাবী থাকে, অন্তরঙ্গতার দাবী, সামাজিকতার দাবী, মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব। এ দেশের লোকও ও দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর্‌তে পারে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়। "আজ দিনটা বড় ঠাণ্ডা, না?" "তা ঠাণ্ডাই বটে।" এমনি ক'রে আলাপ আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশি দূর এগোয় না, কারণ কথাবার্তার পুঁজিই হলো ওয়েদার, পুঁজি ফুরোলে নিঃশব্দে সিগারেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না। এরা বাচাল নয় বটে, কিন্তু বাক্‌পটুও নয়। কথোপকথনের আর্ট এদের অজানা।

বলেছি লণ্ডন শহরে নতুন কিছু দেখবার নেই, আয়তন সমৃদ্ধি ও সজ্জা ব্যতীত। তবু মোটাগোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না। এই যেমন মাটির নিচে টিউব বা ইলেকট্রিক রেলরাস্তা,—যেন পাতালপুরীর রাজপথ। যাত্রীরা নিচে নামছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল যাচ্ছে, ট্রেন থেকে মাটির ওপরে উঠে আপিস আদালত করছে। মাটির নিচে রেল, মাটির ওপরে ট্রাম বাস-ট্যাক্সি। কিংবা যেমন কলে পয়সা ফেল্লে সিগারেট চকোলেট সর্দি-কাশির ট্যাবলেট্ থেকে আরম্ভ করে রেলের টিকিট্ ডাকঘরের স্টাম্প স্নানের জল উনুনের আগুন পর্যন্ত আপনাআপনি হাজির হয়, যেন দেবতাদের বাহন, স্মরণ-মাত্র উপস্থিত। কিংবা উঁচুনিচু পাহাড়কাটা রাস্তা, দু'ধারে একই রঙের একই সাইজের এক এক সারি বাড়ি, একটা দেখলেই একশোটা দেখা হয়ে যায়। বাড়ির আশেপাশে হয়ত এক টুক্‌রো সবুজ, সবুজের ওপরে এক ঝলক রক্ত বা একমুঠো হরিদ্রা। কিংবা যেমন শহরের স্থানে স্থানে মাঠ, গড়ের মাঠের চেয়ে চওড়া তাদের বুক, কিন্তু তেমন চিক্কণ নয়, বন্ধুর। মাঠের কোলে কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাষায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায় দিন কাটায়। মাঠের মেঝের ওপরে সবুজ দূর্বার কার্পেট্ বিছানো, এত সবুজ আর এত প্রচুর যে, মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্‌ডিস্ জন্মায়, তখন যেদিকে চোখ ফেরাই সেদিকে সবুজ। কালো কুৎসিত চিম্‌নীর ধোঁয়ায় চোখ যখন নির্জীব হয়ে আসে তখন ঐ এক ফোঁটা সবুজ আরক তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।

লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছপালায় গহন, গাছেদের মাথায় সোনালী চুল। দুঃখের কথা এ দেশের ফুলে গন্ধ নেই। গুণ নেই রূপ আছে, ফুল নয় তো ফুলবাবু। তাই হাওয়াফুলের গন্ধে বেহোঁস হয় না, রাত ফুলের গন্ধে উতলা হয় না, মানুষের একটা ইন্দ্রিয় বুভুক্ষু থেকে যায়। মাঠ বা পার্কগুলি এদের ন্যাশনাল প্লে-গ্রাউণ্ড। সেখানে ছোট ছেলেরা গাছে ওঠে, ছোট মেয়েরা বল নাচায়, কিশোরেরা ঘুড়ি ওড়ায়, কিশোরীরা বাজি রেখে দৌড়ায়, যুবক-যুবতীরা টেনিস্ খেলে, বৃদ্ধেরা ব'সে ব'সে ঝিমায়, বৃদ্ধারা কুকুরের শিকলহাতে ঠুকঠুক্ করে

হাটে। সেখানে খোকাবাবুরা খুকুমণিরা ঠেলাগাড়িতে চড়ে দিগ্‌বিজয়ে বাহির হন, মায়েরা ঠেল্‌তেঠেল্‌তে চলেন ও চেনামুখ দেখলে ফিক্ করে হেসে ত্বটো কথা ক'য়ে নেন, বাবারা সময় ক'রে উঠতেপারলে খোকা-খুকুর সফরেমাদের সহগামী হন, এবং সেখানে যুগলের দল "আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।"

মাঠ এবং পার্কগুলিতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ বুঝতেই পারা যায় না যে লণ্ডনের ভিতরে আছি। জনসমুদ্রের মাঝখানে এগুলি এক-একটি দ্বীপ, দ্বীপের চারধারে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, সেখানে অনন্ত কলরোল। কিন্তু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছয় না, তার ত্বঃস্বপ্ন মিলিয়ে আসে, সবুজ আসন পেতে মাটি বলে, "একটু বসো", সোনালী চামর ত্বলিয়ে গাছেরা বলে, "একটু জিরিয়ে নাও"। কিন্তু লণ্ডনের মানুষকে শান্তির মন্ত্রে বশ মানানো যায় না, ত্ব'দণ্ড সে স্থির হয়ে বসতে চায় না, উদ্ভিদের মতো স্থাবর হ'তে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর। কাজ আর অকাজ তাকে নানান্ সুরে ডাকে, তার ব্যস্ততার ইয়ত্তা নেই। যেখানে সে আপিস করতে শেয়ার কিন্‌তে টাকা রাখতে যায় সেটার নাম সিটি, প্রায় হাজার ত্বয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে লণ্ডনের পত্তন হয়। সিটির পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট এণ্ড। সে অঞ্চলে লোকে বাজার করতে আমোদ করতে আহার করতে যায়, সেখানে বড় বড় দোকান বড় বড় হোটেল বড় বড় ক্লাব বড়বড় থিয়েটার সিনেমানাচঘর কনসার্ট হলচিত্রাগার মিউজিয়ম প্রদর্শনী। সিটিতে বড় কেউ বাস করে না, ওয়েস্ট এণ্ডে ধনীরা বাস করেন। দরিদ্রের জন্যে ইস্ট এণ্ড আর মধ্যবিত্তদের জন্যে শহরতলীগুলো। এগুলি মোটের ওপর নিরালা স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে এদের নগরকল্পনায় বিশিষ্টতার স্থান নেই। সবটা জুড়েছে ইউটিলিটি বা প্রয়োজনীয়তা। সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব কার না দরকার? কিন্তু সেই দরকারটা চরম হলো, সৌন্দর্য হলো অবান্তর। তাই দেখি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটী বাড়িঘর, কিন্তু রাস্তার সব কটা বাড়ি একই ধাঁচের, একেবারে হুবহু এক, যেন ছাঁচে ঢালা সীসের টাইপ। এরা সৈনিক নাবিকের

ইস্কুল থেকে ফেরে, এদের চালে চলনে উঠতে বসতে ড্রিল। তাই এদের ঘরবাড়ি-গুলো পর্যন্ত লাইন বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রেখে য়্যাটেন্‌শনের ভঙ্গীতে খাড়া, তাদের সকলের গায়ে ইউনিফর্ম, তার একই মাপ একই রঙ একই রেখা একই গড়ন। চোখের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে তাকাই আর ক্ষোভে নৈরাশ্যে মরীয়া হয়ে উঠি। শুনলুম সমগ্র ইংলণ্ড নাকি সপ্তাহের একই বারে কাপড় কাচতে দেয়, একই বারে কাপড় ফিরে পায়।

শহরের যে-কোনো রাস্তায় পা দিলে যে দশটা দোকান সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তাদের গোটা তুই মদের দোকান, গোটা তুই রেস্তোরঁা, একটা সিগারেটের, একটা জামাকাপড়ের ও একটা আসবাবের দোকান, একটা খবরের কাগজের স্টল, একটা চুল সাজাবার সেলুন, একটা ব্যাঙ্ক। এর ওপরে যদি টিপ্পনীর দরকার হয় তো বলি rum খেয়ে নাকি এরা somme জিতেছিল, তাই সোমরসের এত আদর। রবিবারেও যে তিনটি দোকান খোলা থাকে তাদের নাম মদের দোকান, সিগরেটের দোকান, খবরের কাগজের স্টল্। সিগরেট সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ওর একটা ডিবে কাছে না থাকলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না, কারুর সঙ্গে দেখা হলেই ওটা সামনে ধরে বল্‌তে হয়, "নিতে আজ্ঞা হোক্"। এ দেশের মেয়েরা যখন ভালোমন্দ উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুধর্মিণী হবেই ব'লে কোমর বেঁধেছে তখন তাদের কারুর আলতা পরা মুখে আগুন জ্বলতে দেখলে আশ্চর্য হইনে, কিন্তু কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়রা যখন স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সিগরেট লক্‌লক্ কর্‌তে কর্‌তে ভুরু কাঁপিয়ে মাথা নাচিয়ে কথা বলেন তখন রিজেণ্টস পার্কে চিড়িয়াখানার দৃশ্যবিশেষ মনে প'ড়ে যায়। দৃশ্যটা আর কিছু নয়, বাঁদরদের টি'পার্টি। মানুষকে ওরা অবিকল নকল করতে পেরেছিল, দুঃখের বিষয় তবু কেউ ওদের মানুষ ব'লে ভুল করলে না। এদিকে আমি যুবকদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি ওরা নিজেরা সিগরেট খায় ব'লে কুণ্ঠিত বোধ করে ও নিজের বোনকে খেতে দেখলে লজ্জিত বোধ করে; কিন্তু পরের বোনকে খেতে দেখলে কেমন বোধ করে এ প্রশ্নটার উত্তরে তাদের মত-বিচ্যুতি দেখা গেল। অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মন বদলায়।

রেস্তোরাঁ যে এ শহরে কত লক্ষ আছে তার গণনা চলে না। আহারের জন্যে রেস্তোরাঁ, নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট বা রুম্‌স্‌—সাধারণ গৃহস্থের জন্যে এই হচ্ছে এখানকার ব্যবস্থা। এ দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালী গড়া বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। যাদের সঙ্গতি আছে তারাও বাড়িতে না খেয়ে বাইরে খায় এই জন্যে যে সারাদিন যেখানে জীবিকার জন্যে খাটতে হয় বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে, কিংবা বাড়িতে রান্না করতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুর বাজারদর রেস্তোরাঁয় খাবার খরচের চেয়ে বেশি কিংবা বাড়িতে অল্পসংখ্যক লোকের রান্নায় যত খরচ রেস্তোরাঁয় বহুসংখ্যক লোকের রান্নায় সে অনুপাতে কম। কথা উঠ্‌বে তবে বাড়ির মেয়েরা করে কী? তার জবাব এই যে, বাড়ির মেয়েরাও আপিস করে। সকলে নয় অবশ্য, কিন্তু অনেকে। তরুণী মাত্রেই স্কুল কলেজে যায়, বয়স্কা মাত্রেরই কোনো কাজ আছে। মায়েরাও ছেলেদের স্কুলে দিয়ে কাজে যায়, তবে কোলের ছেলে হলে তার গাড়ি ঠেলে মাঠে নিয়ে যায়, খোকা যতক্ষণ হাওয়া খায়, অন্তত ফীডিং বট্‌ল্‌ চুষে দুধ খায়, খোকার মা ততক্ষণ জামা সেলাই করে। কাজ করে না, বসে খায়, এমন লোক তো দেখছিনে; যার আর কিছু না জোটে সে একটা সভা-সমিতি খুলে বসে। সে সব সভা-সমিতির উদ্দেশ্যও বিচিত্র; কোনোটার উদ্দেশ্য জবাই করবার অনিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন, কোনোটার উদ্দেশ্য সদস্যদের মৃতদেহ কবরস্থ না করে অগ্নিসাৎ করা। ভালো-মন্দ দরকারি-অদরকারি কতরকমের অনুষ্ঠান যে এদেশে আছে তার আভাস পাওয়া যায় রবিবারের দিন হাইড পার্কের বেড়ার ভিতর প্রবেশ করলে। একখানা ক'রে চেয়ার যোগাড় ক'রে তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কত বক্তাই যে ভূমিতে দণ্ডায়মান বা সম্মুখ দিয়ে চলন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে কত তত্ত্বই প্রচার করেন তার সংখ্যা হয় না। এদেশে ধর্মের হাজারো সম্প্রদায় আছে, রাজনীতির হাজারো দল আছে, বক্তৃতা দেওয়া কাজটাও কঠিন নয়, আর লোকের ভিড়ের ভিতরে এমন দশ-পঁচিশজন অথণ্ড ধৈর্যশীল সহিষ্ণু শ্রোতা বা শ্রোত্রী কি পাওয়া যাবে না যারা অন্তত পঁচিশ মিনিট বিনা পয়সায় গলাবাজি দেখবে বা নাম-সংকীর্তন শুনবে? এমনি করেই পাব্‌লিক ওপিনিয়ন

শুরু হয়। শ্রোতারা শুরু করে, চটকার দেয়, এক বক্তার লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আরেক বক্তা উল্টো বক্তৃতা শোনায়, তবু সে বক্তার মেজাজ তরুর চেয়ে সহিষ্ণু ও সংকল্প মেরুর মতো অটল, একটিও যদি শ্রোতা না রয় তবু তার বাক্যের ফোয়ারা ফুরোবে না। হাতে কোনো একটা কাজ না থাক্‌লে যেন এরা বাঁচতে পারে না, জীবনটা ফাঁকা ঠেকে। চুপ ক'রে বসে থাকা এদের ধাতে সয় না, তাই ছুটি পেলে এরা বড় বিব্রত হয়ে ভাবে ছুটি কেমন করে কাটাবে। ভিক্ষা করা এদেশে আইনবিরুদ্ধ, করলে কঠিন সাজা। তাই ভিক্ষুকেরাও কোনো একটা কাজ করবার ভান ক'রে পয়সা রোজগার করে, হয় দু'পয়সার দেশলাই চার পয়সায় বেচে অর্থাৎ বেচবার ভান ক'রে হাত পাতে, নয় ফুটপাতের ওপরে ছবি এঁকে পথিকদের সামনে টুপী খোলে, নয় কিছু একটা বাজিয়ে বা গেয়ে দাতাকে খুশি করে, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না যে "ভিক্ষা দাও", বল্লেই পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। এত কথা এ প্রসঙ্গে বলবার উদ্দেশ্য, এরা কাজ জিনিসটাকে কী চক্ষে দেখে তাই বোঝানো। নিষ্ক্রিয়তাকে এদেশে ধর্ম বলে না।

জামাকাপড়ের দোকানের এত বাহুল্য কেন? একটা কারণ, শীতের দেশের মানুষ কম্বল সম্বল ক'রে ধুনী জ্বালিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে পরকালের ধ্যান করলে পরকালের দিন ঘনিয়ে আসে, দেহ সম্বন্ধে নির্বিকল্প হলে দেহীমাত্রেই বরফ হয়ে যায়, তাই পথের ভিখারীরও গায়ে ওভারকোট ও পায়ে বুটজুতো চাই। মেয়েরা স্কার্ট হ্রস্ব ক'রে ও গলা খোলা রেখে পরিধেয় সংক্ষেপে পরেছে বটে, তবু ওদের পরিধেয় শুধু একখানা শাড়ির মতো সরল নয়। আর একটা কারণ, আংটি বা হার বা দুল ছাড়া অন্য অলঙ্কার বড় কেউ পড়ে না, তাই ভূষণের রিক্ততার ক্ষতি পূরণ করতে হয় বসনের বাহারে। একটু আগে বলেছি এদের নগরস্থাপত্যে বিউটির চেয়ে বড় কথা ইউটিলিটি। এদের বেশভূষা সম্বন্ধেও ওকথা সমান খাটে। মেয়েরা এখন কাজের লোক হয়েছে, গজেন্দ্রগমনে চল্‌লে ট্রেন ফেল ক'রে আপিস কামাই করে বস্‌বে সেই আশঙ্কায় পক্ষিরাজের মতো মাটি ছুঁয়ে ওড়ে, ছুটে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনের ওপরে লাফ দিয়ে ওঠে, জায়গা পেলে বসে, না পেলে দাঁড়ায়, এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট না ক'রে খবরের কাগজ কিংবা গল্পের বই বার ক'রে

উঠে কোমর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। দম আটকাবার ভয়ে গলার ফাঁস খুলতে খুলতে আবক্ষ বিস্তৃত হচ্ছে। স্নান-প্রসাধন সুখকর হবে ব'লে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে শরীর হাল্কা লাগছে, প্রতি অঙ্গে বাতাস লাগ্ছে, স্বাস্থ্য ভালো থাকছে, স্বাস্থ্যজনিত শ্রীও বাড়্ছে, এক কথায় স্ত্রীজাতির তথা সমাজের বৃহত্তর উপকার হচ্ছে, ইউটিলিটির দিক থেকে জয়জয়কার। এবং এর দরুন মেয়েরা যে সেক্স্‌লেস্ বা পুরুষালী হয়ে উঠেছে এমনও নয়। নারীর নারীত্বও যে সাগরতলের চেয়েও অতল; পরিবর্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদ্‌বুদ, কোনো কালেই তা অতলস্পর্শ হ'তে পারে না; বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মন্থন করেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়তে পারা যায় তার সুধা আর তার বিষ।

পরিবর্তনকে আমি দোষ দিইনে, আর ইউটিলিটিকে আমি মহামূল্য মনে করি। তবু আমার ধারণা, এ যুগের নারীর পরিচ্ছদ যদি এ যুগের নারীর প্রতিবিম্ব হয় তবে বিম্ব দেখে বলতে পারি বিম্ববতী সুন্দরী নয়। নারীত্বের বিষ যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সুধাও যাচ্ছে। পরিচ্ছদকে উপলক্ষ্য ক'রে এত কথা বলবার অভিপ্রায়—পরিচ্ছদ তো কেবল নগ্নতার আচ্ছাদন বা শীত বর্ষার বর্ম নয় যে, তার প্রয়োজনীয়তাই তার পক্ষে চূড়ান্ত হবে; পরিচ্ছদ যে দেহেরই সম্প্রসারণ, দেহের বহির্বিকাশ; দেহের চারপাশে সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল। এরা জীবনকে ব্যস্ততায় ভ'রে এমন সংক্ষিপ্ত ক'রে আন্ছে যে, মানুষের মনের আর সে অবসর নেই যে-অবসর নইলে মানুষ নিজের পরিমণ্ডল নিজে রচনা করতে পারে না। তখন ডাক পড়ে পোশাক-বিক্রেতার, আপিসের পোশাক-ডিজাইনারকে এবং পোশাক-বিক্রেতার দোকানের ম্যানীকিন্‌দের। গণতন্ত্রের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে, আর গণতন্ত্রের রুচি বন্ধক দেওয়া হয়েছে লার্জ স্কেল্ ম্যানুফ্যাক্চার-ওয়ালাদের কাছে। যখন দেখি আজানুলম্বিত আলখাল্লার মতো লোমশ ওভারকোটের অন্তরালে নারীদেহের contour (রেখাভঙ্গী) ঢাকা পড়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল কচ্ছপের খোলের ভিতর থেকে বা'র করা আজানু

স্তম্ভের ওপরে কালো বা মেটে রঙের একটি বস্তা উপুড় করা হয়েছে, সেই বস্তার পৃষ্ঠভাগ একেবারে প্লেন্,তার কোথাও একটা রেখা বা একটা বন্ধনী নেই, কটির স্থিতি যে কোনখানে আর পরিধি যে কতখানি তা অনুমান করে নিতে হয়।

পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, কারণ পুরুষ চিরকাল কাজের লোক, সে যে ইউটিলিটি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে এত বড় প্রত্যাশা তার কাছে করা যায় না। মজার কথা এই যে, নারীর পোশাক যত সরল হচ্ছে পুরুষের পোশাক তত জটিল হচ্ছে; তার আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে মোড়া, সে-পোশাকের স্তরের পর স্তর, আণ্ডার ওএয়ারের ওপরে আণ্ডার ওএয়ার, কোটের ওপরে ওভারকোট্, জুতোর ওপরে স্প্যাটস্, টাই-কলারের ওপরে মাফলার!

শীতের দেশের লোককে বিছানা পুরু করবার জন্যে লেপ কম্বলের বহুল আয়োজন কর্‌তে হয়, আর ইউরোপীয়পরিচ্ছদ পরে মেজের ওপরে শোওয়া বসা চলে না ব'লে খাট পালঙ্ক কৌচ সোফা চেয়ার টেবিল দরকার হয়। এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড, হাতমুখ ধোবার সরঞ্জাম, প্রসাধনের আয়না-দেরাজ, রান্নার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরীব-দুঃখীরও চাই। দেশে আমাদের বাড়ির ঝি বারান্দার ছেঁড়া মাদুর পেতে গায়ে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়েশীতের দিনে ঘুঁটের আগুনপোহায়। এখানে আমাদের বাড়ির ঝির জন্যে স্বতন্ত্র ঘর, ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ওয়াল-পেপার আঁটা, লোহার খাটে আধ ফুট পুরু বিছানা, ঘরের একপাশে অগ্নিস্থলী, সেখানে কয়লা পোড়াতে হয়, একপাশে টেবিল চেয়ার আয়না দেরাজ আল্‌না, ওপরে ইলেকট্রিক আলো ও জানলায় নক্সাকাটা পর্দা। এই জন্যেই এদেশে আসবাবের দোকান এত। দোকান থেকে আসবাব ভাড়া ক'রে আনতে হয় কিংবা কিনে এনে মাসে মাসে দামের ভগ্নাংশ দিতে হয়। আসবাব সম্বন্ধেও ইউটিলিটির সঙ্গে বিউটির ছড়াছড়ি। সৌষ্ঠব আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য নেই, বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু কলে-তৈরি প্রাণহীন বৈচিত্র্য। যন্ত্ররাজ বিভূতির কল্যাণে একালের রামশ্যামও সেকালের রাজরাজড়াদের চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু

রামের সঙ্গে শ্যামের এখনএকতিলও তফাৎ নেই; রামের নাম ৪৬৩ তো শ্যামের নাম ৪৭ক ; নামের তফাৎ নেই, সংখ্যার তফাৎ। "কলি" যুগ বটে !

আমাদের বাড়ির ঝি ফুরসৎ পেলেই খবরের কাগজ পড়ে, কোনো কোনো দিন খাবার সময়, কোনো কোনো দিন পরিবেশন করবার ফাঁকে। এই থেকে বুঝতে হয় এদেশের খবরের কাগজের কেমন প্রচার ও প্রভাব। যে কাগজ আমাদের ঝি পড়ে সেকাগজে গুরুগম্ভীর লেখাথাকে না, তার সম্পাদকীয়প্রবন্ধ আধ কলমও নয়, সম্পাদক মহাশয় হাল্‌কা সুরে গ্রেহাউণ্ড রেসিং বা শরৎকালের ফ্যাসন সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে আমাদের ঝি-ঠাক্‌রুণের সন্তোষবিধান করেন, উঁচুদরের রাজনৈতিক চাল বা অর্থনৈতিক সমস্যার ধার দিয়েও যান না, সংবাদের কলমে থাকে খেলাধুলা, ঘোড়দৌড়, চোরডাকাত, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ ইত্যাদি চটকদার ও টাট্‌কা খবর। আদালতে কে কেঁদেছে, এরোপ্লেনে কে হেসেছে, থিয়েটারে কে নেমেছে তাদের ফটো তো থাকেই, সময় সময় তাদের সঙ্গে "আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি"র সাক্ষাৎকারের লোমহর্ষণ বিবরণথাকে। আমাদের দেশের কাগজের সঙ্গে এদেশের কাগজগুলোর মস্ত একটা তফাৎ এই যে, এদেশের কাগজে গালাগালি থাকে না ; ক্যাথরিন মেয়োর ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে বেশ্যা ব'লেগালাগাল দেওয়াটা ইতরতা। অমন ইতরতা এদেশের কাগজওয়ালারা এদের প্রধানতম শত্রুদের বেলাও করে না। পাঞ্চ্‌ কাগজখানার পেশাই হচ্ছে ভাঁড়ামি, কিন্তু সে ভাঁড়ামির মধ্যে অশ্লীলতা থাকে না। এদেশে ক্যাথরিন মেয়োর যারা প্রশংসা গেয়েছে তারা স্পষ্ট ক'রে বলতে ভোলেনিযে,লেখিকা ইংরেজ নয়, আমেরিকান, এবং অনেকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ লেখক হ'লে কুরুচিপরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলি ভাবে উল্লেখ করত না। বাস্তবিক, অশ্লীলতা সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির একটা স্বাভাবিক ভীরুতা আছে,তাই এদেশের খবরের কাগজে কেলেঙ্কারির বর্ণনাটাও নিচু গলায় হয়। মোট কথা, রেস্‌পেকটেবল্‌ ব'লে গণ্য হবার জন্যে এদেশের "ইতরেজনাঃ"র একটা ঝোঁক আছে, তাই ডেলী হেরাল্ড্‌কেও টাইম্‌সের আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। আমাদের ঝিঠাক্‌রুণের শ্রেণীর মেয়েরাও মনে মনে এক একটি লেডী।

ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা কমেছে, কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এদেশ কুলীনকে অন্ত্যজ না করে অন্ত্যজকে কুলীন ক'রে তুলছে!

এর পরের প্রসঙ্গ, চুল সাজাবার সেলুন। এই জিনিসটা আগে এদেশে পুরুষদের জন্য অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং সংখ্যায় অর্ধেক ছিল। এখন মেয়েরা হয় পুরুষের মতো ছোট ক'রে চুল ছাঁটে, নয় হরেক রকমের বাব্‌রী রাখে। শিংল্‌ করাটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ আর্টের আর্টিস্ট হচ্ছে নরসুন্দর আর তুলি হচ্ছে তার কাঁচি। যার চুল যেমন ক'রে শিংল্‌ করলে মানায়, তার চুল তেমনি ক'রে শিংল্‌ করাটা যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। তবে ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য, মাসে মাসে নরসুন্দরকে খাজনা গুনতে হয়। চুল ছেঁটে নাকি মেয়েরা সোয়াস্তি পায়। সম্ভবত পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই ইউটিলিটির প্রশ্ন। আগে ইউটিলিটি, তার পরে ওরি ওপরে একটু সৌষ্ঠবের ব্যবস্থা, সেজন্য নরসুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া, নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শত-সংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুফ্যাক্চার করা। ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটীরশিল্পটা বিদ্যুৎচালিত কারখানাশিল্পে পরিণত হবে না তো? সুন্দরীরা দলে দলে কলের নিচে মাথা পেতে Slot-এ ছ'পেনি ফেললে আপনাআপনি চুল ছাঁটা, টেরি কাটা, ঢেউ খেলানো, শিং-বাঁকানো, কান-ঢাকানো, কলপ-মাখানো পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হবে না তো?

এবার ব্যাঙ্কের কথা বলে আজকের মতো পাৎতাড়ি গুটাই। সকল বাবুয়ানা সত্ত্বেও ইংরেজরা হিসাবী জাত, যেমন ফুর্তি করে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটার বহুগুণ সঞ্চয় করে। ব্যাঙ্ক হচ্ছে প্রত্যেকের খাজাঞ্চিখানা। ঘরে টাকা না রেখে সেইখানে গচ্ছিয়ে দেয়, সে টাকা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে খাটে, তার থেকে সে সুদ পায়। ইংলণ্ডে অগণ্য ব্যাঙ্ক আছে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্কের শাখা। পাড়ায় ঐ ব্যাঙ্কটি না থাকলে পাড়ায় ঐ ন'টি দোকানও থাকত না, সমৃদ্ধিও থাকত না, আমাদের বাড়ির ঝি টাকা না জমিয়ে উড়িয়ে দিত কিংবা মাটিতে পুঁতে টাকার ব্যবহারই করত না। ব্যাঙ্ক থাকায় আমাদের বাড়ির ঝির দশ বিশ টাকা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরছে, এই মুহূর্তে হয়ত

নিউজিল্যাণ্ডের চাষারা ও-টাকা ধার নিলে, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকেরা ও-টাকার সুদ দিলে, কিংবা হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ও-টাকার শেয়ারে ওর দুগুণ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করলে।

৩

নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক'টা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মিষ্টান্নের দোকানে শিশুর মতো মানুষ কেবলি উতলা হয়ে ভাবে, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি, কোনটা ছেড়ে কোনটা শুনি, কোনটা রেখে কোনটা নিই। একান্ত তুচ্ছ যে, সেও নবীনত্বের রসে ডুব দিয়ে রূপকথার দাসী-কন্যার মতো রাণীর যৌবন নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, দেখ দেখ আমাকে দেখ, আমি ভালো নই মন্দ নই, সুন্দর নই কুৎসিত নই, আমি রূপবান আমি নতুন। তখন মানুষের ভিতরকার রসিকটি দেহ-দুর্গের চার দেয়ালের দশ জানালা খুলে দিয়ে জানালার ধারে বসে। সেনীতিনিপুণ নয়, সে ভালোমন্দ ভাগ ক'রে ওজন ক'রে বিচার করতে পারে না, সেকেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে চাখ্‌তে ছুঁতে চায়; কিন্তু কত দেখবে কত শুন্‌বে কত চাখ্‌বে কত ছোঁবে! হায়, আমার যদি সহস্রটা চোখ সহস্রটা কান থাকত, আর থাক্‌ত সহস্রটা—না, না, পাঁচশোটা—মন, তাহলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ এমন ব্যর্থ যেত না। তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে বাতির নীচে আগুনের দিকে পিঠ ক'রে বসে "বিচিত্রা"র জন্য ভ্রমণকাহিনী লিখতুম না, আমি আরেক বিচিত্রার দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী?—হায়, লণ্ডনের কি দ্যুলোক আছে! লণ্ডনের লঙ্কাপুরীতে ভুবনের ঐশ্বর্য আহৃত, কিন্তু আকাশ নেই, সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারা নেই। দিনের পর দিন যায়, সূর্য ওঠে না, আকাশ মানিনীর মতো মুখ আঁধার ক'রে রাখে, আর আমরা নিরীহ লণ্ডনবাসীরা পিতামাতার দ্বন্দ্বে অবোধ শিশুর মতো অবহেলিত হয়ে আলোর ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হই। আমাদের জ্যেষ্ঠরা যাঁরা লণ্ডনের কোলে দীর্ঘকাল আছেন তাঁরা হিন্দু বিধবার মতো উপবাস সইতে অভ্যস্ত কিন্তু আমরা

কনিষ্ঠরা আলোর দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক, ডাল ভাতের বদলে মাংস রুটি খেয়ে দেহ ধারণ করতেযদিচ পারি, তবু সূর্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে। আলোর দেশে মানুষের দেহ আলোর সঙ্গে ছন্দ রেখে গড়া, তার লোমকূপে-কূপে আলোর আকাঙ্ক্ষা জঠরজ্বালার মতোই সত্য। সেই দেহেরও ওপরে যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনবচ্ছিন্ন অন্ধকারের চাপ পড়ে তখন মন বেশিদিন অস্বস্তির ছোঁয়াচ এড়াতে পারে না, সূর্যাস্তের পর তরুর মতো মাথা যেন নিস্তেজ হয়ে নুয়ে পড়ে।

এক একদিন কালো কুয়াশায় দিনের ভিতর রাতের জের চলে, রাতের দুঃস্বপ্ন যেন বুকের ওপর ব'সে ক্ষান্ত হয় না, দিনের বেলায় মনেরও ওপরে চাপে। এক একদিন শাদা কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, পদাতিকের দল "চলি-চলি-পা-পা" ক'রে শিশুর মতো হাঁটে, মোটর গাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে মন্থরতার প্রতিযোগিতা বাধে, তবু তো শুনি গাড়িতে গাড়িতে মাথা ফাটাফাটি হয়, পথের মানুষ গাড়িতে চাপা প'ড়ে মরে। হঠাৎ এক একদিন মেঘ-ধোঁয়া-কুয়াশার পর্দা তুলে আকাশের অন্তঃপুরে সূর্যের পদপাত হয়, আমাদের মুখের ওপরে খুশির হাসির লহর খেলে যায়। দু'তিন সপ্তাহে একদিন ক'রে আলোর জোয়ার আসে, দু'এক ঘণ্টায় তার ভাঁটা পড়ে, তবু সেই দুটি একটি ঘণ্টার জন্যে আমরা সময়খণ্ড ও বোখারা দান করতে রাজী আছি। এক সহস্র ক্যাণ্ডেল্‌-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নঙ্গম হয়, সেদিন

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ"

সে মহাদানের মূল্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে লণ্ডনের বিভবসম্ভোগ তুচ্ছ মনে হয়। দৈবাৎ এক আধবার চাঁদ দেখা যায়। আমার বিরহী বন্ধুটি খবর দিয়ে যায়—চাঁদ উঠেছে। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা চাঁদ, কোন বিরহিণীর পাঠিয়ে দেওয়া চাঁদ। আমাদের কাছে চাঁদের মতো আশ্চর্য আর নেই, সে তো কেবল আলো দেয় না, সে দেয় সুধা। বিজলীর আলোর সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে। সভ্যতা

আমাদের কেরোসিনের আলোর পরে গ্যাসের ও গ্যাসের আলোর পরে বিজলীর আলো দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দয়া ক'রে যে সুধাটুকু দিয়েছে সভ্যতা তার পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।

কথা হচ্ছিল নতুন দেশে এলে মানুষের সব কটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মানুষের দশা হয় সেই ভদ্রলোকের মতো যে ভদ্রলোক একপাল আত্মীয়পরিবৃত হয়ে কাশীতে বা পুরীতে ট্রেন থেকে নামেন। দশটা পাণ্ডা যখন দশটি আত্মীয়কে ছিনিয়ে নিয়ে দশদিকে রওনা হয় এবং আরো দশটা এসে কর্তার দশ অঙ্গে টান মারে, তখন তাঁর যে অবস্থা হয় আমার মনেরও এখন সেই অবস্থা। ঘর ছেড়ে একবার যদি বা'র হই তো লণ্ডন শহরের সব ক'টা রাস্তা একসঙ্গে আহ্বান করতে থাকবে, "এদিকে বন্ধু, এদিকে", সব ক'টা মাঠ উদ্যান, সব কটা মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারি থিয়েটার কন্সার্ট সমবেতস্বরে গান ক'রে উঠবে, "এখানে বন্ধু, এখানে।" তাদের আহ্বান যদি নাই শুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধ'রে ক্ষ্যাপার মতো যেদিকে খুশি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গীর সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দু'টিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চুপ ক'রে ঘরে ব'সে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ক'রে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ ক'রে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।

আমি ঘরে ব'সে লিখছি, আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল সেটা আমাদের বাড়ির পাশের টেনিস্‌কোর্ট, সেখানে যুবকযুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতির পরস্পর থেকে শত হস্ত ব্যবধান থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিরায় শিরায় ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাসের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করছে তা নয়, সেই সঙ্গে এত প্রচুর হাসছে যে ভারতবর্ষের লোক মোহমুদ্গরের আমল

থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। আমাদের পাড়ার বাড়িগুলো এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধ। এটা একটা শহরতলী। সামনের বাড়ির ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির ওপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের কল্যাণী নারীর হাত, ধূলা যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ শুচি হয়। আমার চোখ এগিয়ে চল্‌ল। এর পরের রাস্তাটা পাহাড় থেকে নেমেছে, তার নামবার মুখে থাস লণ্ডন। নামতে নামতেদেখছি ছেলের দল পায়ে চাকা বেঁধে ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোঁ করে নেমে চলেছে, চল্‌তে চল্‌তে বাধালো হয়তো কোনো বুড়ো ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা, বার্ধক্যের চোখ তারুণ্যের দিকে কোমল ভাবে চাইল। ছোট মেয়েরা দোকানের কাঁচেরবাইরে থেকে ভিতরের কেক্‌চকোলেটের দিকে লুব্ধ নিরাশ দৃষ্টি ফেলছে, হয়তো দার্শনিকের মতো ভাবছে, কমল যদি এত সুন্দর তো কমলে কণ্টক কেন? চকোলেট যদি এত সুস্বাদু তো চকোলেটের চারপাশে কাঁচের বেড়া কেন? আমার চোখ পথে চল্‌তে চল্‌তে দেখছে মদের দোকানের ওপর বিজ্ঞাপনের নামাবলী, গির্জার দ্বারদেশে মুদ্রিত ধর্মানুশাসন, কসাইয়ের দোকানে দোদুল্যমান হৃতচর্ম পশুর শব, কেমিস্টের দোকানে নানা রোগের দাওয়াই, পোশাকের দোকানের কাঁচের এক পারে হঠাৎ-থামা নারীর কৌতূহল দৃষ্টি, অন্য পারে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম। ফলের দোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। "এমপ্লয়মেণ্ট এজেন্সী"-র কর্ত্রী ঝিদের জন্যে গিন্নী ও গিন্নীদের জন্যে ঝি ঠিক করে দিচ্ছেন। সরকারী ইস্কুলের এক প্রান্তে ছেলেরা ও অপর প্রান্তে মেয়েরা সমান বিক্রমে মাতামাতি করছে; তাদের ভাগ্য ভালো, ভারতবর্ষে জন্মায়নি; সে দেশে জন্মালে এতদিনে ছেলেরা গোপাল হয়ে উঠতো, মেয়েরা মেয়ের মা হতো।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে—ট্রেনে চড়বে, না বাসে উঠবে? বাসেই উঠল, দোতলার এককোণে আসন নিল। দুপাশে দোকান বাজার, দোকানে ক্রেতা ক্রেত্রীর ভিড়, কর্মচারিণীদের ব্যস্ততা, উভয়পক্ষে শিষ্টাচার। রেস্তোরাঁ—দলে দলে নরনারী আহারে রত, পরিবেশন-

কারিণীদের মরবার ফুরসৎ নেই, ছুরি কাঁটা প্লেটের ঝনৎকার, সুখভোগ্য খাদ্য-পেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া। রেস্তোরাঁর বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক চীরধারিণী পত্নীর হাত ধ'রে দেশলাই বেচছে বা বাজনা বাজাচ্ছে বা ফুটপাথে ছবি আঁকছে; রাস্তা মেরামত করছে কুলিরা; তাদের পরিধান কাদামাখা ও জীর্ণ, মুখে প্রতি দেশের কুলী-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি। জমকালো পোশাক পরা অশ্বারোহী সৈনিক চলেছে, বুড়ীরা হাই তুলতে তুলতে নির্নিমেষে দেখছে। গত যুদ্ধে তাদের এমনি সব ছেলেরা তো মরেছে! তরুণীরা গৃহবাতায়ন থেকে উল্লাস-ধ্বনি করছে, যৌবন যে ঠেকেও শেখে না, হারিয়েও হারায় না। থিয়েটারের ম্যাটিনীর সময় হলো, টিকিট্ কেনবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ "কিউ" (queue) ক'রে দাঁড়িয়েছে, দু'জনের পেছনে দু'জন, পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি। সর্বত্র পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি, সভাসমিতিতে স্কুলে কলেজে থিয়েটারে কন্সার্টে দোকানে আপিসে সর্বত্র নারীর আক্রমণে পুরুষ পলাতক, কেরানী মানে নারী, স্কুল-শিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী। রাস্তার মোড়ে বাস থামল, শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিসের তর্জনী-সংকেতে শত শত বাষ্পীয় যান থেমেছে, শত শত নরনারী রাস্তা পারাপার করছে, মেয়েরা ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে যাচ্ছে, ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে, শিশু কাঁধে নিয়ে শিশুর বাবা তার মা'র পশ্চাদবর্তী হচ্ছেন, বুড়ীকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে বুড়ীর ছেলেমেয়েরা মাঠে হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছে, প্রেমিক যুগল হাতে হাত জড়িয়ে বাজার ক'রে ফিরছেন। বাস চলতে আরম্ভ করল, একটা পার্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে, পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে কাগজ পড়তে পড়তে দরিদ্ররা রুটি কামড়ে খাচ্ছে, তাদের মধ্যাহ্নভোজনটা দু'একখানা রুটিতেই সমাপ্ত হচ্ছে।

বাস্ কলেজের কাছে থামতেই আমার চোখজোড়া তৎক্ষণাৎ নেমে প'ড়ে দৌড় দিলে কলেজের অভিমুখে; কোনো অগ্রগামিনী হয়তো দয়া ক'রে দরজাটা খুলে রাখলেন, প্রবেশ ক'রে ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদাগতের জন্যে। তারপর ক্লাসে গিয়ে আসন অধিকার করা, অধ্যাপকের আগমনের আগে মেয়েদের তুমুল ফিস্ ফাস্, কে কী সাজ ক'রে এসেছে অন্যমনস্কতার ভান ক'রে দেখা ও

দেখানো, লাফ দিয়ে পেছনের চেয়ার থেকে সামনের চেয়ারে যাওয়া। অধ্যাপকের প্রবেশ, অধ্যাপকোবাচ, সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন, পলাতকমতি উন্মনাবালক কর্তৃক উপন্যাসপাঠ বা কবিতাসংরচন, বারবার ঘড়ির দিকে চাতক দৃষ্টিক্ষেপ, অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ, ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।

নতুন দেশে এলে কেবল যে সব ক'টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে তা নয়, সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট্ ক'রে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না। মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল, দেশী রান্নার স্বাদ পেলে রসনা আর কিছু চায় না। কাঁচা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার, বাঁধাকপির ডাল্‌নাচাখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মানুষের এতটা রক্ষণশীলতা নেই। দেশে যখন এক-আধ দিন কোট্-ট্রাউজার্স পরা যেত সে কী অস্বস্তি! আর সে কী সাহেবমানসিকতা! ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালীগুলোর ওপরে তখন কী অকারণ করুণা! জাহাজে থাকবার সময় জাহাজী কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ধুতি পাঞ্জাবি পরার স্মৃতি মনে পড়ে গেলে হাসি পায়। এতদিনে ইউরোপীয় ধরাচুড়া গায়ে বসে গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা এই বেশে থাকতে একটুও বেখাপ্পা বোধ হয় না; এখন মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক, যেন এই পোশাক প'রে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি, ট্রাউজার্স জোড়াটার হাঁ-দুটোতে পা জোড়াটা গলিয়ে দিই, মণখানেক ভারিওভারকোটটার বাহন হয়ে চলি। দৈবাৎ কোনোদিন ধুতি পাঞ্জাবি চাদর বার ক'রে পরি তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনে, আমোদের অন্ত থাকে না, জগৎকে দেখিয়ে আসতে ইচ্ছে করে আমাদেরও জাতীয় পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি একটা? মাদ্রাজী ভায়াদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ভায়াদের আপাদমস্তক অমিল, বাঙালী মুসলমান পেশোয়ারী পাঠানের যমজ ভ্রাতা নন। আমার সফেদ্ ধুতি আর সবুজ পাঞ্জাবিটার ওপরে নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়খানা জড়িয়ে

ঘরের বাইরে পা বাড়াই তো রাস্তায় ভিড় জমে যাবে; পুলিস যদি বা আমাকে মানুষ ব'লে চিন্‌তে পেরে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষদের হাতে সমর্পণ না করে তো ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে সর্বজনীন শ্বশুরালয়ে চালান দেবে।

নতুন দেশে এলে নতুনআবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্তন ঘটে যায়। যাঁরা বলেন তাঁদের পরিবর্তন হয়নি তাঁরা খুব সম্ভব জানেন না কোথায় কী ঘটে গেছে। দেশে ফের্‌বার সময় তাঁরা সর্বাংশে—এমন কিমতবাদেও—ঠিক সেইমানুষটি থেকেই ফির্‌তে পারেন, কিন্তু মনেরও অগোচরে মানুষের কোন্‌খানে কোন্ প্যাঁচটি আল্‌গা হয়ে যায় তা মানুষ কোনোদিন না জান্‌তে পার্‌লেও সত্যের নিয়ম অমোঘ। নিজেকে জেরা কর্‌লে বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে আমার যেন সেই অবস্থা হবে যে অবস্থা হয় দীঘিতে ফিরে গেলে স্রোতের মাছের। ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব কর্‌তে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের একস্রোতে ভাসা। নারী সম্বন্ধে এ দেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপ সক্রিয় ক'রে তোলে। কেবল চোখে দেখারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত ক'রে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিবিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনো বার লিখব। যা আমার কাছে তর্ক নয়, রহস্য নয়, সহজ অনুভূতি তাই আমাদের দেশের লোকের কাছে বাক্যের সাহায্যে বোঝাতে হবে—দুর্ভাগ্য! বেশ বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে দেশটা পার্টিশন্ দেওয়া ঘরের মতো ঠেক্‌বে—একপাশে পুরুষ একপাশে নারী, মাঝখানে সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার।

আর একটা সহজ অনুভূতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা, কোনো ব্রাহ্মণের কাছে নতশির থাকতে হয় না, কোনো দারোগার কাছে বুকের স্পন্দন গুণে চল্‌তে হয় না, কোনো মনিবের কাছে মাটিতে মিশিয়ে যেতে

হয় না, মনুষ্যমর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব। ভারতবর্ষ যে প্রভু-মানসিকতার দেশ দাস-মানসিকতার দেশ, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একজনের দাস অন্যজনের প্রভু।

৪

বড়দিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজাঁয় গিয়ে দেখি সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল। নিবিড়-নীল অকূল আকাশে সেটি একটি পর্বতদিগ্‌বলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ, তার মাটি বরফের, মেঘ বরফের; তার জলস্থল-অন্তরীক্ষের ভিৎ দেয়াল ছাদ মর্মরনিভ বরফের! যেন আকাশসিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এতই নীল আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিবারাত্র অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটে না, মনে হয় এ এক মহার্ঘ বিলাসিতা, শুধু এরি জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস্ আল্পসের শাখাশিখরে উঠ্‌তে হয়। সে তো লণ্ডনের মাথার ওপরে কালো শামিয়ানার মতো খাটানো দশহাত উঁচু দশহাত চওড়া দশহাত লম্বা আকাশ নয় যে চোখ বাড়ালেই নাগাল পাব, মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে মরব, দশদিকের পেষণে ধ্বতনিঃশ্বাস হবে। লেজাঁয় যেদিন নামলুম সেদিন অসহ আনন্দে নিজেকে শতধা করতে পারলে বাঁচ্‌তুম। মুক্ত আকাশের মধ্যে মানবাত্মার যে মুক্তি আর কিছুরই মধ্যে তা নেই। সেই আকাশকে যারা কয়লার ধোঁয়া দিয়ে কালো ক'রে দশতলা বাড়ির ঘের দিয়ে খাটো ক'রে তুলেছে তারা কুবের হলেও কৃপার পাত্র, তারা স্বখাদসুড়ঙ্গতলের যথা।

সেই উজ্জ্বল নীল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্য উঠি-উঠি করে, মেঘের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আর পাহাড়ের এপারের বরফ হীরের মতো ঝক্‌ঝক্ করে, রঙের সপ্তকের ওপর আলোর আঙুল ঝলমল্ ঝিল্‌মিল্ ক'রে পিয়ানোর ঝংকার তুলে যায়, তখন মুহূর্তের জন্যে অনুভব করতে

পারি আদিযুগের ধ্যানীর চেতনায় কেমন জ্যোতি ঝলসে উঠেছিল, কোন আবিষ্কারের অসম্বরা বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ ক'রে আপনি ফুটেছিল, কিসের আনন্দ তাঁকে বলিয়েছিল—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ···জানাম্যহং তং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণংতমসঃ পরস্তাৎ।

সারাদিন সূর্যকিরণ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলে আর মাটির বরফ মাঠের বরফ গাছের বরফ ছাদের বরফ ঝরণার বরফ পাহাড়ের বরফ কখনো সোনা হয়ে ওঠে রূপালী রঙের মুকুরে সোনালী মুখের ছায়ার মতো, কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেতপদ্মিনীর কপোলে অশোক-রঙা লজ্জার মতো, কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত শঙ্খিনীর নয়নতারায় নীল চাউনির মতো। সূর্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা। তাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা, তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায়চূড়ায় জ্যোৎস্নার চুম্বন, তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি। দস্তুর পর্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা "পালেশ"গুলি গবাক্ষের ঘোমটা তুলে বিজলী-আলোয় উঁকি মেরে দেখছে, টোপর-পরা পাইনগাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।

শুধু শোভা নয়, সংগীত। এক নিশান্ত থেকে আরেক নিশান্ত অবধি মিষ্টি সুরের নহবৎ বাজে গ্রাম-কুক্কুটের অবসন্ন কণ্ঠে, তার সঙ্গে সুর মিলায় স্লেজবাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা, তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী অভিসারিণী ঝরণার 'চল্ চল্ চল্'। দিনের কাজের সঙ্গে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে চেতনার আড়ালধ্বনি মিশিয়ে রয়, যারা কাজ করে স্বপ্ন দেখে তারা হয়তো শুনতে পায় না জানতে পারে না কিসে তাদের অমৃত দেয়।

কাজ? সেখানকার কাজের নাম খেলা। ডাকঘরের ছোকরা চিঠি বিলি করতে যাচ্ছে, তার গাড়িখানার না আছে চাকা না আছে ঘোড়া, দুই হাতে একবার ঠেলা দিয়ে দুই পায়ে দিলে গাড়ির মধ্যে লাফ, গাড়ি চল্‌ল বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছ্‌লে, এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় বেঁকে, এক দরজা থেকে আরেক দরজায় থেমে। এক বাড়ির লোক আরেক বাড়ি যাচ্ছে, যার পিঠে চড়ে বসেছে সেটার নাম লুজ, উঁচু একখানা পিঁড়ির মতো তার

আসনটা, বাঁকা দুখানা শিঙের মতো তার পাখা দুটো, চ'ড়ে ব'সে পা তুলে নিয়ে হাত ছেড়ে দিলে বরফের রাস্তার ওপর ঘষড়ে ঘষতে চলে। যারা খেলাই করতে চায় তারা দুই পায়ে দুটো নৌকাকৃতি কাঠ বেঁধে হাতের লগি তুলে নিচ্ছে, আর দুই নৌকোয় পা রেখে জমাট জলের ওপর দিয়ে রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এরি নাম শী-খেলা (Skiing)। শুধু খেলা করতে কত দেশ থেকে কত পুরুষ কত নারী প্রতি শীতকালে স্বইট্জারল্যাণ্ডে আসে, বরফের ওপর দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, শী করে, স্কেট্ করে, লুজে চড়ে, স্লেজে চড়ে। কী অমিতোষ্মম্ স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা! ভূতের মতন খাট্তে পারে শিশুর মতন খেলতে পারে, যুবক-যুবতীর তো কথাই নেই, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও উৎসাহ দেখ্লে মনে হয় বানপ্রস্থে গেলে এরা বনকে জ্বালাত। খাটো আর খেলো আর খাও—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। ইউরোপে এতদিন আছি কাঁদ্তে কাউকে দেখিনি, কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্তত হাসির ভান আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষ তো দেখিনি। আরেক দিক থেকে দেখ্তে গেলে খুব একটা গভীরতার দাগও কারো মুখে দেখিনে; তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃ-সলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শ তৃপ্তি কারো চোখে মুখে চলনে বলনে দেহের গড়নে লক্ষ্য করিনে। সাত্ত্বিকতার চর্চা ইউরোপে নেই, কোনো কালে ছিল না। ইউরোপের খ্রীস্টধর্ম যীশুর ধর্ম নয়, সেণ্ট্ পলের ধর্ম—রামের ধর্ম নয়, হনুমানের ধর্ম। তার মধ্যে বীর্য আছে, লাবণ্য নেই।

কিন্তু লাবণ্য নাই থাক্, ক্লীবত্ব নেই। প্রচণ্ড শীতে যে দেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায়, দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য? দেহরক্ষার জন্য সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠ্তে, হয় উপনিষৎ লিখতে নয় মোহমুদ্গর লিখ্তে, ইউরোপের লোক কোনো দিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়তউত্তপ্ত রাখতে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহমনের আবহাওয়ায় কই? এদের ভিতরে বাহিরে কেবলি দ্বন্দ্ব কেবলি ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ-সমরে, তাঁদের মনন একটা

যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজেদের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়। ইউরোপের মাটি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, বিনা যত্নে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরণার জল এত হিমেল যে স্টোভে গরম না করলে ব্যবহারে লাগে না। বাল্মীকি যদি এদেশে জন্মাতেন তবে ধ্যান করতে ব'সে বল্মীকে নয় বরফে ঢেকে যেতেন; বুদ্ধদেব যদি এদেশে জন্মাতেন তবে তপস্যায় ব'সে কোন সুজাতার কল্যাণে ক্ষুধা-শান্তি করতে পেতেন হয়তো, কিন্তু বেশীক্ষণ খালি গায়ে থাকলে তাঁকে যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ের সুজাতাদের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে হতো।

ইউরোপের সেই নিষ্ঠুরা প্রকৃতিকে মানুষ দেবী ব'লে পূজা করেনি, কালী ব'লে তার পায়ের তলায় শব বিছিয়ে দেয়নি, তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে নিজের বাঁশির সুরে খেলিয়েছে, তাই একদিন যে ছিল নিষ্ঠুর আজ সে-ই হয়েছে কৌতুকের। তাই বরফ পড়লে কোথায় ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে আগুন জ্বালবে, না, মানুষ বেরিয়ে পড়ল বরফের বুকের ওপর পা রেখে কালীয় দমন করতে—স্কেট করতে শী করতে লুজে চড়তে স্লেজে চড়তে।

সুইট্জারলণ্ডের এই পার্বত্য পল্লীটি জেনেভা হ্রদের অনতিদূরে ও অনতি-উচ্চে। প্যারিস থেকে লোজান ছাড়িয়ে মিলানের পথে ট্রিয়েস্টের অভিমুখে যে রেলপথটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে এগ্লের কাছে তাকে নিচে রেখে অন্য একটি রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠতে হয়। এই রেলপথটি শীর্ণকায় এবং এর ট্রেনগুলি ছোট। পাহাড়ের ওপর ওঠ্বার সময় পেছনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে শিশুর মতো হামাগুড়ি দেয়, পোকার মত মন্থর বেগে চলে। পথের দু'পাশে দু'সারি পাহাড় কিংবা একপাশে পাহাড় ও একপাশে খাদ। দু'পাশে পাইনের বন, বনের ফাঁক দিয়ে ঝরণা ঝ'রে পড়ছে। পাইনের কাঁচা চুলে পাক ধরিয়ে দিচ্ছে বরফ-গুঁড়ো, ঝরণার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে বরফের বাঁধ।

গ্রামটি নিকট হয়ে এলে একটি দু'টি করে "শালে" দেখা দেয়। "শালে" (Chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি, যেমন আমাদের দেশে "বাংলো"। বাড়ির আগাগোড়া কাঠের, কেবল ছাদটা হয়তো স্লেটের এবং ভিতরটা হয়তো

পাথরের। প্রত্যেকটির গঠন স্বতন্ত্র, স্থিতি ছাড়া ছাড়া, আকার বিভিন্ন এবং রঙের সমাবেশ বিচিত্র। দো-চালা ছাদ, ঝুলানো বারান্দা, ছোট গবাক্ষ, জ্যামিতিক নক্সা, রঙিন আলপনা, উৎকীর্ণ উক্তি, দু'তিনশো বছর বয়স—সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি এমন একটি বিশিষ্ট দৃশ্য যে একবার চাইলে চোখ আটকে যায়, ফিরিয়ে নেবার সাধ্য থাকে না। দেশটির প্রকৃতি এত সুন্দর, তাতেও মানুষের তৃপ্তি হলো না, সে ভাবলে এমন সুন্দর আকাশ এমন সুন্দর পাহাড় এমন সুন্দর বরফ পাইন ঝরণা, দশদিকে এমন অরূপণ সৌন্দর্য, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়? এই ভাবে সে বাইরের সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য মাখিয়ে দিলে, সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জুড়ে দিলে, বিধাতার সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি, এ বলে আমায় ত্যাখ্‌ ও বলে আমায় ত্যাখ্‌। তিন dimension-এর ছবির মতো বহুকোণ "শালে", ধাপে ধাপে লাফ-দিয়ে-নামা পাথর-বাঁধানো ঝরণা, বাঁকে বাঁকে ঘুরে-ঘুরে-নামা পাহাড়-কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেঞ্চি, দুশো তিনশো বছরের বাড়িতেও অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিজলী আলো জলের কল সেণ্ট্রাল হীটিং। ইউরোপের লোক যুগোচিত পরিবর্তন বোঝে। সেইজন্যে চার হাজার ফুট উঁচু পর্বতশ্রেণীর পিঠে নিরালা একটি ছোট্ট গ্রামে বাস ক'রে কোনো কিছুর অভাব বোধ করে না। লেজাঁর পাঁচ দশ মাইল দূরের দুটি গ্রামে বেড়িয়ে এসেছি, সেসব গ্রামেও কমবেশী এমনি স্বাচ্ছন্দ্য, অস্থায়ী পর্যটকদের জন্যে অন্তত কয়েকটি কাফে তো আছেই।

লেঁজা গ্রামটিতে দু'তিন হাজার লোকের বাস, তাদের বোধ হয় অর্ধেক নানা দিগ্‌দেশাগত যক্ষ্মারোগী। ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ওলন্দাজ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান পর্তুগীজ ইতালিয়ান জাপানী ভারতীয়—কত নাম করবো। তাঁদের মধ্যে আমাদের, এক বাঙালী ভদ্রলোকও আছেন, তাঁর ভাই "রমলা"-কার মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর তত্ত্ব নেন।

যক্ষ্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ এখানে সূর্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপপ্রাচুর্য নেই। শীত ও রৌদ্রের

এহেন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। পার্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, স্তব্ধ গ্রাম, পাখীর গান, পাইনের মর্মর, ঝরণার কলকল, বাসি শেফালীর মতো অতি আলগোছে মৃদু তুষারপাত। একত্র এত গুণ কোন্ শহরের ক'টা গ্রামের আছে? রোগীর জন্যে কেবল প্রাকৃতিক নয় কৃত্রিম আনন্দেরও বহুল ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে ছোট বড় বহুসংখ্যক ক্লিনিক, তাদের আত্মীয়দের জন্যে বহুসংখ্যক হোটেল, উভয়ের জন্যে দোকান বাজার ডাকঘর ব্যাঙ্ক, সিনেমা গির্জা কাফে। বড় ক্লিনিক ও বড় হোটেলগুলিতে নাচগানের বন্দোবস্ত। যারা দু'তিন বছর একাদিক্রমে শয্যাশায়ী, যাদের পাশ ফিরে শুতেও দেওয়া হয় না, তাদের নিজের নিজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে কাগজপড়া হচ্ছে খাবার পৌঁছচ্ছে নার্স পরিচর্যা করছে বন্ধুরা গল্প করছে। নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট ক'রে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সকলে মিলে গল্প করছে কন্সার্ট শুনছে সিনেমা দেখছে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের নাচ উপভোগ করছে।

একটি বড় ক্লিনিকের কথা বলি। খ্রীস্ট্মাস ইভে খ্রীস্ট্মাস ট্রি স্থাপন হলো, ট্রির ওপরে শতসংখ্যক মোমবাতি জ্বলে উঠল, রোগীদের শয্যাসমেত ব'য়ে এনে সারি ক'রে সাজিয়ে রাখা গেল, তাদের বন্ধুবান্ধবীরা সারি বেঁধে বসলেন, কন্সার্ট চলল, ধর্মোপাসনা হলো, প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকারের স্ত্রী ম্যাদাম দুআমেল আবৃত্তি শোনালেন। নিকোলা বুড়ো সেজে একজন এসে যতগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে জুটেছিল তাঁদের সকলকে এক একটা উপহার দিলে, সকলের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করলে। বাতি নিবল, কনসার্ট থামল, উৎসব শেষ হলো, রোগীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরলে—অবশ্য ইতিমধ্যে সকলে কিছু পানাহার করলে।

একটি ছোটদের ক্লিনিকের কথা বলি। খ্রীস্ট্মাস ইভ খ্রীস্ট্মাস ট্রির শাখায় শাখায় পুতুল ঝুলছে, ইলেকট্রিক আলোর নকল মোমবাতি জ্বলছে, ইংরেজ জার্মান ফরাসী ইতালিয়ান ইত্যাদি নানা জাতের নানাভাষী রুগ্ণ ছেলেমেয়েগুলি এক একটি শয্যায় দুজন করে শুয়েছে, তাদের আত্মীয়েরা তাদের বিছানার কাছে ব'সে তাদের আনন্দে যোগ দিচ্ছেন, নার্সরা

পিআনো বাজাচ্ছে। প্রেমিক প্রেমিকা সেজে দুটি সুস্থ ছেলেমেয়ে গীতাভিনয় করলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুটি রুগ্‌ণ ছেলেমেয়েতে ডুয়েট হলো, দুজন নার্স ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সেজে রঙ্গ করলে। ছেলেরা নিকোলা বুড়োর জন্যে অধীর হয়ে উঠল। একটি নার্স এল নিকোলা বুড়ো সেজে, "নিকোলা এসেছে" "ঐ যে নিকোলা" "নিকোলা ···· নিকোলা" ক'রে সোরগোল প'ড়ে গেল, প্রত্যেকের জন্যে নিকোলা কত উপহার ব'য়ে এনেছিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রত্যেকে উপহারের ভারে চাপা পড়তে লাগল, কত রকমের খেলনা, কত রকমের ছবির বই; একজনের একটা ক্ষুদ্র গ্রামোফোন এসেছিল, সেটা বের ক'রে সে একটা ক্ষুদে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে, সকলের তাক লেগে গেল। এক-জনের এত উপহার এসেছিল যে স্বয়ং ক্লিনিকের কর্ত্রী এসে নিকোলার সাহায্য করতে লাগলেন, নার্সেরা ছুটোছুটি ক'রে যার উপহার তার বিছানায় পৌঁছে দিতে লাগল, কারো উপহারের পর উপহারই পৌঁছচ্ছে, কারো দেরি হচ্ছে, সে বেচারা পরের উপহার নাড়াচাড়া ক'রে সান্ত্বনা পাচ্ছে।

বৎসরের শেষ রাত্রের উৎসব (Sylvester) সেই বড় ক্লিনিকে। রোগীরা সেই হলে সমবেত। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যান্সী পোশাক প'রে এসেছে। যে রোগী দু তিন বছর এক শয্যায় সর্বদা শুয়ে রয়েছেন, তাঁরও কত শখ, তিনি রেড্ ইণ্ডিয়ানের মতো মাথায় পালখ পরেছেন, কিংবা নকল দাড়ি গোঁফ পরচুলা লাগিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবীরাও সেজে এসেছেন—কেউ সেজেছেন দাঁড়কাক, কেউ সেজেছেন মুসলমানী, কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী অভিজাত, কেউ রঙিন কাপড় পরা স্পেনদেশের পল্লীবাসিনী! বন্ধুবান্ধবীদের নাচ হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, নারীতে পুরুষে বাহু ধরাধরি ক'রে তালে তালে পা ফেলছে, বাজনার সুরটা এমনি যে যারা নাচছে না তাদেরও পা নেচে নেচে উঠছে। দুআমেল বললেন, নাচের বাজনার থেকে ইউরোপীয় সংগীতের বিচার করবেন না। দুআমেল আত্মস্থ প্রকৃতির স্বল্পভাষী সুপুরুষ, তাঁর "Civilization" গ্রন্থখানা ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ Goncourt prize পেয়েছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে নাচ চলল, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। তারপর রোগীদের

খাটের কাছে কাছে ব'সে তাদের বন্ধুবান্ধবীদের পানাহার ও রোগীদের
খাটের কাছে কাছে ব'সে তাদের বন্ধুবান্ধবীদের পানাহার ও রোগীদের শুয়ে শুয়ে যোগদান। রাত বারোটায় বছর বদলাল, দলে দলে গান গেয়ে উঠ্‌ল, গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা করলে। পানাহার শেষে আবার নাচ। ইতিমধ্যে ফ্যান্সী পোশাকের উৎকর্ষ বিচার ক'রে যে কয়জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দাঁড়কাক তাঁদের মধ্যে প্রথম।

এমনি ক'রে ইউরোপীয়রা রোগশোককে তুচ্ছ করে, খেলার দাপটে জরাকে ভাগিয়ে দেয়। একাদিক্রমে তিন বছর এক শয্যায় শায়িত থাকা কী ভয়ানক দুর্ভোগ তা সুস্থ মানুষে কল্পনা করতে পারবে না। এ সত্ত্বেও রোগীদের মুখে হাসি, তাদের আত্মীয়দের মুখে ভরসা, তাদের সেবিকাদের মুখে আশ্বাসনা। মৃত্যুর কাছে ব্যাধির কাছে জরার কাছে কিছুতেই হার মান্‌ব না, তালি দিয়ে গান গেয়ে হাল্‌কা তালে নেচে যাব—এই হলো ইউরোপের পণ। অনাদ্যন্ত জীবনপ্রবাহে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কতটুকুই বা স্থান, সেই স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা কত সহস্র বৎসরে ধ'রে বৈরাগ্য চর্চা ক'রে আসছি, আমাদের সন্ধান সংসার হতে মুক্তি, জীবনশিখার নির্বাণ, আমাদের সাধনা দুঃখকে এড়িয়ে চলবার সাধনা, নিজেকে নিশ্চিহ্ন করবার সাধনা। বুদ্ধ-শঙ্কর-রামকৃষ্ণ কেউ তো বলেননি, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।"

স্ত্রীপুরুষের মিলিত নাচ ব্যাপারটাকে আমরা কুনৈতিকর ভেবে থাকি, ইউরোপীয়েরা ভাবে না। ইউরোপে প্রতিদিন নতুন নাচের আমদানি ও উদ্ভাবন চলেছে, নাচ না হলে ওদের উৎসবই হয় না। স্বাস্থ্যবান সমাজ মাত্রেই মিলিত নৃত্যের চলন আছে; আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কত স্থানে দেখেছি, তা দেখে কুনীতির কথা মনেই ওঠেনি! অনাদি কাল থেকে যে সব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রীপুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ও আশৈশব যারা একত্র নাচ্‌তে অভ্যস্ত হয়েছে, পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করলে তাদের চিত্তবিক্ষেপ না হবারই কথা। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে

বাস করেন, নিজের নিকট আত্মীয় আত্মীয়া ছাড়া এত বড় সমাজের যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরস্পরের কাছে অলক্ষ্য অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের একদেশদর্শিতা স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বুভুক্ষা আমাদের সমাজকে তো ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যকেও খণ্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার করে তুল্ছে। বিচিত্র রূপ দেখ্তে দেখ্তে বিচিত্র গীত শুন্তে শুন্তে বিচিত্র স্পর্শ পেতে পেতে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়, এ সবের সুযোগ আমাদের সমাজে বিরল ব'লে আমাদের চিত্রকলা সংগীতকলা ভাস্কর্যকলা মাথা তুল্তে পারলে না, আমাদের পোটোরা কেবল দু'দশটি টাইপের নারী-মূর্তি আঁকেন, আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদগ্ধা বাঈজী, আর ভাস্কর্য আমাদের নেই। চিত্রকরের যেমন জীবন্ত মডেল দরকার ভাস্করেরও তেমনি। আমাদের ছবিই বলো কাব্যই বলো গল্পই বলো এমন ফিকে এমন অবাস্তব এমন এক ছাঁচে-ঢালা হবার কারণ কি এই নয় যে আমাদের সমাজে একটা সেক্স্ সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স্ একান্ত স্বল্পচেতন?

বল্রুমে নাচ উঁচুদরের কেন কোনও দরেরই আর্ট নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ, সমাজের দশজন পুরুষের সঙ্গে দশজন নারীকে পরিচিত ক'রে দেবার একটা উপায়। যে সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজেকে অর্জন করতে হয় সে সমাজে এই প্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের ওপরে সর্বনারীর নারীত্বের দাবী যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের ওপর সর্বপুরুষের দাবী তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়। সর্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি পুরুষের দাবী এবং সর্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি নারীর দাবী বলবানকে করে প্রেমবান ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী। পুরুষের সাধনা সকলকে এড়িয়ে কেবল একটি নারীর জন্যে নয়, সকলকে ছাপিয়ে বিশেষ

নারীর জন্যে। নারীর সাধনা সকলকে বাদ দিয়ে কেবল একটি পুরুষের জন্য নয়, সকলকে স্বীকার ক'রে বিশেষ একটি পুরুষের জন্যে। ইউরোপের পুরুষ একটি নৈর্ব্যক্তিক স্বামী হয়ে সুখ পায় না, সে স্বয়ম্বর সভার জেতা। ইউরোপের নারীও একটি নৈর্ব্যক্তিক স্ত্রী হয়ে সুখ পায় না, সে বহুর মধ্যে বিশিষ্টা।

এ সমস্ত বাদ দিয়ে বল্‌রুমের নাচ একটা কসরৎ এবং অবসর বিনোদনের একটা উপায়। ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষের পা অত্যন্ত স্থূল পুষ্ট মাংসপেশীবহুল। নৃত্যকালে পরস্পর হাত উঁচু করে ধরার ফলে বাহুরও রীতিমতো চালনা হয়। পুরুষের পক্ষে কসরৎটা কিছু বেশি, কারণ সঙ্গিনীটি যদি গুরুভার হয়ে থাকেন তো সঙ্গিনীকে মোড় ফেরাবার সময় বাহুবলের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

বল্‌রুম নাচের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নৈতিক আপত্তি শুনতে পাই। যে দেশে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখলে পাপ হয় ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাইয়ের দেখা নিষেধ, যে দেশের পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্ক ভাইদের সামনে বয়স্কা বোনকে ঘোম্‌টা দিতে হয়, সে দেশের লোক অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে তখন দৈহিক সংঘর্ষে যে নরক দেখ্‌বে এর সন্দেহ নেই। যদি বলি ব্যাপারটা এত নির্দোষ যে ভাইবোন বাপ-মেয়ে ও মা-ছেলে পর্যন্ত হাত ধরাধরি ক'রে সকলের সামনে নাচে তবে হয়তো "উল্টো বুঝলি রাম" হবে, এদেশের পিতৃত্ব মাতৃত্ব সৌভ্রাত্রের ওপরেও সন্দেহ পড়্‌বে। মানব-চরিত্রের প্রতি যাদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস আছে আমাদের দেশের সেই সকল ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিই, মিলিত নাচ সরল প্রকৃতি আদিমদের মধ্যেও আছে এবং ইউরোপীয়রা যখন আদিম ছিল সেই সময় থেকে তাদের মধ্যে চলিত হয়ে আসছে। এটা তাদের সংস্কারগত এবং কচি বয়স থেকে বালক-বালিকা মাত্রেই এর অনুশীলন করতে শেখে। মানুষকে যাঁরা গ্রীন হাউসে পুরে সতী বা যতি বানাতে চান সে সব নীতিনিপুণদের বল্লে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে এদেশেও সতী ও যতির অপ্রতুল নেই, কিন্তু সমাজের ফরমাসে নয়, অন্তরের নিয়মে।

ক্লিনিকের কথায় নাচের কথা উঠ্‌ল, পাঁসিঁঅঁর কথায় খাওয়ার কথা বলি।

আমাদের পাঁসিঅঁতে (একটু ঘরোয়া ধরনের হোটেলকে ফরাসীতে পাঁসিঅঁ বলে) আমরা অনেক দেশের লোক থাক্‌তুম, যখন খাবার ঘণ্টা পড়ত তখন খাবার টেবিলে যারা সমবেত হতুম, তাদের মধ্যে মণিদা ও আমি বাঙালি, অন্যদের কেউ আমেরিকান কেউ ইংরেজ কেউ জার্মান কেউ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান ফিন্ ইতালিয়ান ওলন্দাজ। এতগুলি জাতের লোক একসঙ্গে একঘণ্টা বস্‌লেই নানা দেশের কথা ওঠে। রাজনীতি অর্থনীতি আর্ট সমাজ ধর্ম সকল বিষয়ে আলোচনা চলে। আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতির স্বভাব ধরা প'ড়ে যায়, আন্তর্জাতিক জানাশুনা হয়, ফরাসীরা দেখে জার্মানমাত্রেই শয়তান নয়, আমেরিকানরা বোঝে ক্যাথরিন মেয়োর বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি হিন্দুর মেলে না। সভাসমিতিতে সব দেশের লোক ততটা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারে না যতটা মেশে খাবার টেবিলে। এই সত্যটা জানা থাকলে আমরা হিন্দুমুসলমানের জনসভা না ক'রে জন-ভোজ করতুম এবং ব্রাহ্মণের ডানদিকে মুসলমানকে ও বাঁদিকে নমঃশূদ্রকে আসন দিয়ে দু'টো মহাসমস্যার মীমাংসা দু'টো দিনেই করতুম।

পরিবারের বড় ছোটতে মিলে এক টেবিলে খাবার সময় ছোটরা বড়দের কথা কান পেতে শোনে ও বড়দের রীতি চোখ বুলিয়ে দেখে। আমরা যা বই প'ড়ে বা মাস্টারের উপদেশে শিখি এরা তা খেতে খেতেই শেখে। আমেরিকার মহিলাটির সঙ্গে জার্মানীর মার্ক-মুদ্রার বিনিময় হার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, তাঁর বালিকা মেয়ে দুটি তা সাগ্রহে শুন্‌ছে ও সে বিষয়ে প্রশ্ন কর্‌ছে, অথচ এক্স্‌চেঞ্জের মতো দুরূহ বিষয় যে কী, তা আমরা মার কাছে শেখা দূরে থাক বি-এ ক্লাসের অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে শুনেও সহজে বুঝে উঠ্‌তে পারিনে, কারণ আমাদের ঘরে ও বিষয়ে চর্চা নেই, আমাদের সমাজ বল্‌তে কেরানী-উকিল-ডাক্তার-ইস্কুল-মাস্টারের সমাজ। আমেরিকান মহিলাটি যে বেশ একজন বিদুষী তা নয়, সম্ভবত তিনিও ওসব শুন্‌তে শুন্‌তে শিখেছেন, নিজের ঘরের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলে মিলে দৈনিকপত্র পড়তে পড়তে কিংবা পরের ঘরের চায়ের টেবিলে জাহাজের ব্যাপারীদের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে কর্‌তে—কেবল কি টাকাকড়ির কথা?—ভালোমন্দ দরকারি অদরকারি হরেক রকমের অনেক তথ্য অনেক

গুজব এবং অনেক মিথ্যাই মগজে জমিয়েছেন। জার্মান মহিলাটির স্বামী ডাক্তার, আত্মীয়েরা কেউ চিত্রকর কেউ যোদ্ধা কেউ ব্যবসাদার। তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর নিজের শিক্ষাও ঘরে ঘরে যতটা হয়েছে স্কুলে ততটা হয়নি। তিনি যে রকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন তার মধ্যে কতকটা তাঁর স্বীয়, বাকিটা সামাজিক। তবে স্কুলেও যে এঁরা কেবল পড়েন না সেকথাও জানিয়ে রাখতে চাই। এঁদের প্রতি স্কুলে সংগীতশিক্ষা আদিষ্ট, প্রতি স্কুলে কলেজে প্রতি সপ্তাহে নাচের আয়োজন আছে, স্কুল থেকে এঁরা প্রত্যেকেই দুটো একটা বিদেশী ভাষা শিখে রাখেন এবং প্রত্যেকেই কয়েকটা গৃহশিল্পের ট্রেনিং পান। ফরাসী ইংরেজী ও জার্মান এই তিনটে ভাষা ব্যবসা বা সামাজিকতার খাতিরে ইউরোপের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষই অল্পবিস্তর জানেন এবং জানবার প্রধান সুযোগ পেয়েছেন নানাদেশে বেড়াবার সময় নানাদেশের লোকের সঙ্গে কাফেতে রেস্তোরাঁয় হোটেলে এক টেবিলে ব'সে আড্ডা দিতে দিতে। এহেন আড্ডার পক্ষে সুইট্‌জারলণ্ড্‌ যেমন অনুকূল তেমন আর কোনো দেশ নয়।

ঐ তো ছোট্ট একটুখানি দেশ, ওর লোকসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ, আয়তন আমাদের ছোটনাগপুরের মতো হবে, তবু টুরিস্ট্‌দের দৌলতে এবং ঘড়ি ও চকোলেট বিক্রি ক'রে ওদেশ বড়-মানুষ। ঐটুকু দেশে তিন-তিনটে ভাষা আর দু'দুটো ধর্ম চলিত, অথচ ওর ঐক্য ইতিহাসবিশ্রুত।

সুইট্‌জারলণ্ডের প্রত্যেক শহরে টুরিস্টদের জন্যে হোটেল পাঁসিঅঁ কাফে আর ব্যাঙ্ক ডাকঘর ঔষধালয় তো আছেই, প্রত্যেক স্থানে তাদের খেলার বন্দোবস্ত ও বাজারের আয়োজন আছে। সমগ্র দেশটাই যেন টুরিস্ট্‌দের জন্যে তৈরি একটা বিরাট পান্থশালা।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যান্য দেশের টুরিস্ট্‌দের ডাকছে এবং দেশ দেখিয়ে তাদের পকেট হাল্‌কা করছে। ভারতবর্ষ যদি সুইট্‌জারলণ্ডের মত উদ্যোগী হতো ভারতবর্ষের দারিদ্র ঘুচ্‌ত। কিন্তু ভারত-বর্ষের এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না, ইউরামেরিকার টুরিস্ট্‌দের সমাজ দেবে কে? তারা যদি ইউরোপীয় হোটেলেই থাকে

ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খায় ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খেলে ও ইউরোপীয়দের সঙ্গেই আড্ডা দেয় তবে তাদের অর্থে ভারতবাসী ধনী হবে না এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে তারা দেশে ফিরবে সে ধারণা আমাদের অনুকূল হবে না। এবং দু' দশটা মুসলমান বাবুর্চি হিন্দু দোকানদার ও ফিরিঙ্গী আয়া দেখে যদি তারা ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে বই লেখে তবে সেবইয়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদ করলেই আমাদের কাজ ফুরাবে না। আমাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় তারা পাবে কী ক'রে? সে যে অভিমন্যুর ব্যূহ উল্টো, তার মধ্যে তাদের প্রবেশ-পথ কোথায়? ইউরোপের এক দেশের সমাজের সঙ্গে অন্য দেশের সমাজের মিল আছে, ভাষা জানা থাকলে এক সমাজের লোক আর এক সমাজে মিশে যেতে পারে; জাতীয় সংস্কার স্বতন্ত্র হলে কী হয়, সামাজিক আচার সর্বত্র প্রায় এক। এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেক সময় মনকে পীড়া দেয়। আমেরিকান মহিলাটি বল্লেন, তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসে নতুন কিছু দেখ্‌বেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এই যান্ত্রিকতার যুগে সমস্তই এমন এক ছাঁচে ঢালা যেইউরামেরিকার সব দেশের পুরুষের একই পোশাক, সব দেশের নারীর একই পরিচ্ছদ, স্থলে স্থলে এমন কি একই প্যাটার্নের একই রঙের একই ভঙ্গীর। কোনো লীগ অব নেশন্স ফতোয়া দিয়ে এত দেশের এতগুলো মানুষকে একই রকম সাজ করতে বলেনি, কোনো মিশনারী এ বিষয়ে প্রচারকার্য করেননি, তবু কেমন ক'রে যে আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া থেকে ইউরোপের রুমেনিয়া অবধি প্রায় প্রতি নারীই কবরী ছেঁটে স্কার্ট ছেঁটে জামার হাত কেটে পূর্ব নারীদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাজ্‌লে সেই এক আশ্চর্য! অথচ সর্বত্র পুরুষ তার পূর্বপুরুষের মতোই জবড়জঙ সাজে বিদ্যমান, ক্যালিফর্ণিয়া থেকে রুমেনিয়া অবধি তেমনি কোট-ট্রাউজার্স টুপী-ওভারকোট। অবশ্য ইতর বিশেষ আছে, তবু মোটামুটি বলতে গেলে সর্বত্র হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জামূলক ধর্ম, নাচঘরমূলক সমাজ এবং খাটা-খেলা-খাওয়া নামক ত্রিনীতি। এহেন সমাজে খাপ খেয়ে যেতে বেশি কষ্ট হয় না, এমন কি আমরা বাইরের লোকও অনায়াসেই এ সমাজের মধ্যে স্থান পেতে পারি।

সেঁভার পর্বতমালার নিচে জেনেভা হ্রদকে বেষ্টন ক'রে অগণ্য পল্লী, কিন্তু

তাদের প্রত্যেকটাই টুরিস্ট্‌দের জন্যে হোটেলে দোকানে ছাওয়া। এমনি এক পল্লীতে রম্যা রলাঁ থাকেন, মণিদা ও আমি একদিন তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে এলুম।

৫

রলাঁর কুটীরটির একদিকে হ্রদ অপর দিকে পর্বত। হ্রদের শাড়িটির পাড় ধ'রে যেমন পর্বতের পর পর্বত চ'লে গেছে, হ্রদের জল থেকে সোপানের মতো তেমনি পর্বতের ওপর পর্বত উঠে গেছে। হ্রদের কূলে কূলে পর্বতের মূলে মূলে পল্লীর পর পল্লী। রলাঁদের পল্লীটির নাম Villeneuve, আর রলাঁর কুটীরটির নাম Villa Olga।

ভিল্‌নভের অদূরে Chateau de Chillon নামক দ্বাদশ শতাব্দীর একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। বায়রণের কাব্যে এর বর্ণনা আছে, Bonnivardকে এখানে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল; দুর্গটির তিনদিকে জল, একদিকে পর্বত। Bonnivard-এর কারা-কক্ষটি গবাক্ষ থেকে যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রন্থির মতো দিগ্‌বলয়। দেহকে যারা বেঁধেছিল কতটুকুই বা তারা বেঁধেছিল! আসল মানুষটি যে চোখের ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণই ফাঁকি দিত। বরং বন্দী ছিল তাঁর প্রহরীটা।

ভিলা অল্‌গার একপাশে Hotel Byron নামক বৃহৎ হোটেল। রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এইখানে ছিলেন।

রলাঁর কুটীরটির বাহিরটা নিঃস্ব। দেখ্‌লে প্রত্যয় হয় না যে এত বড় একজন সাহিত্যিক এ রকম একটা অসুন্দর ছোট জরাজীর্ণ 'শালে'তে থাকেন। কিন্তু ভিতরটি সাজানো—বসবার ঘরে বই-ভরা শেল্‌ফ, বই-ছড়ানো টেবিল, ফুলের সাজি, ফুলের গাছের টাব্‌, দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়ালজোড়া পিআনো।

রলাঁর সাক্ষাৎ পাবার পরমুহূর্ত পর্যন্ত মনেই জাগেনি যে তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপক।

দীর্ঘদেহ হ্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উল্টো-ক'রে-ধরা পেয়ার ফলের মতো চওড়া সরু উঁচু নিচু। প্রশস্ত উন্নত ললাট,

সুদীর্ঘ শাণিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্র সংকীর্ণ চিবুক। চোখ দু'টিতে কতকালের ক্লান্তি, হরিণশিশুর নিরীহতা। ওষ্ঠে গাম্ভীর চেয়েও সরল হাসি, বেদনায় পাণ্ডুর। সাদাসিধে পোশাক, নীলকৃষ্ণ স্যুট, টাই নেই, পাত্রীসুলভ কলার। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে অন্য হাতে অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ ক'রে এসেছেন, তবু ক্লান্তি নেই, কঠিন খাটছেন, সকাল বেলাটা শুয়ে শুয়ে লেখেন; রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় এমন ব্যাপৃত যে, L'ame Enchantée—(মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা) র চতুর্থ ভাগ এখনও লেখা হয়ে উঠ্‌ল না।

মণীন্দ্রলাল বসুর "পদ্মরাগে"র সুখ্যাতি করলেন, Wagner-কৃত জার্মান অনুবাদ পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্তে"র ভূয়সী প্রশংসা ক'রে তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। "শ্রীকান্তে"র ইতালিয়ান অনুবাদ হয়েছে, ফরাসী অনুবাদ হচ্ছে। দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে ভারতীয় সংগীত শুনে প্রীত হয়েছেন, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্মসঙ্গীতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু মধ্যযুগের পরে উভয় সংগীতের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সংগীতের বহুদূর ছাড়াছাড়ি ঘ'টে গেছে, এখনকার ইউরোপ ও-সংগীত গ্রহণ করবে কি না নিশ্চয় ক'রে বলতে পারলেন না।

এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন আপনার লোকের মতো ঘরোয়া ভাবে মৃদুমিষ্ট হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠ্‌ল অমনি উত্তেজিত হয়ে পড়্‌লেন রাজা লীয়ারের মতো। নির্বাণোন্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্রে আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠ্‌তে পড়্‌তে লাগল, বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে! তন্ময় হয়ে চেয়ার থেকে স'রে স'রে এসে খ'সে পড়েন বুঝিবা! গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন।

প্রতীতির সহিত বল্লেন, নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখ্‌ছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাক্‌বেই। কাতর স্বরে বল্লেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখ্‌ছি অবসান হলো না! তবু অসীম ভবিষ্যতের

দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বল্লেন, আলো জ্বালান্, আলো জ্বালান্, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আর্টিস্টের কর্তব্য নিয়ে কথা উঠ্‌ল। আর্টিস্ট কি কেবল চির-কালের সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাক্‌বে, না, স্বকালের সমস্যা-সমাধানেও সাহায্য করবে? বল্লেন, দুই-ই করবে। সকল যুগের জন্য কিছু, নিজের যুগের জন্য কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মা আছে—কোনোটার কাজ আর্টের পূজা, কোনোটার কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিস্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চা ক'রে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালোর সপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা করবে, ভলতেয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাবে। এর জন্যে যে তার যুগোত্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়, কেননা তার যুগোত্তর সৃষ্টির ভার তার যে-আত্মাটির হাতে সে-আত্মাটি কিন্তু সর্বক্ষণ সজাগ নয়।

মানুষের একাধিক আত্মা আছে একথা রলাঁর রচনার অনেক স্থলেই পড়েছি, তবু মানুষের অখণ্ড ব্যক্তিত্বটাকে এমন খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখার প্রস্তাবে মন সায় দিলে না। তা'ছাড়া সমস্যা তো প্রতিযুগেই আছে, প্রতিযুগেই থাক্‌বে, সেজন্যে ভাব্‌বার ও খাট্‌বার লোকও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আর্টিস্ট তাঁদের কাজ কেড়ে নেবে কেন? তাঁদের বাহন হবে কেন? বিশুদ্ধ আর্টের দেবী কি বড় সহজ দেবী? অসপত্ন পূজা না পেলে কি তিনি বরদান করেন? কালিদাসের যুগের সমস্যার জন্যে কালিদাস কী করেছিলেন? গোটের যুগের সমস্যার জন্যে গ্যেটে কী করেছিলেন? জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, শেক্‌স্‌পীয়রের যুগেও তো সমস্যা ছিল, তাঁর সৃষ্টিতে তার ছায়া দেখিনে কেন? তাঁর স্বকালের প্রতি তাঁর দায়িত্ব দেখিনে কেন? উত্তরে বল্লেন, কিছু কিছু দেখি বৈকি। কিন্তু তাঁর যুগে হয়ত এ যুগের মতো বড় কোনো সমস্যা ছিল না।

মন না মান্‌লেও প্রতিবাদ কর্‌লুম না। এই যথেষ্ট যে আর্টিস্ট্‌কে রলাঁ দেশকালের অনুরোধে বিশুদ্ধ আর্ট চর্চা মুলতুবি রাখ্‌তে বল্‌ছেন না, বিসর্জন দিতে বল্‌ছেন না, বল্‌ছেন শুধু তাই ক'রে নিরস্ত না হ'তে, তাইতেই আবদ্ধ না রইতে। রুশনায়কদের মতো ফর্‌মায়েস দিচ্ছেন না যে, "হে আর্টিস্ট, তুমি

যুগের মনোরঞ্জন করো, যুগতন্ত্রের জয়গান করো, বলো বন্দে-যুগম্", কিংবা ভারত-নায়কদের মতো ফতোয়া দিচ্ছেন না যে, "ঘর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন, হে কবি, তোমার কাব্যবিলাস ছাড়ো, ফায়ার ব্রিগেডে ভর্তি হও, নেহাৎ যদি তা না পারো তো অন্যদের কর্তব্য-সচেতন করতে সব রস ছেড়ে কেবল ঝাল রসের কবিতা লেখো।" তিনি যা বল্‌ছেন তার মর্ম এই যে, মানুষের সমস্তটা যখন আর্টিস্ট্ নয় তখন বিশুদ্ধ আর্ট্ সৃষ্টির অবসরে সে অপর কিছুও কর্‌তে পারে, এবং যেহেতু তার অস্ত্র হচ্ছে লেখনী কিংবা তুলিকা সে-হেতু তারি সাহায্যে সে ধর্মযুদ্ধ কর্‌লে ভালো হয়। এইটে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তিনি আর্টিস্ট্‌কে অন্-আর্টিস্ট হয়ে যুগ-ঋণ শোধ করতে বল্লেও অন্-আর্টকে আর্ট বলেননি, প্রোপাগাণ্ডাকে আর্টের থেকে পৃথক ক'রে যন্ত্র-শস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

কথায় কথায় বল্লেন, টাকার জন্যে আর যাই করুন বই লিখ্‌বেন না। টাকার জন্যে অন্য খাটুনি, আনন্দের জন্যে বই-লেখা। তাঁর নিজের যৌবনে তিনি দারিদ্র্যদায়ে শিক্ষকতা করেছেন, আরো কত কী ক'রে স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, কষ্টার্জিত স্বল্পপরিমিত অবসর সময়কে ফাঁকি দিয়ে সরস্বতীর সেবা করেছেন, কিন্তু সরস্বতীকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেননি।

সমাজের প্রতি আর্টিস্টের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বল্লেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য কিছুটা ক'রে কায়িক শ্রম করা, আর্টিস্টও যখন ব্যক্তি তখন আর্টিস্টেরও এই কাজ করা উচিত।

ম্যাদলীন রলাঁ টিপ্পনী দিলেন, স্বয়ং কায়িক শ্রম করবার অবসর পাননি ব'লে রলাঁর একটা আক্ষেপ থেকে গেছে—তাঁর শরীর ভেঙে পড়্‌বার ওটাও একটা কারণ।

কিন্তু যে-মানুষ জগৎকে জাঁ ক্রিস্তফ্ দিতে পারেন সে-মানুষের শক্তি কায়িক শ্রমে অপচরিত হ'লে কি জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতো না? আর্টিস্ট যদি কায়িক শ্রমে হাত দেয় তো "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টে"র আশঙ্কা থাকে না কি?

ম্যাদলীন রলাঁ বল্লেন, এমন কোনো কথা নেই। এই যে তিনি অর্থাভাবে ছেলে পড়িয়ে সময় ক্ষয় কর্‌তে বাধ্য হলেন, এর বদলে যদি কায়িক শ্রম কর্‌লে

চল্‌ত (অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের জন্যে আবশ্যক অর্থ জুটত) তবে তাঁর স্বাস্থ্যের এ দশা হতো না, তিনি আরো কত সৃষ্টি করতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস এই আত্যন্তিক স্পেশালিজেশনের যুগে সর্বমানবকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখবার জন্যে ত একটা-কিছু দরকার, নইলে উর্ধ্বশ্রেণীর মানুষ নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বুঝবে কী সূত্রে? যারা গতর খাটিয়ে খায় তাদের উপর থেকে যারা মাথা খাটিয়ে খায় তাদের অবজ্ঞা ঘুচবে কী ক'রে?

বুঝ্‌লাম মহাত্মাজীর সর্বভারতীয় যোগসূত্র যেমন চরকা, রলাঁর সর্বমানসিক মিলনসূত্র তেমনি কায়িক শ্রম। উভয়ের মনের এই ভাবটি টল্‌স্টয়ের সুরে বাঁধা। শ্রমীদের ওপরে বিশ্রামীদের পরগাছাবৃত্তি পৃথিবীসুদ্ধ মানবপ্রেমিককে ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজের যেসব দাস-মক্ষিকা এত যুগ ধ'রে সমাজের রাণী-মক্ষিকাদের জন্যে আনন্দহীন খাটুনি খেটে এসেছে, সেই সব দলিত মানব আজ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটা হচ্ছে শূদ্র বিদ্রোহের যুগ। তারা বলছে, পেটের দায় তো প্রতি মানুষেরই আছে, একলা আমরা কেন খেটে মরব? এসো সকলে মিলে দায় ভাগ করে নিই, কায়িক শ্রম তোমরাও করো আমরাও করি। শূদ্রবিদ্রোহের এই মূল-ধুয়াটার জগৎ জুড়ে মহলা চলেছে, বৈশ্যরা ভয়ে কাঁপছেন, ক্ষত্রিয়রা ঘটা ক'রে গোঁফে তা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণরা রক্ষার উপায় খুঁজছেন।

সাময়িক একটা রক্ষার দিক থেকে রলাঁ-গান্ধীর প্রস্তাব-মতো প্রতি মানুষের আংশিক শূদ্রীকরণের মূল্য আছে, সন্দেহ নেই। এঁরা না বল্লেও ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে শূদ্রধর্ম স্বীকার করতেই হবে সকলকে। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলেই একদিন ক্ষাত্রধর্ম স্বীকার করেছিল। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলকেই আজ বৈশ্যধর্ম স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনকার দিনে এমন কোন আর্টিস্ট আছেন --ব্রাহ্মণ আছেন—যিনি অন্নবস্ত্রের জন্যে অর্থ উপার্জন করছেন না? কেউ আর্টের বিনিময়ে করছেন, কেউ অন্য কিছুর বিনিময়ে করছেন। আর্টের বেশ্যাবৃত্তি যাঁর কাছে নীতিবিরুদ্ধ আর্টেতর বৈশ্যবৃত্তি তাঁর ভরসা। রলাঁ টাকার জন্য বই লেখেননি, কিন্তু ইস্কুলমাস্টারী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু জমিদারী করেছেন। দায়ে প'ড়ে পরধর্মের শরণ না

নিয়ে যখন উপায় নেই তখন শূদ্রোচিত কায়িক শ্রম ভালো, না, বৈশ্যোচিত মস্তিষ্ক-বিক্রয় ভালো? রলাঁর মতে প্রথমটা। যদিও কার্যতঃ তিনি দ্বিতীয়টার আশ্রয় না নিয়ে পারেননি। কারণ, হাতের দাসত্বের চেয়ে মাথার দাসত্বের বাজারদর বেশি—এক বোল্‌শেভিক রাশিয়া ছাড়া সর্বত্র।

কিন্তু একটা না একটা দাসত্ব কি করতেই হবে চিরকাল? এমন দিন কি আসবে না যেদিন মানুষমাত্রেই সর্বতোভাবে স্রষ্টা হবে নিজের নিজের ক্ষেত্রে, বিচ্যুত হ'তে বাধ্য হবে না স্ব-স্ব ধর্ম থেকে? শূদ্রত্বের অগৌরব সকলে মিলে ভাগ ক'রে নিলে তো রোগের জড় মরে না, সকলে মিলে রোগে ভোগা যায় মাত্র। লেবারের ডিগ্‌নিটি প্রমাণ করার জন্যে সকলে মিলে ম্যানুয়াল লেবার করলে তো বেগার খাটার নিরানন্দ অপ্রমাণ হয় না, কর্মের দাসত্বকে "কর্তব্য" আখ্যা দিয়ে নিজেদের ভোলানো হয় মাত্র। প্রতিভার প্রেরণায় যে-মানুষ চাষ করে সুতো কাটে, সে-মানুষের শূদ্রত্বে দাসত্বের গ্লানি কোথায় যে, তাই ভাগ ক'রে নেবার জন্যে রলাঁকে চাষ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে চরকা কাটতে হবে? সমাজ ধনী হবে, যদি প্রতি মানুষের প্রতিভা পায় আপন চরিতার্থতা। বিকচ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে যে জটিল সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হবে সেই সামঞ্জস্যই তো সমাজের আদর্শ, সেই সনাতন, সেই তো সম্পূর্ণ। চাতুর্বর্ণের সাঙ্কর্য ঘটিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যধ্বংসী বহিঃসাম্য স্থাপনা করলে সাময়িক একটা রফা হয়তো হয়, কিন্তু মানুষের এতে তৃপ্তি নেই। মানুষ চায় স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, এ ছাড়া আর সমস্তই তার পক্ষে দাসত্ব। শূদ্রকে দাও স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, তার শ্রম হোক তার কাছে গান গাওয়া ছবি আঁকার মতো আনন্দময়, তার শ্রমের পুরস্কারে সে রাজা হোক—কিন্তু অশূদ্রকে স্বধর্মচ্যুত করে পূর্ণতঃ হোক অংশতঃ হোক শূদ্র কোরো না; তার বীণা তুলি কেড়ে নিয়ে তাকে কাস্তে হাতুড়ি ধরিয়ো না; মাত্র আধঘণ্টার জন্যে হলেও তাকে দিয়ে চরকা কাটিয়ো না।

কায়িক শ্রম সম্বন্ধে আমার এই সব ধারণা আমি রলাঁকে জানাইনি। জানালে সম্ভবতঃ তিনি বলতেন যে, একই মানুষ কি ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই হ'তে পারে না? প্রতি মানুষের মধ্যে যে একাধিক আত্মা আছে। Mœterlinck নাটক

লেখেন, লাঙল ঠেলেন, মৌমাছি ও পিঁপ্ড়েদের তদারক ক'রে প্রামাণিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লেখেন—তাঁর তা হলে গোটা তিনেক আত্মা। কোনোরকম কায়িক শ্রমের প্রতি যার একটাও আত্মার একটুও রুচি নেই এমন মানুষ সম্ভবতঃ একজনও পাওয়া যাবে না।

এমন যদি তিনি বল্‌তেন তবে আপত্তি করতুম না। নিজেকে নানা-দিকে কুশলী করবার সাধ মানুষমাত্রেরই আছে। এই সাধ যদি মানুষ মাত্রকেই সুতো কাটা নামক কাজটিতে কৃতী হ'তে প্রেরণা দেয় তবেই সে চরকা ধরবে। নতুবা স্পেশালিজেশনের প্রতিকার স্বরূপ কিংবা সর্বতোভাবে আত্মসম্পূর্ণ হবার দুরাশায় কিংবা সর্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হবার ধারণায় যদি ধরে বা ধর্‌তে বাধ্য হয় তবে সেটা হবে তার সৃষ্টির সতীন, তার অন্তরের দাসত্ব। আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও সেটা তার স্বাধীনতার শ্বাসরোধী। সর্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্ব-মানবের যে একীকরণ সে-মন্ত্রের উদ্‌গাতা যদি রলাঁ-গান্ধী-টলস্টয়ও হন্ তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।

মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? রলাঁ বল্লেন, এ যুগের লোকের দুঃখ সুখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না ব'লে। ভিক্টর উগোর মতো জনসাধারণের কবি থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়্‌ত বৈকি।

এবার তাঁর মনের আরেকটা কোণ ছোঁয়া গেল। তাঁর কাছে আর্টের অভীষ্ট সমঝদার, আলটীমেট্ সমঝদার—জনসাধারণ। জনসাধারণের জন্যেই আর্ট। তিনিই একদিন People's Theatre-এর পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু শিব তা থেকে যদি একজন মানুষও বঞ্চিত থাকে তবে আর্টিস্টের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। তা ব'লে তিনি কোথাও এমন বলেননি যে জন-সাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন খাঁটি আর্টের আবেদন এমন গভীর যে, নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়। প্রমাণ, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক। ও-জিনিস বোঝ্‌বার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার থাকতে পারে, কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। শেক্‌স্‌পীয়র দেখবার জন্যে ইতর সাধারণের আগ্রহ শিক্ষিতদের আগ্রহকে

ছাড়িয়ে যায়।

চা খেতে খেতে শেষ কথা হলো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে। সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে তবে তার জন্যে কি সাহিত্যিক দায়ী হবে? বল্লেন, ধর্মের প্রভাবে জগতে কত যুদ্ধই ঘ'টে গেছে, তার জন্যে কি কেউ ধর্ম-সংস্থাপকদের দায়ী করে? সাহিত্যিক যদি সুস্থমনা হয়ে থাকে তবে সমাজের সত্যিকার আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যিকার আদর্শের বিরোধ হবে না; আর যদি অসুস্থমনা হয়ে থাকে তবে তার রচনাকে সাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যকে সাজা দেওয়া সাজে না।

রলাঁর কথাগুলির প্রতিলিপি দিতে পারলুম না, ভাবছায়া দিলুম। এইখানে বলে রাখি যে, এই আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হয়েছিল মণি-দাতে ও রলাঁতে; এবং আমি ফরাসী ভালো না বুঝতে পারায় তথা রলাঁ ইংরেজী আদৌ না বলতে পারায় মণি-দার ও কুমারী রলাঁর ওপরে আমাকে এতটা নির্ভর করতে হয়েছে যে-এই লেখায় অনেক ভুলচুক থেকে গিয়ে থাকতে পারে। তবু মোটের ওপর এতে কিছু এসে যাবে না এই জন্যে যে, এই আলাপ-আলোচনার আগে ও পরে বহুবার আমি রলাঁর মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-পরিচিত হয়েছি। এসব তাঁর মুখে নতুন শুনলুম এমন নয়। আমরা তাঁর কথা শুনতে যাইনি, আমরা গিয়েছিলুম তাঁকে শুনতে—ও তাঁকে দেখ্‌তে। কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন কি না, এইটি জানবার জন্যে প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার যে-কল্পমূর্তিটি গড়া যায় বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা ক'রে না দেখা পর্যন্ত সৃষ্টিটাকেই পূর্ণরূপে দেখা হয় না।

জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে কল্পমূর্তিটিকে গড়েছিলুম সে-মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলতে হলো ব'লে দুঃখ হলো, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাসতে বাধ্‌ল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাকলে শ্রদ্ধা বাড়্‌ত, কিন্তু ঐশ্বর্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহে মনে সুসমঞ্জস পার্সন্যালিটি বলতে একমাত্র রবীন্দ্র-নাথকে দেখেছি, গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রলাঁকে দেখে হলুম। এঁদের

দেহ এঁদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ও আগুনকে ঢেকেছে; সন্ন্যাসীরা গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি তেমনি রলাঁর প্রতি এমন একটি মমতা জাগ্‌ল যেমনটি নিছক গুণীব্যক্তির প্রতি জাগে না। ভালো লাগা ভালোবাসার মধ্যে কোন্‌খানে যে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে চিন্তা করে তার নির্দিশ পাইনে, বোধ ক'রে তার অস্তিত্ব জানি। এক-একটা বিরাট পার্সন্যালিটির সংস্পর্শে এসে এই বোধ-ক্রিয়াটি একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬

ফরাসীদের পারী নগরীর নামে পৃথিবীসুদ্ধ লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। 'আরব্য রজনীর বোগ্‌দাদ্‌ আর কথাসাহিত্যের পারী উভয়েরই সম্বন্ধে বলা চলে, "অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা।" পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই। দুই হাজার বৎসর তার বয়স, তবু চুল তার পাক্‌লো না। কতবার তাকে কেন্দ্র ক'রে কত দিগ্‌বিজয়ীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো, কতবার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুট্‌ল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসজ্ঞ ও কত দুঃসাহসী, বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন, সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নাট্যকলায় সুগন্ধিশিল্পে পরিচ্ছদকলায় স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠ্‌ল। পারীই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবান সম্ভোগপ্রার্থীদের জন্যে খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতিদেশের নিঃসম্বল শিল্পী ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্যে মুক্ত। একদিক থেকে দেখ্‌তে গেলে পারী রূপোপজীবিনী, আমেরিকান ট্যুরিস্টদের হীরা-জহরতে এর সর্বাঙ্গ বাঁধা পড়েছে, তবু জাপান অস্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা থেকেও শৌখীন বাবুরা আসেন এর দ্বার-গোড়ায় ধর্না দিয়ে একটা চাউনি বা একটু হাসির উচ্ছিষ্ট কুড়োতে। অন্যদিক থেকে দেখ্‌তে গেলে পারী অন্নপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল্‌ রুশ্‌ রুমেনিয়াকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেত-সেনার নায়ক

করে এবং নানাদেশের যে অসংখ্য বিত্তার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভরে গেছে তাদের কত বিত্তার্থীকে সে বিত্তার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও যোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত ট্যুরিস্ট্ আসে না; পারী দেখ্তে প্রতি বৎসর যে কয়-লক্ষ বিদেশী আসে, তাদের পনেরো আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারীই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের লোকের চোখে পারী হচ্ছে লণ্ডন ভিয়েনা বার্লিন মস্কোর চেয়েও আন্তর্জাতিক। আমেরিকান বিত্তার্থীতে পারী ছেয়ে গেছে, আর ইউরোপের নানাদেশের বিত্তার্থীদের কাছে পারী চিরকালই আমাদের কাশীর মতো কালচার-পীঠ। শুধু কাশী নয় কামরূপও বটে, যত রাজ্যের রোমান্স-পিপাসু এই নগরীতেই তীর্থ করতে আসে।

আয়তনে ও লোকসংখ্যায় পারী লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক, কলকাতার প্রায় তিন গুণ। আজকালকার দিনে একটা শহরের সঙ্গে আরেকটা শহরের বাইরে থেকে যে তফাৎ সেটা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বড় ভাইয়ের তফাৎ, বয়স ও বুদ্ধির উনিশ-বিশ থাকলেও পারিবারিক সাদৃশ্য উভয়েরই মুখে।

পারীতে ট্রাম মেট্রো বাস্ ট্যাক্সি ধোঁয়া কাদা বস্তি ব্যারাক লণ্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোটরগাড়ি কিছু বেশি সংখ্যক, বাড়িগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটের ওপর পারী লণ্ডনের মতো ফিট্ফাট্ নয়, বেশ একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরীব। উঁচুদরের বাস্তুকলা তার কয়েকটি প্রাসাদে সৌধে থাক্লেও লণ্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ির নেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদসৌধের ছবি দেখে পারীকে যা ভাবি সর্বসাধারণের বাসগৃহ দেখ্লে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাসগুলি, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদীটি, সর্পিণীর দুই রসনার মতো সেন্ নদীর দু'টি অর্ধের মধ্যবর্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপান্তে প্রমোদোত্তান দু'টি।

পারীতে লণ্ডনের মতো পার্ক বিরল; তবে তার একটি রাজপথ এক একটি সরলরেখাকৃতি পার্ক বিশেষ। পারীর নিতান্ত মাঝারি রাজপথগুলিও সেণ্ট্রাল্

এভিনিউর চেয়ে চওড়া। "সাঁজেলিসী"র এক পাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপশি দশটা চৌরঙ্গীর মতো। সে তো একটি রাজপথ নয় একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথ, রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক একটি দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক একটা বুলভার্দ এক একটা বিরাট ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রস্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে একথা খাটে যে, একটি রাস্তা মানে একটি রাস্তা নয়, সমান্তরাল দু'টি তিনটি রাস্তা, কোনো কোনো স্থলে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলি ক'রে ভাগ আছে, যেমন ইন্দ্রধনুর সাতটি ভাগ। প্রথম ফুট্‌পাতের পরে রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, তারপরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তারপরে আবার গাছের পার্টিশান্‌, তারপরে আবার রাস্তা, তারপরে আবার ফুট্‌পাত। সব রাস্তার অবশ্য একই রকম ভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুট্‌পাতের ওপরে স্থলে স্থলে ছোট ছোট দোকান আছে, যেমন পুরীর "বড় দাণ্ড"র ওপরে অস্থায়ী ছোট ছোট দোকান। এক একটা ফুট্‌পাথও রাস্তার মত চওড়া, স্থলে স্থলে এই সব দ্বীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান। ঠিক আমাদের দেশের মতো সে সব দোকানে ভিড় জমেছে, দরদস্তুর চলেছে, হৈচৈ হট্টগোল।

আমাদের সঙ্গে ফরাসী ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদ্‌শাহী রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বল্লে বোধ হয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রাম-প্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা ব'লে এরা বড় কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী খুব খাটতে পারে ব'লে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করবার সময়ও জামা সেলাই করছে, শৌখিন জামা। জামাকাপড়ের শখটা ফরাসীদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ ক'রে ফরাসী মেয়েদের ও শিশুদের, পুরুষরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ্‌ তাদের জাঁদরেলী গোঁফ,

তাদের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর তত নজর তাদের-স্নান-না-করা গায়ের দিকে নেই। সুগন্ধিশিল্প পারীকে আশ্রয় করবার কারণ হয়তো এই। হাঁ, পারীর লোক খুব খাটতে পারে বটে, খুব ভোরে উঠে খাট্‌তে আরম্ভ ক'রে দেয়, অনেক রাত অবধি খাটে, কিন্তু পানাহারটা সেই অনুপাতে ঘটা ক'রেই করে। এরা ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ বেশি খায় না, লাঞ্চটা ইংলণ্ডের তুলনায় বেশি খায়, আর ডিনারটা ইংলণ্ডের তুলনায় রাত ক'রে খায়। আহার সম্বন্ধে এদের মোগ্‌লাই রুচি, গোপালের মতো যাহা পায় তাহা খায় না, রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে তো পারীতে। এত রকমের খাদ্য এত সস্তায় কেন অনেক দাম দিয়েও লণ্ডনে পাবার যো নেই। দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমঝ্‌দার, সেই জন্যে যে-কোনো রেস্তোরাঁয় সব দেশনের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পারীতে অত্যল্প খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সহিত খেতে পারা যায়। রান্নাটা উঁচুদরের তো বটেই, রান্নাটা টাট্‌কা। শাক-সব্জী ও মাংসের জন্যে ইংলণ্ড অন্য দেশের মুখাপেক্ষী, ফ্রান্স তেমন নয়।

এ তো গেল আহার-তত্ত্ব। ফরাসীরা পাননিপুণও বটে। যে কোনো রেস্তোরাঁয় গেলে ভোজ্য তালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা পানীয় তালিকাও দেয়। ও রসে বঞ্চিত ব'লে খাঁটি খবর দিতে পারব না, কিন্তু সে জন্যে অপদস্থ হয়েছি পদে পদে। এ কেমন মানুষ যে "ভ্যাঁ" খায় না।—এই ভেবে ওরা হাঁ ক'রে তাকায়। আমি মনে করেছিলুম ইংরেজরাই ভারি মদ খায়, কেননা লণ্ডনের অলিতে গলিতে "পাব্লিক বার"। ও হরি! পারীতে গলিতে গলিতে যে, একটা নয় দুটো নয় পঞ্চাশটা কাফে! লণ্ডনে কাফে নেই, কাফে নামধেয় যা আছে আসলে তা রেস্তোরা, লণ্ডনের রেস্তোরাঁর সংখ্যা পারীর তুলনায় আঙুলে গোনা যায়।

এই কাফে জিনিসটি ফরাসী সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলিতেই তৈরী হয়েছে, ইংলণ্ডের ইতিহাস যেমন তৈরী হয়েছে তার ইস্কুলগুলির প্লেগ্রাউণ্ডগুলিতে। পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো যতগুলি বিপ্লবের

অভিনয় প্যারীতে হয়ে গেছে সকলগুলির রিহার্সল্ হয়েছিল কাফেগুলিতে, কাফেই হচ্ছে ফরাসীদের চণ্ডীমণ্ডপ, ফরাসীদের ক্লাব। কাফেতে গিয়ে এক পেয়ালা কাফী বা শোকোলা ("Chocolet") বা হাল্কা মদের ফরমাস ক'রে যতক্ষণ খুশি ব'সে আড্ডা দাও— দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা ! তাস খেলো, দাবা খেলো, গান বাজ্না শোনো, কাগজ পড়ো, চিঠি লেখো, ছাত্র হয়ে থাকো তো পড়া করো। কাফেতে একবার গিয়ে বস্লে আর উঠ্তেই ইচ্ছে করে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চল্তে থাকে ইয়ার্কি দেওয়া, ফ্লার্ট করা, একটু আধটু নেশায় ধর্লে রঙ্গকৌতুক থেকে মাথা কাটাকাটি পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা। ওরি মধ্যে একটু স্থান ক'রে নিয়ে একটু-আধটু নাচও স্থলবিশেষে হয়। অনেক তপস্বীর তপস্যা আর অনেক কুঁড়ের কুঁড়েমি দু-ই একসঙ্গে চল্তে থাকে যখন, তখন একথা বিশ্বাস হয় না যে এদের কেউ কোনোদিন জগৎকে ধন্য ক'রে দেবে চিন্তাবৈশিষ্ট্যে, অবাক ক'রে দেবে কর্মনেতৃত্বে, মুগ্ধ ক'রে দেবে অভিনেত্রীরূপে। তখন এই কথা মনে হয় যে, এদের যেমন খাটুনির সীমা নেই তেমনি কুঁড়েমিরও সীমা নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল মজ্লিসী রসিকতা আর মজ্লিসী আদবকায়দা আর মজ্লিসী সুরাপান।

এই একটা মস্ত জিনিস যে কাফে ভয়ানক সস্তা। দু'চার আনা খরচ ক'রে দু'ঘণ্টা এক স্থানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা— লণ্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলিতে তর্কসভা বসে— সেইগুলোই আমাদের ভাবী যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভাবী সাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভাবী রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘটবে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের মাটিতে শিকড় গেড়ে আমাদের বট অশ্বত্থের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন আমার মনে হয় না। ঐ চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা ক'রে পাঠাগার জুড়ে দিলে ঐগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।

কাফের মতো 'পাতিসেরী'গুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরী মানে কেক্ রুটির দোকান, ওখানে গিয়ে কেক্ কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতিসেরীতে চা-কাফী খাবার জন্যে একটু ঠাঁই করে দেওয়া হয়, সেই

সুযোগে গল্প জমে, তর্ক ওঠে, আলাপ-পরিচয় হয়, দেশের মানুষ দেশের মানুষকে চিন্‌তে চিন্‌তে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিন্‌তে চিন্‌তে বিদেশকে চেনে। ফরাসীরা ইংরেজদের মতো নীরবপ্রকৃতি নয়, গম্ভীরপ্রকৃতি নয়, ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু'একটা তুচ্ছ প্রশ্ন ক'রে চুপ করে না, ওরা বকে আর বকায়।

পারীর লোক জন্ম-রসিক। আমোদের জন্যে এমন অকৃপণ ব্যবস্থা কুত্রাপি নেই। অবশ্য আমোদ মাত্রেই বিশুদ্ধ নিষ্পাপ হরিনাম জপ করা নয়, বরং বহুক্ষেত্রে পঙ্কিল। পথে ঘাটে জুয়ার আড্ডা। এ আপদ লণ্ডনে নেই। পথেঘাটে নাগরদোলা প্রভৃতি শিশুসুলভ কৌতুক। খেলাধুলার রেওয়াজ ইংলণ্ডের মতো নেই। ইংলণ্ডে মাঠে মাঠে ফুটবল খেলা, টেনিস খেলা, সাঁতার। ইংরেজরা জন্ম-খেলোয়াড়। স্বাস্থ্যচর্চাটাকেই ওরা চরম বলে জেনেছে। ঐখানে ওদের জিৎ।

পারীতে অন্ততঃ বিশটি উঁচুদরের থিয়েটার আছে। এছাড়া সিনেমা, "কাবারে" (cabaret), সংগীতশালাও আছে। "কাবারে"গুলি পারীর বিশেষত্ব, লণ্ডনে নেই, লণ্ডনে প্রবর্তন করবার প্রস্তাব অনেকে করছেন। এর সঙ্গেও ফরাসী ইতিহাসের যোগ আছে, কেননা এতে যে সব নাচ তামাসা হয়, সে সব অনেক সময় পলিটিক্যাল ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সংগীতশালা পর্যায়ভুক্ত এমন সব রঙ্গালয় আছে যেখানে কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখানো হয়, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্বন্ধ নেই, এবং দৃশ্যের সঙ্গে বাদ্য আছে, কিন্তু কথা নেই। একে বলে "revue", এ জিনিস লণ্ডনেও প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এ জিনিস আসরে নামাতে অনেক টাকা অনেক বুদ্ধি ও অনেকখানি "নির্লজ্জতা" দরকার। এ সকলের সমন্বয় লণ্ডনে দুর্লভ, লণ্ডনের লোক এক নম্বরের শুচিবায়ুগ্রস্ত। পারীর লোক বিবসনা স্ত্রী মূর্তি দেখে শক্‌ড্‌ হবে, এমন কচি খোকা নয়। তারা অতি অল্প বয়স থেকে পারীর দশ বারোটা মিউজিয়ামে গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখে চোখকে শিক্ষিত ও চিত্তকে নির্বিক্ষেপ করেছে; তারা রুশো-ভল্‌তেয়ার ও জোলা-ফ্লোবেয়ারের রচনা প'ড়ে সুনীতি দুর্নীতি ও সুরুচি কুরুচির হিসাব-নিকাশ করে রেখেছে; তারা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের নাগরিক,—ন্যাকামি বা নাসিকা-সীট্‌কারকে তারা

উচ্চাঙ্গের মর‍্যালিটি বলে না, তারা সুন্দরের সমঝদার মানবদেহকে সুন্দর ব'লে জানে। "মুল্যাঁ রুজ" বা "ফোলী বের্‌জেয়ারে" অর্ধ-বিবসনাদের নির্নিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ ক'রে শক্‌ড্‌ হতে পিউরিটান নিউ ইংলণ্ডের ট্যুরিস্ট্‌রা দলে দলে যান, আসল ফরাসীরা যায় কিনা সন্দেহ, যদি বা যায় নৃত্য নৈপুণ্য খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো শিক্ষা নিয়ে যায়, কেবল একজোড়া কৌতূহলী চক্ষু ও একটা শুচি-বায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে যায় না। পারীর বহুসংখ্যক প্রমোদাগার বিদেশীদের জন্যেই অভিপ্রেত এবং তাদেরই দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। মার্কিনের টাকার লোভে মার্কিনের বৈশ্যসুলভ স্থূল রুচির ফরমাস তারা খাটছে। এই আভিজাত্যহীন পছন্দ-বোধ, এই চর্চা-অবসরহীন পল্লবগ্রাহী সমঝদারী, এই অবিশ্রান্ত অফুরন্ত থ্রিল-পিপাসা ফরাসী কাল্‌চারকে ডলারের গোলা মেরে উড়িয়ে দিতে বসেছে। এর আক্রমণে ফরাসীদের বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো আর বেশিদিন টিকবে না, ফরাসী সভ্যতার সরস্বতী অবশেষে বাঈজীর মতো সস্তা গান শুনিয়ে ও সস্তা নাচ নেচে সরাব পান ক'রে নাসিকাধ্বনি করবেন। ফরাসী জাতিটার অমেয় জীবনীশক্তির ওপরে আমার অটল আস্থা আছে ব'লেই যা আশা হয় চতুর্দশ লুই ও প্রথম নাপোলেঅঁর দেশ এই নতুন আঘাতকে যথাকালে কাটিয়ে উঠবে, এই বিষকেও পরিপাক করবে নীলকণ্ঠের মতো।

ফরাসীরা একটা আত্মবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিস্ট, তারা দু'দল চরমপন্থীর সমষ্টি—গোঁড়া ক্যাথলিক আর গোঁড়া যুক্তিবাদী। যারা মানে তারা সমস্ত মানে, ঈশ্বর শয়তান স্বর্গ নরক যীশু যীশুর কুমারী মাতা পোপ কন্‌ফেশন প্রতিমা কর্মকাণ্ড। যারা মানে না তারা কিছুই মানে না, তারা জ্ঞানমার্গের নাইহিলিস্ট, তারা বদ্ধ সীনিক, তারা পাঁড় এপিকিওর। জাতটা অতিমাত্রায় শক্তের ভক্ত অথচ নৈরাজ্যবাদী। বাঙালি জাতটার সঙ্গে এ বিষয়ে এদের মিল আছে—যেমন ইমোশনাল তেমনি নাস্তিক; যারা মানে তারা মন দিয়ে মানে না, হৃদয় দিয়ে মানে, যারা মানে না তারা মন দিয়ে উড়িয়ে দেয়, হৃদয় দিতে পারে না। নইলে আনাতোল ফ্রাঁসের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ কখনো গত মহাযুদ্ধের মতো নির্বোধ একটা ব্যাপারের জন্য পর্যন্ত দেখেও সস্তা পেট্রিয়টিজমের ঢাক

পিছুতে যান ?

গোঁড়া ধার্মিক হ'ক গোঁড়া অধার্মিক হ'ক রসবোধ জিনিসটা এদের জাতিগত, ও জিনিস এরা খ্রীস্টধর্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি ব'লে ও নিয়ে এরা ঝগড়া করে না। Venus de Milo-র নগ্ন সৌন্দর্য এরা পিতাপুত্র মিলে দেখে এবং পিতাপুত্রে মিলে আলোচনা করে। উলঙ্গতা নিয়ে তর্ক বাধে না, ওটা চোখসওয়া হয়ে গেছে, ওটা উভয় পক্ষেই আবশ্যক ব'লে ধ'রে নিয়েছে, তর্ক বাধে সৌন্দর্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বললে অবান্তর হয় না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটা তফাৎ আছে—ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক প্রভৃতি জাতিরা দেহকে প্রগাঢ় ভালবাসে ও ভক্তি করে, সহজিয়াদের মতো দেহের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজে পায়। এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতারা সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃমূর্তি আঁকে তখন স্তনের ওপরে বস্ত্র টেনে দেয় না, যখন বালক যীশু আঁকে তখন খামোখা কৌপীন পরিয়ে দেয় না, বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতৃমূর্তির মুখে তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলে। উত্তর ইউরোপের লোক প্রোটেস্টান্ট, গোঁড়া নিরাকারবাদী, ওদের চিত্রকলা একান্ত দরিদ্র, ভাস্কর্যের বালাই ওদের নেই। ওরা মুসলমান, এরা হিন্দু। ওদের তেজ বেশি, এদের লাবণ্য বেশি।

এখন বলি পারীর থিয়েটারগুলির কথা। প্রথমত পারীর থিয়েটারগুলি অসম্ভব সস্তা, দ্বিতীয়ত তাদের আয়োজন অসম্ভব জাঁকালো। লণ্ডনে যত খরচ ক'রে যে-দরের সাজসজ্জা বা যে-দরের অভিনয় দেখ্‌তে পাওয়া যায় পারীতে তার সিকিভাগ খরচ ক'রে তার চারগুণ ভালো সাজসজ্জা চারগুণ ভালো অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসীরা ভালো জিনিসের কদর বোঝে, দলে দলে দেখতে যায়, প্রত্যেকে অল্প অল্প দিলেও সবসুদ্ধ অনেক টাকা ওঠে, ফলে প্রযোজনার খরচ পুষিয়ে যায়। এছাড়া গভর্ণমেণ্টও থিয়েটারওয়ালাদের অর্থসাহায্য করে, যদিও সাহায্যস্বরূপ ডান হাতে যা দেয় ট্যাক্সস্বরূপ বাঁ হাতে তা ফিরিয়ে নেয় ব'লে থিয়েটারওয়ালাদের আক্ষেপ। তবু এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, গভর্ণমেণ্ট ডান হাতে যা দেয় ওটা মূলধনের কাজ

ক’রে ও ঐ থেকে উচ্চাঙ্গের প্রযোজনার গোড়াকার খরচ জোটে।

পারীর থিয়েটারগুলোর জাতিবিভাগ আছে, যেটাতে অপেরা হয় সেটাতে কেবল অপেরাই হয়, যেটাতে কমেডী হয় সেটাতে কেবল কমেডীই হয়, যেটাতে ক্লাসিক (গ্রীক নাটকের অভিনয়) হয় সেটাতে কেবল ক্লাসিকই হয়। লণ্ডনে কোন স্থায়ী অপেরা গৃহ নেই এবং জাতিবিভাগ নেই। একটি স্থায়ী অপেরার স্কীম চলেছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এক পেনীও সাহায্য করবে না এবং জনসাধারণও যথা-প্রয়োজন শেয়ার কিন্‌বে কিনা সন্দেহ। সুতরাং যতদূর দেখছি লণ্ডনের ভাগ্যে আছে ভ্রাম্যমান অপেরার দলগুলির মধ্যে মধ্যে শুভাগমন। তাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি ব্রিটিশ সেগুলি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পায় না ব’লেই হোক কিংবা জনসাধারণের ঔদাসীন্তবশতই হোক কণ্টিনেণ্টাল দলগুলির কাছে মাথা তুলতে পারে না। কণ্টিনেণ্টাল দলগুলিতে অনেক দেশের শিল্পীরা যোগ দেয়, তাদের পেছনে অনেক দেশের টাকার জোর। পারীর যেটি স্থায়ী অপেরাগৃহ সেটি পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়, তার পেছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তার সাজসজ্জা বহুকালগত, তার নট-নটীরা সমাজে বিশিষ্ট সম্মান পায়, তাতে তাদের গভর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ঢালে ও সেটি তাদের জাতীয় সম্পত্তি *। অথচ তার সীটগুলি যথেষ্ট সস্তা। পারীর দরিদ্রতম শ্রমিকও তার নিম্নতম শ্রেণীর দাম জোটাতে পারে। ধনী দরিদ্র সকলেরই জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মহার্ঘ বেশভূষা প’রে মহৈশ্বর্যময় স্টেজে অবতীর্ণ হন। পারীর অন্যান্য থিয়েটারগুলোরও প্রযোজনা খুব চমকপ্রদ, অথচ সীট আরো সস্তা; চার আনা দিয়ে তিন ঘণ্টা আমোদ উপভোগ করতে পারা যায়। তবে এটা ঠিক, লণ্ডনের সীটের আরাম পারীর সীটে নেই, লণ্ডনের লোক চেয়ার ছেড়ে কাঠের বেঞ্চিতে ঘেঁষাঘেষি ক’রে বস্‌তে চাইবে না। পারীতে অনেক শ্রেণীর সীট্ আছে, অন্তত দশ-বারো শ্রেণীর; কিন্তু উচ্চতম থেকে নিম্নতম অবধি অল্প দামের ক্রমান্বিত ব্যবধান। চার আনার পরে ছ’আনা, ছ’আনার প’রে আট আনা, এমনি ক’রে সব চেয়ে দামী সীট্

* ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টে একজন মিনিষ্টার অফ ফাইন আর্টস থাকেন ইংলণ্ডে সেরূপ নেই, ইংরেজরা সব বিষয়ের মতো এ বিষয়েও প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের পক্ষপাতী।

হয়তো চার টাকা। লণ্ডনে কিন্তু এক টাকার পরে দু'টাকা তার পরে তিন টাকা, এমনি ক'রে সব চেয়েদামী সীট্ হয়তো পনেরো টাকা। সেইজন্যে ইংরেজরা থিয়েটারের চেয়ে সিনেমাই দেখে বেশি, গরীব লোকদের সঙ্গতি নেই ব'লে তাদের রসবোধ অচরিতার্থ থেকে যায়। ইংরেজরা আর্টকে সর্বসাধারণের হাতে দেবার মতো স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে পারেনি, (এদিকে একমাত্র সফল প্রচেষ্টা "Old Vic"), সেইজন্যে আর্ট এদের কাছে গঙ্গাজলের মতো ন্যাশন্যাল নয়। আমরাও যে গ্রামের লোককে গ্রামছাড়া ক'রে শহরের কোণে কোণে বস্তি গড়ছি, আমাদেরও ভাবা উচিত গ্রামের যাত্রা পার্বণ কথকতা থেকে ও শহরের নাট্য সংগীত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা সমগ্র দেশকে নিরানন্দ ক'রে তুলছে কি না। নাগরিকতার নাগপাশে জড়িয়ে ইংলণ্ডের আত্মা যে একান্ত ক্লিষ্ট বোধ করছে ইংলণ্ডের অসামান্য স্বাস্থ্যের আড়ালে ঢাকা পড়লেও তা সত্য। নাগরিক ইংলণ্ড প্রাণবান, কিন্তু অমৃতবান নয়; অজয় কিন্তু অমর নয়।

ফরাসীদের আর একটা জাতীয় সম্পদ্ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎ-প্রসিদ্ধ লুভর্ ছাড়া লুক্শাবুর্গ ত্রোকাদেরো গীমে ইত্যাদি আরো ডজনখানেক ছোট বড় মিউজিয়াম আছে পারীতে। লুভরের ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না, তার আকার এত বড় যে সেটা একটা যাদুঘর নয় একটা যাদু-পাড়া, সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু'দিন লেগে যায়। Venus de Miloকে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে-ঘরে তার বন্ধুদের জন্যে চমৎকার বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে, সে-সব আসনে ব'সে যে-কোনো কোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে পারা যায়। বলা বাহুল্য যে-দিক থেকেই দেখি না কেন সব দিক থেকেই সে সমান সুদর্শনা। তাজমহলকে যেমন বার বার নানা আলোকে দেখেও চির-অপূর্ব মনে হয় গ্রীক ভাস্করের এই মানসী মূর্তিটিকেও তেমনি। তবে আমার ভারত-বর্ষীয় চোখ নিছক রূপ দেখে তৃপ্তি পায় না, এবং বিউটিফুলের অতৃপ্তির চেয়ে সাব্লাইমের তৃপ্তিই তাকে প্রগাঢ়তর রস দেয়। সেইজন্যে 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'র ওপরে তার একটা পক্ষপাত আছে, সে পক্ষপাত নিয়ে সে বিশ্বের সামনে তর্ক করতে চায় না, সেটা ভারতবর্ষীয় ধাতের পক্ষপাত।

আমাদের কালিদাস যে নীতিনিপুণ ছিলেন এহেন অপবাদ তাঁকে তাঁর শত্রুতেও দেবে না, আশা করি স্বয়ং দিঙ্‌নাগাচার্যও দেননি। সেই শিল্পীই কিনা উমাকে শেষকালে জননীরূপে না এঁকে তৃপ্তি পেলেন না। ফুলবতীর চেয়ে ফলবতী লতার প্রতি আমাদের ধাতুগত পক্ষপাত "উর্বশী"র কবিকেও "কল্যাণী" লিখিয়েছে। পারফেক্‌শন্ নয়, পরিণতিই আমাদের প্রিয়। এবং নীতি নয় রুচিই আমাদের অন্তর্মুখীন করেছে। বিবসনা শ্যামাকে মা বল্‌তে পারি তো বিবসনা Venusকেও প্রিয়া বল্‌তে পারতুম, তবু যে বলিনে এর কারণ, যতই নিখুঁত হোক্ না কেন, Venusএর পরিণতি নেই, বৃদ্ধি নেই, সে আমাদের শুধু একটা রসই দেয়, জীবনের সমস্ত রস দেয় না, তার মধ্যে আমাদের কুমারের জননীকে দেখিনে—"নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী।"

লুভর্ মিউজিয়ামে "মোনা লিসা" (লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-কৃত)-কেও দেখলুম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা কর্‌লেও চেষ্টা কর্‌লেও ভুলতে পারিনে। লুভরে কিছু না হোক্ লাখখানেক ছবি তো আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। কেমন ক'রে বল্‌ব যে তার চেয়ে কেউ সুন্দরী নয়? তখন তখন তো মনে হচ্ছিল অনেকেই সুন্দরতরা। একে একে সকলেই মিথ্যা হয়ে গেছে স্বপ্নদৃষ্টার মতো। প্রভাতী তারার মতো চোখে লেগে আছে শুধু "মোনা লিসা"র হাসিটি।

ফরাসীরা এসব ছবি এসব মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলি যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় ক'রে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসীরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসীদের হারিয়ে দিয়ে বিস্‌মার্ক অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা আদায় ক'রেছিলেন, সে সোনা এতদিনে ধুলা হয়ে গেছে, জার্মানী এখন পুনর্মূষিক। কোন জাতি কোন জিনিসকে বেশী দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস। ভারতবর্ষ যদি আত্মাকে সত্যিই তাঁর সর্বস্ব দিয়ে কিনে থাকে তবে ভারতবর্ষের আত্মা মরবে না।

ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ্ দেখে যা মনে হয়েছিল ফ্রান্সের লুভর্ ত্রোকাদেরো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ্ দেখে তাই মনে হলো—ভাবলুম,

ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জন্ম নিয়ে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হব, বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতো বাংলা মাসিকপত্রের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা কর্‌তে গিয়ে রসবোধের শ্রাদ্ধ কর্‌ব না, চোখ থাক্‌বে কিন্তু মন থাক্‌বে না, প্রতিদিন একটু ক'রে বড় হব কিন্তু বুড়ো হব না, আমার প্রাচীন দেশের পরিপক্ক শিক্ষাকে আমার চির-তরুণ অন্তরে ধারণ কর্‌ব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ কর্‌ব।

ফরাসী জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে কস্‌মোপলিট্যান্—এর মানে এ নয় যে ওরা বিশ্বপ্রেমিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাঁদের সময় নেই তাঁরা কেবল পারীর মানচিত্রখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার নাম লণ্ডনের মতো প্রত্যেক পাড়ায় একটা ক'রে Old Street, New Street, High Street ও Park Road নয়, রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Pekin, Constantinople ইত্যাদি ও President Wilson, Edouard VII, Garibaldi, Haus-mann ইত্যাদি। প্লাসের নাম Etas-unis (য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্), Italie, Europe ইত্যাদি। রেলস্টেশনের নাম George V, St. Francis Xavier, Michel-Ange (মাইকেল এঞ্জেলো) ইত্যাদি। এছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেরই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারীর সর্বাঙ্গে বৈষ্ণবের সর্বাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতো ছাপা। ফ্রান্সের লোকেরা দেশাত্মজ্ঞান অমনি ক'রেই হয় ব'লেই তাদের দেশাত্মবোধ আপনাআপনি জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথ চল্‌তে চেনে তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের—যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে; আর দেশের প্রতি জেলার প্রতি শহরের প্রতি পর্বতের নাম—যাদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে ব'লেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।

এ দেশে স্বতন্ত্র বর্ষাঋতু নেই ব'লে প্রত্যেক ঋতুই অংশত বর্ষাঋতু। সময় নেই অসময় নেই বর্ষাঋতুর বর্গীরা অপর ঋতুদের খাজনা থেকে চৌথ আদায় ক'রে যায়। সকালবেলা শুয়ে শুয়ে দেখলুম আলোতে ঘর ভ'রে গেছে, ফুটফুটে খোকার মুখে হাসি আর ধরে না, আকাশের সেই হাসিতরুণী ধরণীর মাতৃমুখখানিকে পুলকে গর্বে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। এটা বসন্তকাল। কোকিলের কুহু শুনছিনে, কিন্তু সমস্তদিন কত পাখির কিচিমিচি। গাছেরা নতুন দিনের নতুন ফ্যাশান অনুযায়ী সাজ বদলে ফেলেছে, তাদের এই কাঁচা সবুজ রঙের ফ্রকটিকে তারা নানা ছলে দেখাচ্ছে, ঘুরেফিরে দেখাচ্ছে; আধেক খুলে দেখাচ্ছে। বাতাস একজন গ্যালান্ট যুবার মতো তাদের শ্রীমুখের তুচ্ছতম মামুলীতম কায়দা-দুরস্ত ফরমাস শুনবে ব'লে উৎকর্ণ হয়ে নিমেষ শুনছে এবং শুনবামাত্র শশব্যস্ত হয়ে দিগ্‌বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার সেই ব্যস্ততার উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে উঠে বসলুম। ভাবলুম এবার-কার বসন্তটাকে এক ফার্দিং-ও ফাঁকি দেবো না, পরিপূর্ণভাবে ভোগ ক'রে নেবো। আকাশ এত নীল, মাটি এত সবুজ, বাতাস এত কবোষ্ণ, পাখি এত অস্থির, ফুল এত অজস্র—এই ভরা ভোগের মাঝখানে আমি যদি আনমনা থাকি তো আমার শিরসি চতুরানন কী না লিখবেন?

কিন্তু, এ কি হা হন্ত কোথা বসন্ত! দেখতে দেখতে এলেন কি না ইন্দ্ররাজের ঐরাবতের পাল, স্বর্গরাজ্যের ইস্কুলমাস্টার তাঁরা, অত্যন্ত পক্ব প্রবীণ অভ্রান্ত তাঁদের গুম্ফশ্মশ্রু-ধবল বদন-মণ্ডল। তাঁদের স্থূল হস্তাবলেপনে আকাশের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল, তার সদ্যোজাত লাবণ্য গেল এক ধমকে মলিন হয়ে। হায় হায় ক'রে উঠল পৃথিবীর জননী-হৃদয়টা।

এ দেশের এই খেয়ালী ওয়েদার দু'দিনেই মানুষকে মরীয়া ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। বার বার আশাভঙ্গের মতো পরীক্ষা আর নেই, প্রতিদিন সেই একই পরীক্ষা। সকালের আশা দুপুরে ভাঙে, রাত্রের আশা সকালে ভাঙে। নিত্য অনিশ্চয়ের মধ্যে বাস করতে করতে জীবনের ফিলজফীটাই যায় বদলে। মনে হয়, দূর হোক ছাই, বাইরের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করব না,

কালেভদ্রে যখন যেটুকু পাই তখন সেইটুকুকেই হাতে হতে ভোগ ক'রে নিতে প্রস্তুত থাকি, অন্তমনস্কভাবে লগ্ন না বইয়ে দিই, কিংবা চপল লগ্নকে ব'য়েস'য়ে ভোগ করতে গিয়ে মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত না হই।

বাইরের কাছ থেকে আনুকূল্য না পেয়ে ইংলণ্ড একদিকে হয়েছে ভোগগ্রাহী, অন্যদিকে হয়েছে ভোগসংগ্রাহী। সে বাইরে থেকে যা পায় তার তলানী অবধি শুষে নেয়, যা পায় না তাকে প্রাণপণে অর্জন করে। বার বার আশাভঙ্গজনিত অনিশ্চয় তাকে অভিভূত করতে পারলে সে কবে মরত, কিন্তু ওতে তাকে অভিভূত করা দূরে থাক্ তার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে তার যে পরিচয় সে যেন "খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়।" প্রতিপক্ষকে হার মানাবে ব'লে সে প্রতিপক্ষের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিয়েছে— সেই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। জগৎ-টাকে মায়া বলবার মতো সাহস যে তার হয়নি তার কারণ মরীচিকা দেখতে পাবার মতো চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোক এদেশে দুর্লভ। যা পায় তাকে অনিত্য বলে ত্যাগ কর্‌বার মতো বাবুয়ানাও তার সাজে না, কেননা সে যা পায় তা অপ্রসন্না প্রকৃতির বামহস্তের মুষ্টিভিক্ষা, আর আমরা যা পাই তা অন্নপূর্ণা প্রকৃতির অঞ্জলিভরা দান। ভিক্ষা ক'রে এদেশে একমুঠো ভিক্ষার সঙ্গে একমুঠো অপমান মেলে যে, নিতান্ত দায়ে ঠেকলে ভিক্ষার চেয়ে উদ্বন্ধনই হয় শ্রেয়। অথচ ভিক্ষা করাটা আমাদের উপনয়নের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন, আমাদের শিব স্বয়ং ভিখারী। অবশেষে এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে সন্ন্যাসী যত আছে গৃহস্থ তত নেই, মুখের চেয়ে হাতের সংখ্যা কম, পুরুষকারের অভাবে দেশ-জোড়া ক্লৈব্য। সেই জন্যে ভোগের নামটা পর্যন্ত আমাদের কানে অশ্লীল।

ইংলণ্ডের মানুষের একমাত্র ভাবনা সে জীবনটাকে এন্‌জয় কর্‌তে পারছে কি না; এন্‌জয় করা ছাড়া তার কাছে জীবনের অন্য কোনো মানে নেই। ভোগের জন্যে সে প্রাণপণে ভুগেছে, বার বার আশাভঙ্গ সত্ত্বেও প্রাণ ভ'রে আশা রেখেছে, যে লক্ষ্মীকে সে অর্জন করল তাকে যদি সে ভোগ করতে না পারল তবে তার জীবনটাই ব্যর্থ হলো। তার স্ত্রীকে তো সে পিতার হাত থেকে পায়নি যে অতি সহজে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীয়ানা করবে। সে স্বয়ম্বর-সভার বীর,

প্রকৃতি তার ভোগ্যা। প্রকৃতিকে এড়াবার তপস্যা তার নয়, মুক্তি নয় ভুক্তিই তার লক্ষ্য, এর জন্যে যে ক্ষমতা চাই সেই ক্ষমতার তপস্যাই ইংলণ্ডের তপস্যা।

ইস্টারের ছুটিতে লণ্ডনের বাহিরে গিয়ে ভোগের চেহারা দেখলুম। তপস্যার জন্যে কাজের জন্যে লণ্ডন। ভোগের জন্যে ছুটির জন্যে সমস্ত ইংলণ্ড। যেখানে যাই সেখানে দেখি অসংখ্য হোটেল, বোর্ডিং হাউস, সরাই, রেস্তোরাঁ, পেয়িং গেস্ট্ রাখতে ইচ্ছুক গৃহস্থ বাড়ী। সর্বত্র মোটরগম্য মজবুত তক্‌তকে রাস্তা। সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানগুলিতে স্নান সাঁতার নৌ-চালনার আয়োজন। কোথাও মাছ ধরা কোথাও শিকার করা। সর্বত্র টেনিস্‌কোর্ট সর্বত্র গল্‌ফকোর্স। এমন স্থান অতি অল্পই আছে যেখানে সিনেমা নেই রেডিও নেই টেলিগ্রাফ টেলিফোন ডাকঘর নেই সারকুলেটিং লাইব্রেরী নেই। যার যতদূর সাধ্য সে ততদূর খরচ ক'রে ছুটি কাটাতে যায়, অত্যন্ত স্বল্পবিত্তদের পক্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার বাতিক, এদের তেমনি হলি-ডে হ্যাবিট্। কাজের সময় যেমন কাজকে এক মিনিট ফাঁকি দেয় না, ছুটির সময় তেমনি ছুটিকে এক সেকেণ্ড ফাঁকি দেয় না। ছুটি পেলেই এক একখানা স্যুটকেস্ হাতে ক'রে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা কর্মস্থল ছেড়ে ক্রীড়াস্থলে রওনা হয়। তারপর একস্থানে যতদিন খুশি হোটেল বাস, char-a-banc পূর্বক স্থান-পরিক্রমা, খেলাধূলার ধুম, পানাহারের আড়ম্বর। নাচগানের মজলিস। গত যুগের পূজা-পার্বণ আর নেই, দেড় শতাব্দীর ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন্ ইংলণ্ডের চেহারা বদলে দিয়েছে। কর্মের সঙ্গে ধর্মের এবং ছুটির সঙ্গে পার্বণের যে সোদর সম্বন্ধ ছিল এখন সে সম্বন্ধ অনেক দূর সম্বন্ধ, মাঝখানে অনেক পুরুষ গত হয়েছে।

আমি যে অঞ্চলে গিয়েছিলুম তার নাম আইল্ অব ওয়াইট্। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৬০ মাইল, কিন্তু তারি মধ্যে গুটি আট-দশ ছোট ছোট শহর ও বিশ-পঁচিশটি ছোট ছোট গ্রাম। এই শহর ও গ্রামগুলির অধিকাংশই টুরিস্ট্-জীবী। গ্রীষ্মকালে যে সব টুরিস্ট্ আসে তাদের খাইয়ে খেলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদেরি দৌলতে বৎসরের বাকি সময়টা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তখন হোটেলগুলো খাঁ খাঁ করতে থাকে, দোকানপাট কোনোমতে বেঁচেবর্তে রয়, খেলার মাঠে আগাছা

গজায়। স্থানীয় লোকগুলি সাধারণত চাষা মুদি রুটিনির্মাতা মাঝি জেলে মজুর। তবু এরাই নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে এই সব শহর গ্রাম শাসন করে। খুব ছোট ছোট গ্রামগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

শহর যেমন সব দেশে প্রায় একই রকম গ্রামও দেখলুম সব দেশেই প্রায় একই রকম। মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে ইট পাথরের দেয়ালের উপরে খড়ের চালা বা টালির ছাদ, দেয়ালের গায়ে লতা উঠেছে, ছাদের উপর ঘাস গজিয়েছে—এরি নাম কটেজ। তবে নতুনের সঙ্গে সন্ধি না করে পুরাতনের গতি নেই। সংকীর্ণ গবাক্ষ, কিন্তু কাঁচের সার্শী। সেকেলে গড়ন, কিন্তু একেলে সরঞ্জাম। মুদির দোকানে ডাকঘর বসেছে, তামাক-চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেল স্টেশনের ভিতরে সস্ত্রীক স্টেশনমাস্টারের আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে, পাব্লিক লাইব্রেরী আছে। স্কুলের চেয়েও এ দুটো জিনিস উপকারী। স্কুলের সংখ্যা ক'মে এ দুটোর সংখ্যা বাড়ালে ছেলেগুলি বাঁচে। শিক্ষার নামে শিশুমনের ওপর যে বলাৎকার সব দেশেই চ'লে এসেছে এ যুগে শিশু সে বলাৎকার সহ্য করবে না। শিশুও চায় স্বরাজ। তার নিজস্ব শিক্ষা সে নিজেই খুঁজে নেবে।

শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিপাটী। ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও পথঘাট অনবদ্য এবং বাড়িঘর সুখদৃশ্য। অতিদরিদ্র ঝাড়ুদার (চিম্নি-সুইপ) যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির বাইরে বেল্ আছে, তার কাঁচের জানালার ওপাশে ধবধবে পর্দা, যথাস্থানে সন্নিবেশিত অল্পবিস্তর আসবাব, সমস্ত গৃহটির বাইরে ভিতরে এমন একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের আভাস যে তেমনটি আমাদের ধনীদের গৃহেও বিরল। ধন নয়, মনই রয়েছে এর পিছনে, সে মন ভোগ-তৎপর মন। সেটি যদি থাকে তো উপকরণের অভাব হয় না, যা জোটে তাকেই কাজে লাগানো যায়, যা জোটে না তাকে অর্জন ক'রে নেওয়া যায়। এ সংকেত আমরা জানিনে, কেননা পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোকের বাসাকে আমরা এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি, তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব মানিনি। যে দেহে বাস করি সে-দেহকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে-গৃহে বাস

করি সে-গৃহকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। এদিকে কিন্তু ইহ-লোককে এরা ম'রেও ছাড়তে চায় না। কফিনের ভিতরে শুয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের বিশ্বাস জগতের শেষ দিন অবধি এদের এই মাটির শরীরখানা থাকবে।

তা ছাড়া আমার মনে হয় এদেশের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের মূলে রয়েছে এদেশের নারী-শক্তির সক্রিয়তা। আমাদের ইহবিমুখ ধর্ম হচ্ছে নারীবিমুখ ধর্ম, আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে নারীর অন্তরের সায় নেই, আমাদের গৃহ নারীর সৃষ্টি নয় এবং গৃহের বাইরেও নারী আমাদের সৃষ্টি করতে পায় না। ইংলণ্ডের নারী তার স্বামীগৃহের রাণী, শাশুড়ী-জা'দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে, সেইজন্যে ইংলণ্ডের গৃহিণীর হাত এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায় না, ঘরটির ঝাড়া মোছা ঘষা মাজাতে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত। সন্তান সম্বন্ধেও ঠিক তেমন দায়িত্ব এবং ততখানি স্বাধীনতা। জা-শাশুড়ীর সাহায্য নেই, হস্তক্ষেপ নেই। ইংলণ্ডের ছেলেরা "হোম" নামক যে-জিনিসটি পায় সেটির একদিকে মা অন্যদিকে বাবা, মাঝখানে ছোটবড় ভাইবোনগুলি। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এক টেবিলে সকল ক'টিতে মিলে খায়, রাত্রে এক অগ্নিস্থলে সকল ক'টিতে মিলে গল্প বা গান বাজনা করে, অল্পে সম্পূর্ণ ছোট একটুখানি নীড়। এর মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজ, এর মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিত্য কলহ নেই, এটা একটা বিরাট যজ্ঞশালার মতো কোলাহল-মুখর নয়।

সে যাই হোক, ইংলণ্ডের গৃহিণীদের কাছ থেকে আমাদের গৃহিণীদের অন্তত একটি বিষয় ভক্তিভরে শিক্ষা করবার আছে। সেটি গৃহের শৃঙ্খলাবিধান ও পারিপাট্যসাধন। নিজের আশপাশকে নিয়েই নারীর সৃষ্টি। নারীর আভা-মণ্ডল হচ্ছে নারীর পরিচ্ছদ, নারীর গৃহ। কিন্তু আমাদের রন্ধনপর্ব এত অধিক সময় নেয় যে, তার পরে অন্য কিছু করবার না থাকে অবসর, না থাকে বল। অথচ গ্যাসের উনুনের সাহায্যে এদেশে দরিদ্রতমা গৃহিণীরাও আধ ঘণ্টায় এক বেলার রান্না চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তার পরে হায়ার পারচেজ প্রথার প্রবর্তন হয়ে অবধি গরীবের ঘরের আসবাবের নিঃস্বতা নেই, অনেকের একটি পিআনো পর্যন্ত

আছে। কোন্ বিষয়ে খরচ কমিয়ে কোন্ বিষয়ে খরচ বাড়াতে হয় সেটা একটা আর্ট। খরচ কমানো মানে কেবল টাকার খরচ না, সময়েরও খরচ। আমাদের দেশে যা দাসীর কাজ এদেশের গৃহিণীরাও তা যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত ক'রে স্বহস্তে সারেন। তার ফলে যে টাকা ও সময় বাঁচে সে টাকায় ও সময়ে বিদ্যাবতী, কলাবতী, স্বাস্থ্যবতী হওয়া যায়। গ্রামে দেখলুম প্রায় প্রত্যেকেরই বাগান আছে, সে বাগানে বাড়ির মেয়েরাই কাজ করে, ছেলেরা বাইরের কাজে ব্যস্ত। লণ্ডনেও অনেক বাড়িতে ছোট একটুখানি বাগান আছে, বাগানকে ইংরেজরা বড় ভালবাসে। বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে বাগানের কাজ করা এদের অনেকেরই একটা হবী। গ্রামে দেখলুম অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসেছেন, গল্পগুজবে গা ঢেলে দিয়েও হাতের কাজটিতে ঢিলে দিচ্ছেন না। হাজারো বিলাসিতা করুক, এদেশের মেয়েরা উপার্জন করতে পটু, তথা উপার্জন বাঁচাতেও পটু। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কারুশিল্পের ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির। জনপিছু ছ' পেনী খরচ ক'রে কতখানি সাপার (নৈশ ভোজন) রাঁধা যেতে পারে কিংবা অল্প খরচে কী কী পোশাক স্বহস্তে তৈরি করা যেতে পারে প্রতিযোগিতার এইরূপ বিষয় নির্দেশ ক'রে দেন গ্রামের কর্তৃপক্ষ। অনেক বাড়িতে যে বাগান আছে সেই বাগানে পর্যটকদের চা খাইয়ে অনেকে সংসারের আয় বাড়ায়। এই সব "টী-গার্ডেন" ছাড়া অনেকের বাড়িতে ফার্ম হাউসে ছ' তিনটে ঘর খালি থাকে, সেখানে পেয়িংগেস্ট রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের মুরগী শূয়োর গরু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পোষ্য আছে। অর্থাগমের অর্থসঞ্চয়ের মতো উপায় আছে, কোনোটাই কেউ পারৎপক্ষে বাদ দেয় না।

গ্রামে দেখলুম সাইক্লের চল কিছু বেশী। এবং ওটা সাধারণতঃ মেয়েদেরই যান। মেয়েরা ঐ চ'ড়ে বাজার করতে যায়। ছেলেরা চড়ে মোটর সাইক্ল। তবে মেয়েরা যেমন উঠে প'ড়ে লেগেছে আর কিছুকাল পরে ওটাও হবে প্রধানত মেয়েলী যান। এরোপ্লেনে ক'রে এ্যাট্‌লাণ্টিক অতিক্রম করতে গিয়ে মরাটাই হচ্ছে এখন তাদের আধুনিকতম ফ্যাশান। হিষ্টিরিয়ায় মরার চেয়ে এটা তবু স্বাস্থ্যকর ফ্যাশান। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে cult of joy-এর চর্চা

বেড়েছে। যুবকরা জেনেছে, যে কোনো দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে, এই নিষ্ঠুর যুগে প্রাণের মূল্য নেই, প্রাণ সম্বন্ধে সীরিয়াস্ কেউ নয়। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ হাস। যুবতীরা জেনেছে পুরুষ-সংখ্যার স্বল্পতাবশতঃ বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নেই, আর্থিক অসচ্ছলতাবশত মাতৃত্ব আরো অনেকের ভাগ্যে নেই। সুতরাং যতটুকু পাই হেসে লবো তাই। ঘোরতর মোহ-ভঙ্গের ভিতরে এ যুগের তরুণ-তরুণীরা বাস করছে। ছেলেদের চোখে ডেমক্রেসীর কালো দিকটা ধরা প'ড়ে গেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ থেলো হয়ে গেছে, জীবন নামক চিত্রিত পর্দাখানা তারা তুলে দেখছে এর পেছনে লক্ষ্য ব'লে কিছু নেই। শুধু বাঁচবার আনন্দে বাঁচতে হবে, হাসবার আনন্দে হাসতে হবে। এ যুগের তরুণ যত হাসে তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে ভোট এবং আর্থিক অনধীনতাই সবকথা নয়, ওসব পেয়েও যা বাকি থাকে তার ওপরে জোর খাটে না, সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মতো দুঃখিনী আর নেই। তবু তারা পণ করেছে কিছুতেই কাঁদবে না, কিছুতেই হটবে না। জীবনের কাছ থেকে খুব বেশী প্রত্যাশা করা চলে না, এইটে এ যুগের ইউরোপের মূল সুর। যেটুকু আমাদের নিজেদের আয়ত্তগম্য সেইটুকুর ওপরে এ যুগের ইউরোপের ঝোঁক পড়েছে। সেইজন্যে এত দেহের দিকে নজর, যৌবনের দিকে নজর। ক্রমশই ইউরোপের লোকের স্বাস্থ্য বেড়ে চলেছে, আয়ু বেড়ে চলেছে, যৌবন বেড়ে চলেছে। সেই গর্বে এ যুগের অগ্রসরপন্থীরা খ্রীষ্টীয় চরিত্রনীতি মানতে চায় না, ইউরোপে এখন পেগানিজ্‌মের যুগ ফিরে এসেছে, দেহের উৎকর্ষের জন্যে এখন চরিত্রের সাতখুন মাপ।

এ যুগের মানুষ নির্জনতাকে বাঘের মতো ডরায়। গ্রামের আদিম নির্জনতার ভয়েই সে শহর শরণ করেছে, শহরে অরুচি হলে মাঝে মাঝে মুখ বদ্‌লাবার জন্যে সে গ্রামে যায়, সেই সঙ্গে শহুরে আমোদ প্রমোদ আরাম বিলাসগুলোকেও পুঁটলি বেঁধে গ্রামে নিয়ে যায়। প্রতি গ্রামের যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল নাগরিক সভ্যতার ষ্টীম্ রোলার তাকে থেঁৎলে গুঁড়িয়ে সমতল ক'রে দিচ্ছে। সেই সমতলের ওপর দিয়ে নাগরিকের দল char-a-banc চ'ড়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল

চক্কর দিয়ে যান, তারি নাম দেশ-ভ্রমণ। এবং ছেঁটে কেটে সমান ক'রে আনা দৃশ্যগুলোকে মুহূর্তমাত্র চোখে ছুঁইয়ে পরমুহূর্তে বিস্মৃতির ওয়েস্ট্ পেপার বাস্কেটের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তারি নাম দেশ-দর্শন। তারপর সন্ধ্যা জুড়ে বন্ধ ঘরে সিগ্রেটের ধোঁয়ায় অন্ধকূপ রচনা ক'রে সেই গর্তের মধ্যে সিনেমা দেখা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আহার নিদ্রা বিশ্রম্ভালাপ। কাজের দিনে ভূতের মতো খাটুনি, ছুটির দিনে অরসিকের মতো সময়ক্ষেপ।

শহরে এ জিনিস চোখে লাগে না। কিন্তু গ্রামে যখন এই জিনিস দেখি তখন কেমন খাপছাড়া ঠেকে, চারিদিকের সঙ্গে এর মেলে না। প্রকৃতি সেই আদি-কালের মতো শান্ত সুস্থির আত্মস্থভাবে কাজের সঙ্গে ছুটির মিতালি ক'রে গরজের সঙ্গে আনন্দের তাল রেখে একঠাঁই দাঁড়িয়ে একটি পায়ে নূপুর বাজাচ্ছে। আর মানুষ কি না কাজকে দাসখৎ লিখে দিয়ে তার অনুগ্রহদত্ত অবকাশটুকু লাটিমের মতো ঘুরে অপচয় করছে। সমুদ্রের কলরোলের দিকে কান দেবার অবসর নেই, তৃণের সীমাহীন শ্যামলতার আহ্বানে চোখ সাড়া দেয় না। মাথার ওপরে উড়ছে এরোপ্লেন, সমুদ্রের ওপরে ভাসছে লাইনার জাহাজ, রাস্তা তোলপাড় করছে বাস মোটর, মাঠ তোলপাড় করছেন গলফ্-ক্রীড়ারত টেনিস-ক্রীড়ারত মানব-মানবীর দল। গতিশীল সভ্যতা যে জীবনের আনন্দ বাড়িয়েছে এমন তো মনে হয় না, বাড়িয়েছে কেবল জীবনের উত্তেজনা। জীবনকে সচেতন ভাবে ভোগ করা নয়, কোনোমতে হেসে খেলে ভুলে কাটিয়ে দেওয়া। নির্জনতার মধ্যে নিজের সঙ্গে একলা থাকার মতো শাস্তি আর নেই। কাজে হোক অকাজে হোক কিছু একটাতে ব্যাপৃত না থাকতে পারলে মনে হয় সময়টা মাটি হলো, এই সময়টা অন্যেরা কাজে লাগাচ্ছে, ফুর্তি লুটছে। কাজের দিনে এক মুহূর্ত ধ্যানস্থ হবার জন্যে স্থির হবার জো নেই পাছে প্রতিযোগীর দল মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়, পেছিয়ে প'ড়ে প্রাণে মরি। ছুটে চলার এই বেগ ছুটির দিনেও সম্বরণ করতে পারিনে, নানা ব্যসনে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মনে করি খুব এন্‌জয় করছি বটে, এই তো সক্রিয় আনন্দ, এই তো জ্যান্ত মানুষের মতো। আসলে কিন্তু এইটেই হচ্ছে চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তা। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলার চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঢেউ ভাঙা

বড় কঠিন আনন্দ। আত্মস্থ না হয়ে ভোগ নেই।

তবে এই একটা মস্ত কথা যে, একালের ব্যসন সেকালের মতো বলক্ষয়ী নয়। একালের মানুষ হয়তো দৃশ্য-গন্ধ-সংগীতের রসগ্রাহী নয়, কলার নামে কৃত্রিমতাকেই সে মহামূল্য মনে করে, বাস্তবতার অন্বেষণে সে কল্পনাবৃত্তি খুইয়েছে, প্রগাঢ় প্যাসনের পরিবর্তে উগ্র সেন্‌সেশনই তার অনুভূতি জুড়েছে। তবু এসব সত্ত্বেও সে স্বাস্থ্যবান প্রাণবান বলবান। বিষপান করেও সে নীলকণ্ঠ, প্রচুর হাস্যরস তাকে স্বাস্থ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, অজস্র খেলাধুলা তার বল বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিজ্ঞান তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

আইল্ অব ওয়াইট্ বড় সুন্দর স্থান। নীলরঙের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মতো সুন্দর। তবে এদেশের সবুজ যেন আমাদের সবুজের মতো কান্ত নয়, স্নিগ্ধ নয়, কেমন যেন তীব্র আর ঝাঁঝালো। তৃপ্তি দেয় না, উন্মাদনা দেয়; ছাড়তে চায় না, টেনে রাখে; আবেশের চেয়ে জ্বালা বেশি। দ্বীপটির কোনো কোনো স্থল এত নিরালা যে নেশার মতো লাগে। দিন যেদিন উজ্জ্বল থাকে চোখ সেদিন তন্দ্রালসে নুয়ে পড়তে চায়। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌকো ভেসে যাচ্ছে। গম্ভীর ভাবে ওপারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরদেশগামী জাহাজ। মাথার ওপরে চিলের মতো উড়ছে এরোপ্লেন—এত ওপরে যে, তার বিকট কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছয় না। কানে বাজ্‌ছে শুধু জলকণ্ঠের ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। তটকে যেন আদি কাল থেকে সেধে আস্‌ছে, তবু তার মান ভাঙাতে পারছে না। মাটি তার সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ। ঘুমের থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়, চেতনার থেকে প্রতীতি কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে যেন স্বপ্ন, না মায়া না মতিভ্রম! সত্য কেবল ঐ আপনভোলা শিশুগুলি, ঐ যারা বালি দিয়ে ঘর তৈরি করছে, বাঁধ তৈরি করছে, ঘরের মধ্যে ভালোবাসার পুতুলকে রাখ্‌ছে। সমুদ্রের এক ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তাই দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ছে, আবার সেই ঘর ইত্যাদি।

গ্রামের লোকগুলিকে ভালো লাগ্‌ল। বিদেশী দেখ্‌লেই সম্মান করে কুশল

প্রশ্ন করে, সাহায্য করতে ছুটে আসে। শহরে ইংরেজদের দেখে ইংরেজ জাতকে যতটা নিঃশব্দপ্রকৃতি ভেবেছিলুম গ্রাম্য ইংরেজদের দেখে ততটা মনে হলো না। সৌজন্যের চেয়ে বড় জিনিস সৌহার্দ্য। গ্রামের লোকের কাছে অল্পেতেই ও জিনিস পাওয়া যায়। শহরের লোকের সঙ্গে বিনা ইন্‌ট্রোডাক্‌শনে ভাব করবার উপায় নেই, যেটুকু আলাপ হয় সেটুকু ঘড়ির উপরে চোখ রেখে। কিন্তু গ্রামের লোকের হাতে কাল অন্তহীন। সময়কে তারা ফাঁকি দিতে ডরায় না, সময়ের মূল্য নামক কুসংস্কারটা তাদের তেমন জানা নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মনের অন্তরঙ্গতা যেমন সব দেশে, তেমনি এদেশেও। নিজের গ্রামের যে কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময়, সুখদুঃখের আলোচনা। মুখ গুঁজে না দেখার ভান ক'রে পালাবার পথ খোঁজা নেই, কিম্বা ওয়েদার সম্বন্ধে দুটো তুচ্ছ প্রশ্নোত্তর ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে চুপ ক'রে এক গাড়িতে ভ্রমণ করা নেই।

তবে গ্রাম্য সভ্যতার এখন দিন ঘনিয়ে এসেছে সব দেশে। ইংলণ্ডে এখন পল্লীতে যত লোক থাকে তার তিনগুণ থাকে নগরে। ফ্রান্সে জার্মাণীতেও ক্রমশ গ্রামকে শোষণ ক'রে নগর মোটা হচ্ছে। Back to the village যে ভারতবর্ষে সম্ভব হবে এমন তো মনে হয় না। বড় জোর গ্রাম থাকবে দেহে, তার আত্মা যাবে বদলে। গ্রাম সভ্যতার শবখানাতে ভর করবে নাগরিক সভ্যতার তাল বেতাল। গ্রামগুলি হবে নগরেরই ক্ষুদে সংস্করণ। তাছাড়া গ্রামে নগরে ভেদরেখা কোন্‌খানে টানব? লোকসংখ্যা বাড়লেই গ্রামের নাম হচ্ছে নগর। নগরে ও গ্রামে যে প্রভেদ সেটা আকৃতিগত নয়, আকারগত প্রভেদ। নগরেরই মতো গ্রামও হোটেলে ভ'রে যাচ্ছে। ভাড়াঘরে ভ'রে যাচ্ছে। এর মানে এই যে, এ যুগের মানুষ কোথাও স্থায়ী হতে চায় না। বেদেরা তাঁবু ঘাড়ে ক'রে বেড়ায়, আমরা তা করিনে। অন্য লোক আমাদের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে রাখে, সারাজীবন আমরা কেবল এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে পাড়ি দিয়ে থাকি। এককালে আমরা যাযাবর ছিলুম। তারপর কোন একদিন ধানের ক্ষেতের ডাকে ঘর গড়লুম, স্থিতিশীল হলুম। এখন আমরা বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে ফেরিওয়ালার

মতো পথে বেরিয়ে পড়েছি, আমরা গতিশীল। পথও মনোহর। এতে শীত-আতপের কষ্ট আছে, ধুলোবালির ঝড় আছে, কোথাও কর্দম কোথাও কঙ্কর, তবু এও ভালো।

লণ্ডনের বাইরে গিয়ে দেখলুম লণ্ডনের জনতার ভিড়কে অন্যমনস্কভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। কাউকে চিনিনে, তবু সকলের প্রতি অজ্ঞাত টান। যেখানে যাই সেখানে দেখি লণ্ডনের লোক পরস্পরকে ঠিক চিনে নিচ্ছে, লণ্ডনে থাকলে যার সঙ্গে কোনদিন নমস্কার বিনিময়টা পর্যন্ত হয়ে উঠত না, তার সঙ্গে অল্পেতেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাচ্ছে। শহরের আড়ষ্টতা বাইরে থাকে না, আদব কায়দা চুলোয় যায়, শহর ছেড়ে যারা গেছে তাদের সেই অল্প ক'জনের মধ্যে কতকটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতো দাঁড়ায়। তবে এটা দীর্ঘকালের নয় ব'লেই এত মধুর। সকলেই মনে মনে জানে যে, ছাড়াছাড়ি যে-কোনো মুহূর্তে হ'তে পারে। বিচ্ছেদটা অনিশ্চিত নয়, মিলনটাই অনিশ্চিত। অবুঝের মতো ভাবতে ইচ্ছা করে, ব'লেও বসা যায় যে, আবার দেখা হবে, পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু আঁধার রাতের অপার সমুদ্রের জাহাজ দু'টির সেই যে সংকেত-বিনিময়, সেই আরম্ভ সেই শেষ। তারপর মাথা খুঁড়লেও আর দেখা হবে না। যদি হয়ও তবে সে দেখা বন্দরের সহস্র জাহাজের ভিড়ে। তখন জনতার টানে টানছে, জনের টান গায়ে লাগে না। তখন সে দেখায় চমক থাকে না, মামুলী মনে হয়।

এটা পুনর্যাযাবরতার যুগ, আমরা সকলকেই চাই, কাউকেই চাইনে, আমাদের আলাপী বন্ধু শত শত, কিন্তু দরদী বন্ধু একটিও নেই, আমরা বিশ্বসুদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের নাড়ীর খবর জানি, কিন্তু আমাদেরি পাড়াপড়শীদের নাম পর্যন্ত জানিনে। পাড়াপড়শী দূরে থাক, আমাদেরি ফ্ল্যাটের নীচের তলায় যারা থাকে চোখেও তাদের দেখিনি। রেল স্টীমার এরোপ্লেনের কল্যাণে জগৎটা তো ছোট হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের মানুষকে যে মনে হচ্ছে লক্ষ যোজন দূর। তবু এও সুন্দর। আমরা পথিক, আমাদের স্নেহ প্রীতি বন্ধুতার বোঝা হাল্কা হওয়াই তো দরকার নইলে পদে পদে বাঁধা পড়তে পড়তে চলাই যে হবে না। একটি প্রেমে আমরা সকল প্রেমের স্বাদ পেয়েছি—সেটি চলার পথের প্রেম। এর

মধ্যে আর যাই থাক আসক্তি নেই। আমরা নিষ্কাম ভোগী, আমরা ভোগ করি, লোভ করিনে। কেননা লোভ করলে থামতে হয়, আর পথে থামাই হচ্ছে পথিকের মৃত্যু।

৮

এই ক'টি দিন সুধায় গেল ভ'রে। কয়েকদিন থেকে আলোর আর অবধি নেই, ভোর চারটের থেকে রাত (?) ন'টা অবধি আলো। যেদিন সূর্য থাকে সে তো স্বর্গসুখ, যেদিন মেঘলা সে দিনও সুখ বড় কম নয়, কেবল আলো—সেও অনেকখানি। আর উত্তাপ কোনো দিন আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো, কোনো দিন আমাদের চৈত্র মাসের মতো। আমার পক্ষে তা বেশ আরামের, কিন্তু এদেশের লোকগুলি ছট্‌ফট করতে শুরু করেছে। এদের মতে এটা অকাল গ্রীষ্ম শীত, বর্ষা, কুয়াশা এদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, ও নিয়ে এরা প্রতিদিন খুঁৎখুঁৎ করে বটে, কিন্তু ও ছাড়া আর কিছু ভালোও বাসে না।

অবশ্য সাধারণের কথাই বলছি, কেন না অসাধারণেরা তো এখন কোনো দেশের বাসিন্দা নন, তাঁরা সব-দেশের বাসাড়ে। তাঁরা শীতকালটা রিভিয়েরায় কাটান, বসন্তটা সুইট্‌জারলণ্ডে, গ্রীষ্মকালটা বরফেরাজ্যস্থানে কাটান্, শরৎকালটা পৃথিবী পরিক্রমায়। তা ব'লে সাধারণরাও যে একই স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে এমন নয়। তারাও এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে বাসা বদ্‌লাতে লেগেছে। অসাধারণদের সঙ্গে তাদের তফাৎটা কেবল এই যে, তাদের টান ছুটির টান নয় কাজের টান। তবু কাজের টানে বারো মাস কেউ কর্মস্থলে কাটায় না, এক-আধ মাসের জন্যে হ'লেও দশ-বিশ ক্রোশ দূরে গিয়ে মুখ বদ্‌লিয়ে আসে। আর ছুটির টানে বারো মাস যাঁরা বিশ্বময় ঘুরপাক খাচ্ছেন তাঁরাও বড় সাবধানী পথিক, তাঁরা এজেন্সী নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে কাগজে লিখে পাথেয় জোটান।

পাথেয় যে যেমন ক'রেই জোটাক্ সকলেই একালে পথিক, কেউ একালে গৃহস্থ হ'তে চায় না। এই লণ্ডন শহরে কত ফরাসী ফ্যাশানজ্ঞ, জার্মান সংগীতজ্ঞ,

ইতালীয়ান নৃত্যনিপুণ, রাশিয়ান পলাতক, সিনেমার চাষীদের এজেণ্ট, চাটগেঁয়ে জাহাজের খালাসী, চাইনিজ্ কোকেন চালানদার ইত্যাদি নানা দিগ্‌দেশাগত মানুষ এক আধ বৎসরের জন্যে বাসা বেঁধেছে। এ শহরে না পোষালে নিউইয়র্কে কিম্বা বুএনস্ এয়ারিসে ভাগ্যান্বেষণ করবেন। এদের সাম্‌নে সারা পৃথিবী প'ড়ে রয়েছে, যেখানে যতদিন থাকতে পারে ততদিন থাক্‌বে, তারপরে সুট্‌কেস্ হাতে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌বে।

রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যে পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে কাটিয়ে এসেছে—কেউ জাহাজে কাজ নিয়ে হনলুলু ঘুরে এসেছে, কেউ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ল'ড়ে এসেছে। রোজ এমন লোকও দেখি যে কিছু পয়সা জমাতে পারলে এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে আরজেণ্টাইনায় ব্যবসা ফাঁদবে, কিম্বা নিউজীলণ্ডে চাকরি যোগাড় কর্‌বে। এদের কাছেপৃথিবীটাএত ছোট বোধ হচ্ছে যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন কল্‌কাতা থেকে কাশী। এদের অপরাধ কী, আমারি তো এখন মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষ ছোট একটা দেশ, বম্বে কল্‌কাতা ছোট এক-একটা শহর। নিউইয়র্কের লোক জাহাজে চ'ড়ে ছ'সাত-দিনে পারী পৌঁছয়, সেখানে থেকেবাড়ির লোকেরসঙ্গেটেলিফোনে কথা বলে। আর কিছুকাল পরে যখন পারীর সঙ্গে নিউইয়র্কে এরোপ্লেন চলাচল সহজ হবে, তখন নিউইয়র্কে ডিনার খেয়ে পারীতে ব্রেকফাস্ট খেতে পারা যাবে, যেমন কল্‌কাতায় ডিনার খেয়ে কাশীতে ব্রেকফাস্ট্।

এর ফলে দেশে আর মানুষের মন টিক্‌ছে না, বিদেশের স্বপ্নে মন বিভোর। শনিবার হ'লেই চলো লণ্ডনছেড়ে পারী, সেখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো লণ্ডনে। পরের শনিবারে চলো বেলজিয়াম, কিম্বা হল্যাণ্ড্, সাতদিনের ছুটি পেলে চলো জার্মানী কিম্বা স্বইট্‌জারলণ্ড। তিন সপ্তাহের ছুটি পেলে চলো নিউইয়র্ক কিম্বা ওয়েস্ট্ ইণ্ডিজ্। দেড় মাসের ছুটি পেলে চলো সাউথ আফ্রিকা কিম্বা ইণ্ডিয়া। ছ'মাসেরছুটি পেলে চলোওয়ার্লড্ টুরে। এগুলো অবশ্য জাহাজী যুগের মানুষের স্বপ্ন। এরোপ্লেনী যুগের মানুষ—অর্থাৎ এরোপ্লেন যখন জাহাজের মতো সস্তা ও নিরাপদ ও সর্বত্রগামী হবে, তখনকার মানুষ

অফিসের ঘড়িতে ছ'টা বাজলেই ছুটবে পারীর এরোপ্লেন ধরতে। এখন এরোপ্লেন পারী পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগ্‌ছে, তখন লাগবে দেড় ঘণ্টা। সুতরাং ডিনারের সময় পারীতে হাজির হতে পারবে। শনিবার হলে সে ভাববে যাওয়া যাক্ ঈজিপ্টে, রবিবারটা পিরামিড্ দেখে সোমবার সকালে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট্ খেয়ে লণ্ডনের অফিসে আসা যাবে গাধাখাটুনি (ড্রাজারী) খাটতে। খাটুনির ফাঁকে রেডিওতে শোনা যাবে বুএনস্ এয়ারিসের ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা আর টেলিভিসনে দেখা যাবে সেই নাচের দৃশ্য। ঐ উত্তেজনায় আরো কিছুক্ষণ গাধা-খাটুনি সহ হবে। তারপরে ছুটি, পারীগমন, রাত্রিভোজন, থিয়েটারদর্শন, নিদ্রা।

আমাদের নাতিনাৎনীরা ভাব্‌বে, এই তো জীবন! আমরাই তো সেণ্ট্ পারসেণ্ট্ বাঁচছি! আমাদের পূর্বপুরুষগুলো কি বাঁচতে জান্‌ত? ছিল ওদের আমলে এমন সব পাড়া-ময় শহর-ময় হোটেল? পেত ওরা এমন সব কলে তৈরি বিশুদ্ধ হাইজিনিক খাবার? পার্‌ত ওরা নিউইয়র্কে ব্যাণ্ড শুন্‌তে শুন্‌তে কল্‌কাতায় নাচ্‌তে? সারা জগতের কোথায় কী ঘটছে তা চোখে দেখতে দেখতে বিশ্রাম-কাল কাটাতে? ওদের সময় নাকি স্নেহ প্রেম আতিথ্য ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল —বাজে কথা। ওদের সময় গ্রামে গ্রামে মামলা মোকদ্দমা, দেশে দেশে যুদ্ধ লেগেই থাকৃত, ইতিহাসে লেখে। মায়েরা নাকি গৃহকোণে বন্দী হয়ে স্বামী-পুত্রের সেবা কর্‌ত—ধিক্। মেয়েদের যেন নিজস্ব প্রতিভা নেই, তারা যেন পুরুষের মতো তাই নিয়ে দিনরাত ব্যাপৃত থাকতে পারে না, তাদের যেন পাব্লিকের প্রতি দায়িত্ব নেই, তারা থাকবে স্বার্থপরের মতো গৃহ-সংসার নিয়ে।

হায়! গতি-গর্বে গর্বিত হয়ে ওরা তো বুঝবে না ওদের পূর্বপুরুষদের স্থিতি-সুখ! ওরা যখন ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে থ্রিলের আতিশয্যে মূর্ছাসুখ পাবে, তখন তো ওরা বুঝবে না গরুর গাড়িতে চ'ড়ে ঘণ্টায় এক মাইল অগ্রসর হবার তন্দ্রাসুখ। মার্স ভিনাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার উত্তেজনায় ওরা ভুলে থাকবে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বাধাবার উত্তেজনা। পৃথিবীটাই যখন ওদের আরাম ক'রে পা ছড়াবার পক্ষে নিতান্ত অপরিসর ঠেকবে তখন ওরা কী ক'রে বুঝবে আমার নগণ্য আঙিনাটুকুই আমার স্ত্রীর

চোখে কত বৃহৎ ব'লে সে-বেচারী লজ্জায় ভয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। আমাদের সেই রাত ভোর ক'রে বেলা দশটা অবধি যাত্রা দেখা, দুপুর বেলা ঘুমদিয়ে রাত ন'টায় ওঠা, একটি গ্রামে একটা জীবন সাঙ্গ ক'রেও তৃপ্তি না মানা, ফাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখা—এসব ওদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। "সেকেলে" ব'লে ওরা আমাদের অবজ্ঞা করবে।

তা করুক, কিন্তু ওকথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করব না যে, কোনো একটা যুগ কোনো আরেকটা যুগের চেয়ে সুখের, কোনো এক যুগের মানুষ কোনো এক যুগের মানুষের চেয়ে সুখী। পৃথিবী দিন দিন বদ্‌লে যাচ্ছে, সমাজ দিন দিন বদ্‌লে যাচ্ছে—কিন্তু উন্নতি? প্রগতি? পারফেক্‌শান্? তা কোনো দিন ছিলও না, কোনো দিন হবারও নয়। অতীত-পূজকরা বল্‌বেন, সত্যযুগ ছিল না তো কোন্ আদর্শের আমরা অনুসরণ করব? ভবিষ্যৎ-পূজকরা বল্‌বেন, সত্যযুগ হবে না তো কোন্ আদর্শের অভিমুখে আমরা যাব? আমরা কিন্তু বর্ত্তমান-প্রেমিক, আমরা বলি, এইটেই সত্য যুগ, এইটেই কলি যুগ, এটা ভালোও বটে মন্দও বটে। লাখ বছর পরে যারা আসবে তাদের যুগ এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এমনি ভালোয়-মন্দে-মেশা দুঃখে-সুখে-বিচিত্র প্রেমে-হিংসায়-জটিল থাক্‌বেই। আমরা চলার আনন্দে চলি, কারুর অনুসরণেও না, কারুর অভিমুখেও না। গতিটাই আনন্দের, শম্বুকের গতি আর পক্ষিরাজের গতি বেগের দিক থেকে ভিন্ন, আনন্দের দিক থেকে একই।

কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, ক্রমেই আমাদের চলার বেগ বাড়ছে, ধীরে চলার আনন্দ গিয়ে ছুটে চলার আনন্দ আসছে। মানুষ এখন ঘর ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল, উদ্ভিদের মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চল্‌তে চাইল না, পাখীর মতো ঠাঁই ঠাঁই উড়্‌তে উড়্‌তে চলল। কোনোস্থানের প্রতি তার স্থায়ী আসক্তি রইল না। আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তারপরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক-একটা দেশের বৈশিষ্ট্য চ'লে যাচ্ছে, দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের লোক দেশে আসছে, কে যে কোন্ দেশে জন্মাচ্ছে কোথায় বিয়ে করছে কোন্‌খানে মরছে

তার ঠিক নেই। এই ইংলণ্ডের এক অতি অখ্যাত অতি বিজন পল্লীগ্রামে এক তামিল চাষা—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অশিক্ষিত—ইংরেজ মেয়ে বিয়ে ক'রে ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করছে। সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ঘর ছেড়েছিল, এখন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়েছে। এর ছেলেপিলে হয়তো ক্যানাডায় বাসা বাঁধবে কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ায়। কোন দেশের প্রতি তাদের পেট্রিয়টিজম যাবে? বাপের মাতৃভূমি, না নিজের মাতৃভূমি, না নিজের ছেলের মাতৃভূমি—কার প্রতি?

কত চীনা-মালয়-কাফ্রির ইংরেজ ছেলে দেখ্‌ছি, কত ইংরেজের ফরাসী, জার্মান, জাপানী ছেলে দেখছি, কত শাদা-রঙের আয়া লাল্‌চে কালো-রঙের ছেলেকে ঠেলা গাড়ি ক'রে বেড়াতে নিয়ে যায়, কত আর্য-ধাঁচের মুখে মঙ্গোলীয়-ধাঁচের ভুরু শোভা পায়। জগৎ জুড়ে একটা সঙ্কর জাতি গ'ড়ে উঠেছে, সে জাতির নাম মানব জাতি। এই নতুন মানবের জন্যে যে নতুন সমাজ খাড়া হচ্ছে সে সমাজের নীতিসূত্রও নতুন। সে সব নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি, গরুর গাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরো নর-নারীর মিলন-নীতি। গরুর গাড়ির যুগের নর-নারী অল্প বয়সে বিবাহ করত পিতামাতার নির্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে চিন্‌ত না জান্‌ত না দেখত না, দুজনেই একস্থানে থেকে থেকে জীবন শেষ করত এবং একজন করত গৃহের অন্দরের কাজ, অন্যজন করত গৃহের সদরের কাজ। এরোপ্লেনের যুগের নর-নারী বিবাহ করে বেশী বয়সে পঞ্চশরের নির্বন্ধে; পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে শৈশবে দেখতে পায় ক্লাবে, নাচঘরে, দেখ্‌তে পায় অফিসে; বিবাহের পূর্বে দেখতে পায় ক্লাবে, নাচঘরে, টেনিস কোর্টে, কাফে-রেস্তোরাঁয়; বিবাহের পর দেখ্‌তে পায় অফিসের সহকর্মিণী বা সহকর্মীরূপে, একলা পথের সহযাত্রিণী বা সহযাত্রীরূপে, একলা প্রবাসের বান্ধবী বা বান্ধবরূপে। তারপর স্বামী-স্ত্রী একস্থানে থাকতে পায় না, দু'জনের দুইস্থানে জীবিকা। দু'জনেই বাইরে কাজ করে, হোটেলে বাস করে, রেস্তোরাঁয় খায় এবং সুবিধা না হলে দেখা করতে পায় না। সন্তানরা মেটার্নিটি হোমে জন্মায়, বোর্ডিং স্কুলে বাড়ে এবং বড় হলে জীবিকার

সন্ধানে দেশ-বিদেশে বেড়ায়।

এহেন যুগে প্রেম ও সতীত্বের নীতি বদলাতে বাধ্য। প্রেম বা সতীত্ব থাকবে না এমন নয়, থাকবে, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা হবে অন্যরকম। একনিষ্ঠতা সুকর ছিল যখন স্বামী-স্ত্রী থাকত একস্থানস্থ এবং যখন অনাত্মীয় অনাত্মীয়দের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল অল্পই। এখন স্বামী লণ্ডনের দোকানে কাজ করে তো স্ত্রী কাজ করে শিকাগোর দোকানে, এবং উভয়েরই দোকানে বা দোকানের বাইরে বান্ধব-বান্ধবীর সংখ্যা নেই। একদিন যে প্রেম য়্যাটলান্টিকের এক জাহাজে যেতে যেতে হয়েছিল, চিরদিন সে প্রেম নাও টিঁকতে পারে এবং সে প্রেমের পথে প্রলোভনও তো অল্প নয়। সুতরাং ডিভোর্স এবং পুনর্বিবাহ এবং আবার ডিভোর্স। কিংবা বিবাহটা একজনের সঙ্গে পাকা, মিলনটা অন্যান্য জনের সঙ্গে কাঁচা। এটা অবশ্য গরুর গাড়ির ধর্মনীতির সঙ্গে এরোপ্লেনের হৃদয়গীতির সন্ধি করার প্রয়াস। কেননা ডিভোর্স আইন এখনো গরুর গাড়ির অনুশাসন অনুসারে কড়া এবং রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মে নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতে সন্ধির দরকার হবে না, গরুর গাড়ি হটবেই, ডিভোর্সটা বিবাহের মতো সোজা হবে এবং বিবাহটা স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে বদ্‌লাবে। কেবল মুশকিল এই যে, মানুষের হৃদয়টা অত সহজে বদ্‌লাবার নয়, এডোনিস্‌কে হারিয়ে ভিনাস্ কেঁদে আকুল হবে, ইউরিপিডিসকে খুঁজতে অর্ফিউস পাতাল প্রবেশ করবে, সীতার শোকে রঘুপতি স্বর্ণসীতাকেই হৃদয় দেবেন।

এতদিন নারী-নরের সম্বন্ধগুলো ছিল পারিবারিক—মাতা ও পুত্র, ভগিনী ও ভ্রাতা, স্ত্রী ও স্বামী, কন্যা ও পিতা। এখন এক নতুন সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েছে—সখা ও সখী। বিয়ের আগে বুঝতে পারা যাচ্ছে না শতেক সখীর মধ্যে কোন্‌টি প্রিয়তমা—কোন্‌টি স্ত্রী। বিয়ের পরেও পদে পদে সন্দেহ হচ্ছে, যাকে বিয়ে করেছি সে স্ত্রী না সখী, এবং যাদের সঙ্গে সখ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন একজন সখী না স্ত্রী। গুরুজনের নির্বন্ধে যখন বিয়ে করা যেত এবং অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটত না, তখন যাকে পাওয়া যেত সেই ছিল স্ত্রী। কিন্তু এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে, ঠিক কর্‌তে গিয়ে ভুল ক'রে ফেলা

অতি সহজ, এবং ভুল থেকে উদ্ধার পাওয়া অতি শক্ত। এখন আত্মীয়দের সঙ্গে নানা সূত্রে পরিচয়। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও স্ত্রীর সঙ্গে যত না সাক্ষাৎ হয় সখীদের সঙ্গে ততোধিক। স্ত্রী যখন নিকটে থাকে তখন শোবার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখা করবার ফুরসৎ কোন পক্ষেরই নেই। যে যার নিজের কাজে যায় ও রেস্তোরাঁয় একা একা খায়। আর স্ত্রী যখন দূরে থাকে তখন তো দেখা হবারই নয়।

এই দূরে থাকাথাকিটাই বেশীর ভাগ স্থলে ঘটছে। কেননা বিয়ের আগে স্ত্রী যে কাজে বিশেষজ্ঞ হয়েছে, বিয়ের পরে সে কাজটি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক কর্মস্থল থেকে আরেক কর্মস্থলে ঘুরতে থাকা তার পক্ষে মস্ত বড় ত্যাগ, এবং সে ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি। সুতরাং প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী স্বামী যদি সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয় তো স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তার বৎসরান্তে একবার। কিংবা কৃষক স্বামীর স্ত্রী যদি ভ্রাম্যমাণ চিত্রকর হয় তো স্বামীর সঙ্গে সে একেবারে বেশীদিন থাকতে পারে না। অথচ অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন নূতন পুরুষের আলাপ-বন্ধুতা এবং সংবাদদাতার সঙ্গে প্রতিদিন নূতন নারীর সাক্ষাৎ পরিচয়। এরূপ স্থলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, কে সখী—যাকে বিবাহ করেছে সে নাও হ'তে পারে স্ত্রী, যাকে বিবাহের আগে দেখেনি সেই হ'তে পারে সখীর অধিক। যারা হৃদয় সম্বন্ধে অনেস্ট্ তাদের পক্ষে এটা এক বিষম সমস্যা, যারা সমাজকে ভয় ক'রে ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে কিছু নয়। তারা হয় চুপ করে স'য়ে যায়, কাঁদে; নয় যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ ডুবে ডুবে জল খায়।

বিশ বছর আগেও স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুতা ছিল সমাজের চোখে সন্দেহাত্মক, বিশেষত বিবাহের পরেও স্বামীর বা স্ত্রীর অনভিমতে। এখন বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে স্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে যাচ্ছে যে, স্ত্রীর সখাদের নিয়ে স্বামী কিছু বলতে পাবে না, স্বামীর সখীদের নিয়ে স্ত্রী কিছু বলতে পাবে না, পরস্পরের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুতা কোনো কোনো স্থলে সঙ্কট ঘটালেও মোটের ওপর সমাজ-সম্মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ-সম্মত না হ'লে চলতও না। কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন একটা ব্যবধান অনিবার্য হয়ে পড়েছে,

দূরত্বজনিত ব্যবধান। স্ত্রী আর গৃহিণী নয়, হোটেলবাসীর গৃহিণীর প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী আর সচিবও নয়, ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা তার অভিনেত্রী স্ত্রীর কাছে কী মন্ত্রণা প্রত্যাশা করতে পারে। স্ত্রী নিজের কাজে ব্যস্ত। বরং একজন সাংবাদিকার কাছে মন্ত্রণা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। তারপর স্ত্রী যদি বা সখী হয় তবু দূরে থাকে ব'লে বন্ধুতার সব দাবী মেটাতে পারে না,—ধরো, একসঙ্গে টেনিস্ খেলতে পারে না, সিনেমায় যেতে পারে না, হোটেলে খেতে পারে না, মোটরে বেড়াতে পারে না, অবসরকালে গল্প কর্‌তে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে অনিবার্য ব্যবধানটি, এটিকে পূরণ করতে পারে অন্য নারী বা অন্য পুরুষ—সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক্ না কেন। সেই জন্যে এখন পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে-নারীতে বন্ধুতার মতো স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতাও চল্‌তি হয়ে গেছে, এ নিয়ে কেউ কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয় না।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে সেকালের প্রেম ও সতীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমত, প্রেম যে চিরস্থায়ী. এমন কি দীর্ঘস্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিবাহের সময় এখানকার তরুণ-তরুণীরা তাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা'র মতো গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করে না যে, যাবজ্জীবন পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাক্‌বেই। প্রতিজ্ঞা যদিও বাঁধা নিয়ম মেনে করে, তবু লঘুভাবেই করে, মুখে যা বলে মনে তা বলে না। মনে মনে যোগ ক'রে দেয়—"আশা করি"। যে ক্ষেত্রে ডিভোর্স যত সুলভ সে ক্ষেত্রে লঘুভাবটা তত বেশী। এই লঘুভাবটা না থাক্‌লে মানুষ ভয়ে আধমরা হত। কেননা এখন তো বিবাহ পিতামাতার নির্বন্ধে নয় যে ভুলের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভগবানকে ডেকে আশ্বস্ত হবে। নির্বন্ধ যখন নিজেরই হাতে তখন ভুলের দায়িত্ব নিজেরই। একদিনের ভুলের জন্যে চির-জীবন প্রায়শ্চিত্ত করা অসহ্য। তা ছাড়া ভুল নাই হোক, ঠিকই হোক, একদিনের ঠিক কি চিরদিনের ঠিক থাকে? বিশ বছর বয়সের ঠিক কি ত্রিশ বছর বয়সেও ঠিক থাকে? দু'পক্ষই বদলায়, দু'পক্ষই নতুন সত্যকে পায় পুরোনো সত্যকে ভোলে। র'লার "আনেৎ" যাকে প্রাণ ভ'রে ভালোবাস্‌ত তাকে কথা দিতে পারল না যে চিরদিন তেমনি ভালোবাস্‌বে, সেই জন্যে তাকে বিবাহই করতে

পারল না, অথচ তার ভালোবাসার চিহ্ন ধারণ করল তার সন্তানের মা হয়ে।

দ্বিতীয়ত, সতী নারীর স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের সঙ্গে তেমনি অন্তরঙ্গতা থাকতে পারে যেমন অন্তরঙ্গতা এযাবৎ কেবল সখীর সঙ্গেই সম্ভব ছিল। পর-পুরুষকেও ভালোবাসা যায়, তার সঙ্গে গা ঘেঁষে বসা যায়, তার কোলে মাথা রাখা যায়, অভিনয়কালে তাকে চুম্বন-আলিঙ্গনও করা যায়, এমনি কি অন্য সময়ও। স্বামীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার সখার সঙ্গে তেমনি। অথচ সতীধর্মের ব্যত্যয় হয় না। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ়তম ভালোবাসা থাকে। এক কথায় সখ্য প্রেম ও মধুর প্রেমে পরস্পরবিরোধী নয়, একই হৃদয়ে দু'য়েরি স্থান হতে পারে। এবং এমনো একদিন হতে পারে যে, সখ্য প্রেমই মধুর প্রেমে পরিণত হয়েছে, মধুর প্রেম সখ্য প্রেমে পর্যবসিত। সেরূপ স্থলে সম্বন্ধ পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই ঠাঁই থাকার ফলে এমন ঘটা বিচিত্র নয়। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই স্বতন্ত্র, দু'জনেই স্বাবলম্বী, দু'জনেই ভ্রাম্যমাণ—একদিন যে দুটি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে মিলেছিল চিরদিন তারা সেইস্থানে থাকতে পারে না, পরস্পরের থেকে সমান দূরত্ব রাখতে পারে না, দূরত্বের কম বেশী ঘটে, অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এক সম্বন্ধ আরেক হয়ে ওঠে। যে ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না,—দাম্পত্য ও সখ্য যেমন ছিল তেমনি থাকে,—সে ক্ষেত্রেও যে সতীত্বের পুরোনো আদর্শ খাটে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা পুরোনো সতীত্বের সঙ্গে ছিল নিজের দ্বারা স্ত্রীকে বা স্বামীকে সাত-পাকে ঘিরে রাখা, এখন অনেকখানি ঢিলে দিতে হচ্ছে, কোনো পক্ষেই বিশ্বস্ততার জন্যে পীড়াপীড়ি নেই, বিশ্বস্ততার জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই, ওথেলো ক্রমশ সেকেলে হয়ে পড়ছে। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে। চিরকুমার থাকলে সেকালে উপবাসী থেকে যেতে হতো, চিরকুমার থাকলে একালে আধপেটা থাকতে পারা যায়—সখী থাকে কাছে। বিবাহ করলে সেকালে পেট ভ'রে উঠত, বিবাহ ক'রেও একালে আধপেটা থাকতে হয়—স্ত্রী থাকে দূরে। একালের কুমারীদের অনেক দুঃখ থেকে অব্যাহতি মিলেছে, সেইজন্যে তারা বিবাহের জন্যে কেঁদে মরছে না। এবং একালের বিবাহিতারাও অনেক সুখ থেকে বঞ্চিত

হয়েছে, সেইজন্তে তারা সৌভাগ্যগর্বে বাড়াবাড়ি করছে না।

তবে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রমুখ দেশের স্ত্রী-পুরুষের সাতিশয় সংখ্যা-বৈষম্যের দরুণ প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিমতার উৎপত্তি হয়েছে বটে। কর্তারা দুনিয়া দখল করতে ব্যস্ত, যুদ্ধ না করলে তাদের চলে না, দেশের নারী সংখ্যার অনুপাতে পুরুষ সংখ্যা যে কমতেই লেগেছে আর সেজন্তে নারী ও পুরুষ উভয়েরই যে নীতিভ্রংশ হচ্ছে একথা কর্তারা বুঝেও বুঝছেন না। ছেলেরা জানে মেয়েরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী, সুতরাং বিবাহের গরজটা মেয়েদেরই বেশী, সাধতে হয় তো ওরাই সাধবে, তপস্যাটা একেবারে ও-তরফা। মেয়েরা জানে সকলের বরাতে বিবাহ নেই, বিবাহ যদি বা হয় তবু স্বামীকে ধ'রে রাখতে পারা যাবে না, একজনকে হারালে আরেক জনকে পাবার আশা নেই, তপস্যাটা অনর্থক এ-তরফা। এর পরিণাম এই হচ্ছে যে, তপস্যাটাকে কোনো তরফই স্বীকার করছে না, হাতে হাতে যখন যা পাচ্ছে তখন তা নিচ্ছে, পরমুহূর্তে ছেলেরা ফেলে যাচ্ছে, মেয়েরা কান্না চাপছে। এ বড় নিষ্ঠুর খেলা। দু'পক্ষে সমান নিয়ম খাটছে না, একপক্ষ ফাউল করতে করতে অতি সহজে জিতছে, অপরপক্ষ ফাউল সইতে সইতে অতি সহজে হারছে। দু'পক্ষেরই নীতিভ্রংশ, তবু মেয়েরা দোষ ধরছে ছেলেদের, ছেলেরা দোষ ধরছে মেয়েদের। মেয়েরা বলছে, বাপ রে! একেলে ছেলেগুলোর কী দেমাক; এরা আমাদের খাওয়াবে না পরাবে না প্রতিপালন করবে না, শুধু আমাদের বিয়ে ক'রে মাথা কিনবে, এরই জন্তে এত খোসামোদ! আমাদের ঠাকুরমাদের জন্তে আমাদের ঠাকুরদা'রা কী না করতেন, ডুয়েল ল'ড়ে প্রাণ বিপন্ন করতেন, যাকে অত কষ্টে পেতেন তাকে কত যত্নে রাখতেন! আর আমাদের এরা—! ছেলেরা বলছে, তোমরা সব স্বাধীনা স্বতন্ত্রা আলোকপ্রাপ্তা শী-ম্যান, আমাদের না হ'লে তোমাদের যে চলে না এ তো বড় লজ্জার কথা! আর আমরা তো বেশ লক্ষ্মীছেলেই ছিলুম, তোমরা এতগুলোতে মিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণীর কাকে ছেড়ে কাকে ধরা দেবো আমরা পুরুষ চন্দ্রমারা!

এদেশে এসে অবধি দেখছি বিপুলভাবে ধর্মচর্চা চলেছে। পাড়ায় পাড়ায় গির্জা, পথেঘাটে ধর্মপ্রচার, কুলীর পিঠে ধর্মবিজ্ঞাপন। যে জাতীয় সংবাদপত্রে কুকুর দৌড়ের, শেয়ার মার্কেটের ও ডিভোর্স কোর্টের খবর থাকে সে জাতীয় সংবাদপত্রেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। রেলে ও বাসে, আপিস থেকে ফেরবার সময় এক হাতে সান্ধ্য কাগজ ও অন্য হাতে ছ'পেনী দামের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে একবার এটাতে ও একবার ওটাতে চোখ বুলিয়ে যেতে কত লোককেই দেখি। শুনতে পাই এখন ধর্মগ্রন্থগুলোর যত কাটতি নভেল নাটকেরও নাকি তার বেশী নয়। বছর পনেরো-কুড়ি আগে নাকি এতটা ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে হঠাৎ ধর্ম-চর্চার মরা গাঙে বান ডেকেছে। তা ব'লে অর্থচর্চা বা কামচর্চা কিছুমাত্র কমেছে এমন নয়। একসঙ্গে ত্রিমূর্তির উপাসনা চলেছে—গড, ম্যামন, Eros। ব্যাঙ্কের এক্স্‌চেঞ্জে ডার্বীতে থিয়েটারে নাচঘরে হোটেলে পার্কেগির্জায় সর্বত্র লোকারণ্য, কোনো একটার ওপরে বিশেষ পক্ষপাত কারুর নেই, স্কুলে কলেজে লাইব্রেরীতে কারখানায় যেখানেই যাই সেখানে লোকের ভিড়। মিউজিয়ামে চিত্রশালায় হাসপাতালে অন্ধ-আতুর-অনাথাশ্রমে যুদ্ধনিবারণী সভায় কোথাও কারুর আগ্রহ কম নয়। একটা জীবন্ত জাতির হাজারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই সমান জীবন্ত, যেমন তাদের বৈচিত্র্য তেমনি তাদের বৈপরীত্য, ভালো মন্দ সুন্দর কুৎসিত পদ্ম পাঁক ঐশ্বর্য দৈন্য প্রেম হিংসা সবই একাধারে বিধৃত এবং সবই সমান প্রচুর। সেইজন্যে ধর্ম সম্বন্ধে সকলেই ভাবতে শুরু করেছে, একুশ বছর বয়সের ফ্ল্যাপার পর্যন্ত। শনিবারের দিন সন্ধ্যাবেলা যে সব যুবক-যুবতী পরস্পরের কোলে মাথা রেখে মাঠে বাগানে সকলের সামনে প্রেমালাপ করে, রবিবারের দিন সকালবেলা সেই সব যুবক-যুবতী গির্জায় ভিড় ক'রে অখণ্ড মনোযোগের সহিত ধর্মোপদেশ শোনে, কলের পুতুলের মতো হাঁটু গাড়ে। এবং সোমবারের দিনদুপুরে যখন তারা আপিসে গিয়ে পাশাপাশি কাজ করে তখন কেউ কারুর সঙ্গে ইঙ্গিতেও কথা বলে না, এমনি কঠোর ডিসিপ্লিন। কাল যদি যুদ্ধ বাধে ছেলেরা হাসিমুখে বন্দুক কাঁধে নিয়ে মরণযাত্রা করবে, মেয়েরা দেশের ভার কাঁধে নিয়ে ঘর ও

বাহির দুই আগ্‌লাবে। সুখের সময় সুখ, দুঃখের সময় আশা, সব সময় প্রস্তুত ভাব—এই হচ্ছে ইংলণ্ডের ধর্ম, ইউরোপের ধর্ম।

সামরিক সংস্কার বহুদিন হ'তে আমাদের সমাজে নেই, যখন ছিল তখন সমস্ত সমাজটার একটি বিশেষ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মেরও উচ্ছেদ হয়েছে। ইউরোপের সমাজের সর্বশ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বাসী, এ বিশ্বাসের ওপরে এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না, এ বিশ্বাস এদের প্রকৃতিগত, যুদ্ধহীন জগৎ এরা মনেও আনতে পারবে না। মানুষে মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা এদের অনেকে বুদ্ধি দিয়েবুঝেছে কিন্তু সংস্কার থেকে পায়নি। পশুতে মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা আড়াই হাজার বছর আগে, বুদ্ধের সময় থেকে মেনেছি, এরা এখনো জানেনি। প্রকৃতিতে পুরুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা দৈববাদীরা কবে শিখলুম জানিনে, এরা কোনোদিন শিখবে না। এদের ভাব-জগতেও আইডিয়াতে আইডিয়াতে যুদ্ধ। এদের ধর্ম যুদ্ধের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকার ধর্ম। ন কিঞ্চিদপি বলহীনেন লভ্যম্। নিশ্চেষ্ট যদি এক মুহূর্তের জন্যেও হ'ও তব অপরে তোমাকে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

ধর্ম ও রিলিজন এক জিনিস নয়। আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, লোকমুখে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু মানে ভারতীয়, সুতরাং ভারতীয় ধর্ম। আমাদের রিলিজনগুলোর নাম বৈষ্ণব মত, শাক্ত মত, শৈব মত, গাণপত্য মত, ইত্যাদি। আমরা যদি খ্রীষ্টিয় মত বা মহম্মদীয় মত নিই তবু আমরা হিন্দুই থাকব, ধর্মত হিন্দু। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ধর্মমতের তেমন সহজ সম্বন্ধ থাকবে না, কতকটা স্বতঃবিরোধ এসে পড়বে। আমাদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান খ্রীষ্টান হয়েছেন তাঁরা হিন্দুই আছেন, কিন্তু ভিতর থেকে সৃষ্টির স্ফূর্তি পাচ্ছেন না, ইচ্ছানুসারে ইস্‌লামকে বা খ্রীষ্টিয়ানিটিকে পরিবর্তন করতে পারছেন না, পরমুখাপেক্ষী হচ্ছেন। ইউরোপেরও এই দশা। ইউরোপের ধর্ম ও ধর্মমত অঙ্গাঙ্গী নয়, বিরুদ্ধ।

ইউরোপের প্রকৃতি হোমারের আমলে যা ছিল এখনো তাই কিন্তু মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের একটি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ইউরোপের প্রকৃতির পক্ষে আড়ষ্টতাজনক। খ্রীষ্টিয়ানিটির দ্বারা ইউরোপের অশেষ

উপকার হয়েছে, খ্রীষ্টিয়ানিটির পেষণে ইউরোপের আত্মা সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি পায়নি। ইউরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল। ইউরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। ইউরোপ বিনা পরীক্ষায় কিছু মানে না, পরীক্ষার পর যা মানে তার বাইরে সত্য খুঁজে পায় না। আমরা অম্লানবদনে সব মেনে নিই, অধিকারী ভেদে মিথ্যাকেও বলি সত্য। ইউরোপ বিশ্বাস করে যোগ্যতমের উদ্বর্তনে, আমরা বিশ্বাস করি সমন্বয়ে। এহেন যে ইউরোপ তাকে তার নিজস্ব রিলিজন অভিব্যক্ত করতে না দিয়ে রাহুগ্রস্ত ক'রে রাখল খ্রীষ্টিয়ানিটি। সেই দুঃখে গোটা মধ্যযুগটা ইউরোপ অন্ধকারেই কাটাল। যেদিন গ্রীসকে দৈবাৎ পুনরাবিষ্কার ক'রে সে আপনাকে চিন্‌ল সেদিন ঘটল Renaissance, তার পর থেকে শুরু হলো Reformation অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানিটির অগ্নিপরীক্ষা। সে অগ্নিপরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি কিন্তু ধর্মচর্চার এই প্রাবল্য দেখে মনে হয় এ বোধ হয় নির্বাণ দীপের শেষদীপ্তি—এর পরে হয় খ্রীষ্টিয়ানিটিকে ভেঙে বিজ্ঞানের আলোয় নিজস্ব ক'রে গড়া হবে, নয় বিজ্ঞানের ভিতর থেকে নতুন একটা রিলিজন বার করা হবে। বিজ্ঞান কথাটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। ইউরোপীয় দর্শনটাও বিজ্ঞানেরই তাঁবেদার। এবং বিজ্ঞান বলতে কেবল Physics ও Biology নয়, Psychology-ও বোঝায়। এখনো বিজ্ঞানের সাম্‌নে বিরাট একটা অজানা রাজ্য রয়েছে—মানুষের মন। ক্রমে ক্রমে যতই তাকে চেনা যাবে ততই একটা নতুন রিলিজনের মালমশলা পাওয়া যাবে।

রিলিজনের জন্যে মানবহৃদয়ের যে সহজ তৃষা তাকে শান্ত করবার ভার অপরকে দিলে চলে না; নিজেরি ওপরে নিতে হয় সে ভার। ইউরোপের ভার এতদিন অন্যে বয়েছে। অন্যের ফরমাস খেটেও বাঁধাবরাদ্দ পেয়ে ইউরোপের তৃষা তো মেটেইনি, অধিকন্তু খ্রীষ্টিয়ানিটির ওপরে রাগ করে রিলিজনের প্রতি জন্মেছে অনাস্থা—যেন রিলিজনকে না হলেও মানুষের চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে সে উন্নতি বহুদিনের রুদ্ধ জলের নিষ্কাশন, তাই সে এমন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রীসের যদি মরণ না হতো তবে গ্রীসের ছেলেটি আয়ার কোলে অমানুষ না হয়ে তার নিজের কোলেদিন দিন শশিকলার

মতো বাড়তে বাড়তে এতদিনে কেমন হয়ে উঠত জানিনে, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানিটির ওপরে আধুনিক ইউরোপের মহা মনীষীদের এমন অশ্রদ্ধা ও রিলিজনের ওপরে তাঁদের এমন অনাস্থা দেখতুম না। তাঁরা বলছেন, এই হতভাগ্য ধর্মমতটার জন্যই এত যুদ্ধ, এত অশান্তি, এত গোঁড়ামি, এত কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাসী যাজকরা সেক্সকে পাপ ব'লে নিজেরা বৈরাগী হয়েছেন অথচ অন্যদের বলেছেন বহু সন্তান-বান হ'তে, আর জনবৃদ্ধির ফলে যখন যুদ্ধ বেধেছে তখন এঁরাই দিয়েছেন মরণ-মারণের উত্তেজনা ; এঁরা প্রচার করেছেন আত্মসম্মাননাশী উৎকট পাপবাদ—"We are born in sin", আমরা অধম, একমাত্র যীশুই ভরসা ; গণতন্ত্রের এঁরাই শত্রু, স্বাধীন মানুষকে এঁরা সহ্য করতে পারেন না ; দাসব্যবসায়ের সমর্থক এঁরা, এঁরা বড়লোকের মোসাহেব, ক্যাপিটালিস্টের বাহন, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে রাশিয়া থেকে চার্চ উঠে গেল, ফ্রান্সে চার্চের ওপরে কড়া নজর, ইংলণ্ডে চার্চের প্রতিপত্তি কিছুদিন থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে ততটা ছিল না। তবে ইংলণ্ডে চার্চ ইংলণ্ডের স্টেটেরই মতো জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। সেই জন্যে জনসাধারণকে খুশি রাখার জন্যে এর অবিশ্রাম চেষ্টা।

চার্চ ও স্টেট এদেশের সমাজের এপিঠ ওপিঠ। যাঁরা চার্চের নেতা তাঁরা পার্লামেন্টে বসেন, যাঁরা স্টেটের কর্ণধার তাঁরাও পার্লামেন্টে বসেন, পার্লামেন্টই হচ্ছে এদেশের সমাজপতিদের আড্ডা। আমাদের দেশে স্টেট্ ও সমাজ এক নয় এবং চার্চ আমাদের নেই। চার্চ যে এদের কতখানি তা আমরা দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারব না, কেননা চার্চ মানে শুধু গির্জা নয়, চার্চ মানে সঙ্ঘ। সঙ্ঘ আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগের পর থেকে আর নেই। কেশবচন্দ্র সেন সঙ্ঘের পুনঃপ্রবর্তন করেন, আমাদের আধুনিক সঙ্ঘের নাম ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজকে কেউ কেউ ব্রাহ্মচার্চ ব'লে থাকেন, প্রবর্তক সঙ্ঘকেও প্রবর্তক চার্চ নাম দেওয়া চলে। কিন্তু হিন্দু সমাজকে হিন্দু চার্চ বলা চলে না। হিন্দুসমাজ কোনো একটা বিশেষ ধর্মমতকে প্রতি পদে মেনে চলবার জন্যে গঠিত একটা কৃত্রিম সঙ্ঘ নয়, হিন্দুর কাছে ধর্মমত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্বামী শাক্ত ও স্ত্রী বৈষ্ণব ও সন্তান নাস্তিক হলেও হিন্দুসমাজ আপত্তি করে না। আজ যদি হিন্দুসমাজ সেকালের

মতো জীবন্ত থাকৃত তবে স্বামী শৈব ও স্ত্রী মুসলমান হলেও আপত্তি করৃত না। হিন্দুধর্ম ছিল দেশের ধর্ম, দেশে যে কেউ বাস করৃত সে ছিল হিন্দু। জাতিভেদের উৎপত্তি হয়েছিল পেশাভেদের দ্বারা, পেশা বদ্‌লালে জাতিও বদ্‌লাত; কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো অধিবাসীকেই অহিন্দু বলা হতো না, যাই হোক না কেন তার ধর্মমত বা রিলিজন।

হিন্দুসমাজ কোনো দিন ধর্মমত নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু দেশের আচারকে বা দেশের প্রথাকে শাক্ত-বৈষ্ণব নির্বিশেষে মেনেছে। এখনো কি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-আর্য খ্রীষ্টান-মুসলমান ভারতীয়রা সাকারবাদী শাক্ত বৈষ্ণবদের মতো একান্নবর্তী পরিবার ও তার অনিবার্য পরিণাম বাল্যবিবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে বাল্যবিবাহ উঠে যাচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রেভল্যুশনের ফলে। এর সঙ্গে ধর্মমতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ধর্মমত-নির্বিশেষে অখণ্ড হিন্দুসমাজের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, খ্রীষ্টান-মুসলমান-বৈষ্ণব-শাক্ত সকল ভারতীয়ের মধ্যে একই সংস্কার বিদ্যমান। তবু কয়েকটা ধর্মমত হিন্দু নাম দিয়ে অন্যগুলিকে অহিন্দু নাম দেওয়া হচ্ছে, ধর্মমতকে ধর্ম ব'লে ভুল ক'রে।

চার্চ বা সঙ্ঘ হচ্ছে একটা ধর্মমতের বা রিলিজনের দ্বারা পরিচালিত সমাজ, জাতীয় প্রকৃতি বা জাতীয় ধর্মের সঙ্গে তার রক্ত-সম্পর্ক নেই। চার্চ অনায়াসেই আন্তর্জাতিক হতে পারে। রোমান চার্চ এতদিন সমস্ত ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাবেই শাসন করছিল, ক্রমশ আধিভৌতিক দিকটাকে নিয়ে আধুনিক ধরনের স্টেট্ গ'ড়ে ওঠে, চার্চের কাজ লাঘব হয়। তারপর নানা দেশে স্টেটের সঙ্গে চার্চের নানা বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কোথাও স্টেট্ চার্চকে গ্রাস করে, কোথাও স্টেট্ চার্চকে ভাতে মারে, কোথাও স্টেট্ চার্চকে কোনো মতে টিঁকে থাকবার অনুমতি দেয়। ইংলণ্ডে কিন্তু স্টেট্ ও চার্চ বেশ বনিবনা ক'রে চল্‌ছে, চার্চ অবশ্য এখন স্ত্রৈণস্বামীর মতো স্টেটের বিশেষ অনুগত, নইলে রাশিয়ার চার্চের মতো তাকেও ভিটেছাড়া হয়ে বনে পালাতে হতো। কিন্তু অত্যাধুনিক স্ত্রীদের খোস মেজাজের ওপর অতটা ভরসা রাখা স্বামী মাত্রেরই পক্ষে ভয়াবহ।

ইংলণ্ডের চার্চও কবে disestablished হয়ে মনের দুঃখে বনে যাবে বলা যায় না, স্টেটের জুলুম দিন দিন বাড়ছে।

খ্রীষ্টিয় আদর্শের যাঁরা সমর্থক তাঁদের অনেকে বলছেন, "Christianity never had a trial." খ্রীষ্টিয় আদর্শকে আমরা গ্রহণই করিনি এতদিন, আমরা গ্রহণ করেছি চার্চের কর্মকাণ্ড, আমরা শরণ করেছি সঙ্ঘকে। চার্চের দ্বারা খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এতকাল ঢাকা প'ড়ে এসেছে, খ্রীষ্টের সরল উক্তিগুলিকে চার্চের মহোপাধ্যায়েরা টীকাভাষ্যের দ্বারা জটিল ক'রে কুটিল ব্যাখ্যা করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্ব ও নিউ টেস্টামেন্টের ত্রাণতত্ত্বকে গোড়াতে স্বীকার না করেও খ্রীষ্টের অনুজ্ঞা পালন করা সম্ভব, খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা সম্ভব। খ্রীষ্টের জন্মঘটিত রহস্যগুলো সম্বন্ধে খ্রীষ্ট স্বয়ং কিছু বলেননি, চার্চই যা খুশি বলিয়েছে। নিজের প্রতিপত্তির জন্যে চার্চ খ্রীষ্টকে এক্সপ্রয়েট করেছে, খ্রীষ্টকে ইচ্ছামতো ভেঙে গড়েছে। আমরা সত্যিকার খ্রীষ্টকেই চাই, আমরা চার্চের হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমরা খ্রীষ্টের সৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ানিটিকেই চাই ; আমরা চার্চের বানানো খ্রীষ্টিয়ানিটি বর্জন করব। —চার্চের হাত থেকে রিলিজনকে উদ্ধার ক'রে তাকে ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণার বিষয় কর্‌বার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এতকালের চার্চকে এক কথায় বিদায় দেওয়া যায় না, তুলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সঙ্ঘের মধ্যেও একটা সত্য আছে, সঙ্ঘবদ্ধ সাধনারও একটা মূল্য আছে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝখানে হয়তো চিরকাল একটা মধ্যস্থ থেকে যাবেই, সেটার নাম গ্রুপ বা পার্টি বা সম্প্রদায় যাই হোক্ না কেন। নির্জলা ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বা নির্জলা সমাজতন্ত্রবাদ সফল হ'তে না জানি কত কাল লাগবে। হিন্দুসমাজের পেশাগত জাতি এতদিন জন্মগত হয়ে না দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হিন্দুসমাজই জগৎকে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাক্‌ত।

রিলিজনের ক্ষেত্রে পূর্ব দেশের কাছ থেকে কোনো রকম দিশা পাওয়া যায় কি না এই নিয়ে অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছেন, বুদ্ধকেও নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছর রিলিজন বল্‌তে কেবল খ্রীষ্টিয়ানিটিই যাঁরা

বুঝেছেন তাঁদের মুখ বদ্লাবার পক্ষে পৃথিবীর অপরাপর রিলিজনগুলোর মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তাঁরা স্থায়ীভাবে ওগুলিকে গ্রহণ কর্‌বেন এমন ভাবা ভুল। কারণ ওসব রিলিজন খ্রীষ্টিয়ানিটিরই মতো অন্য মাটির গাছ, ইউরোপের মাটিতে রোপণ কর্‌লেওদের বৃদ্ধি তোহবেই না, ইউরোপের নিজের ফসল ফলাবার জন্যে যথেষ্ট জায়গাও থাক্‌বে না। ইউরোপের ধর্মের সঙ্গে বাইরের ধর্মমতের নাড়ীর বাঁধন নেই, তেলে জল মিশ খাবার নয়। ইউরোপের প্রকৃতি নিজের ফুল নিজে ফোটাতে পারে তো নিজেই একদিন ফোটাবে, অন্যের ফুল আদর করে দেখতে পারে, পর্‌তে পারে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে, তাজা রাখতে পারবে না। ইউরোপের আপনার জিনিস তার ফিলজফি, তার বিজ্ঞান।। পরের কাছে ধার করা থিওলজিকে সে এখনো আপনার কর্‌তে পারল না, দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। আবার যদি ধার কর্‌তে যায় তো দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধার করবে, নিজের ধাতের ভিত্তির ওপরে পরের মতের সৌধ প্রতিষ্ঠা করবে, ভূমিকম্পে হয়তো ভিত্তি টল্‌বে না, সৌধ ধ্বসে পড়বে। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হাড়ে দৈব। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব, শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি; আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব, মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। ইউরোপ অর্জন ক'রে উড়িয়ে দেয়, আমরা অমনি ভিতর থেকে পাই, সঞ্চয় করি। আমাদের উপলব্ধি ইউরোপ যদি নেয় তো নিজের মনের মতো ক'রে নেবে, খ্রীষ্টিয়ানিটির আত্মাটুকু বাদ দিয়ে যেমন ধড়টাকে চার্চে ঝুলিয়ে রাখল এবং নিজের যুদ্ধপ্রিয়তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে বেতাল ক'রে তুলল, আমাদের বেদান্ত বা বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই কর্‌বে, এবং নিজের বিজ্ঞান-দর্শনের দ্বারা ডিষ্টিল্ ক'রে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই তার গ্রহণ করবে না। সেইজন্যেই আমার মনে হয় ইউরোপকে আমরা মুরুব্বীর মতো শিক্ষা দিতে পার্‌ব না, কেবল বন্ধুর মতো সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব।৷ আমাদের সাহায্যে ইউরোপ যদি নিজের রিলিজন্ নিজে সৃষ্টি করে, আর ইউরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজনগুলোকে বিজ্ঞান-শোধিত করে নিই তবে অতি

দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম; দুটিতে হবে হরিহরাত্মা। তার পরে যখন আরো দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের প্রকৃতি এক হয়ে আসবে, ধর্ম এক হয়ে আসবে, তখন দু'টিতে হবে এক-দেহমন, একাত্ম।

এই মুহূর্তে রিলিজন্ সম্বন্ধে ছোটবড় ইতরভদ্র সকলেই কিছু কিছু ভাবছে, কিন্তু এখনো সে ভাবনা তেমন ঐকান্তিক হয়নি, যেমন হ'লে নতুন একটা রিলিজনের জন্ম-লক্ষণ দেখা যেত। মাত্র দেড়শো বৎসরের বিজ্ঞানচর্চা জীবনকে এখনো যথেষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত করেনি, দেড়শো বছর আগের গরু ঘোড়ার গাড়ি থেকে মাত্র এরোপ্লেন অবধি উঠেছে, এখনো অসংখ্য উদ্ভাবন বাকি। আগামী দেড়শো বছরে হয়তো আকাশে বাড়ি তৈরি করে ফুল ফুটিয়ে দেবে। জীবন যতই জটিল হয় রিলিজন্‌কে ততই দরকার হয়—রিলিজন্ খুলে দেয় গ্রন্থি, রিলিজন্ ক'রে তোলে সরল। সরলীকরণের আকাঙ্ক্ষা এখনো তীব্র হয়নি বটে, তবু সরলীকরণ যে দরকার সে জ্ঞান সকলেরই কতকটা হয়েছে। ভারতবর্ষে গান্ধীর জন্ম, তিনি যন্ত্রের প্রতাপ সামান্যই দেখেছেন, তাঁর বিশ্বাস যন্ত্রকে না হলেও মানুষের চলে, তিনি জীবন থেকে যন্ত্রকে ছেটে ফেল্‌লেই সরলীকরণের সাক্ষাৎ পান। কিন্তু ইউরোপে যে সব মনীষীর জন্ম তাঁরা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাঁদের জন্মের বহু পূর্ব হতেই যন্ত্র ও জীবন এক হয়ে গেছে, যন্ত্রকে ছেঁটে ফেলা ও শরীরের চর্ম তুলে ফেলা তাঁদের পক্ষে একই কথা। সরলীকরণের জন্যে তাঁরা যন্ত্রকে ছেড়ে যন্ত্রীর দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন, যন্ত্রকে রেখেও জীবনকে কতখানি সফল করা যায় এই হচ্ছে তাঁদের প্রশ্ন।

সেই জন্যে দেখা যায় ধনীদের ঘরেও আসবাবের বাহুল্য কম্‌ছে, সুন্দর দেখে অল্প কয়েকটি আসবাব রাখা হচ্ছে। মেয়েদের পোশাকের ওজন কম্‌ছে, বহর কম্‌ছে : সুরুচিকর দেখে অল্প কয়েকখানা কাপড় পরা হচ্ছে। খোলা আকাশে খোলা হাওয়া খোলা মাঠের টানে ছেলেরা পায়ে হেঁটে পৃথিবীময় ঘুরছে। অল্প কাপড়, সাদাসিদে খাবার, প্রচুর শারীরিক শ্রম, খোলা জায়গায় নিদ্রা—এই সব হলো ইয়ুথ মুভমেণ্টের মূলসূত্র। জার্মানী অঞ্চলে কাপড় জিনিসটাকে যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টা চলেছে, অথচ ঐ ভয়ানক শীতে উলঙ্গ ব্যায়াম উলঙ্গ সাঁতার অর্ধোলঙ্গ নাচ ক্রমেই চল্‌তি হচ্ছে। খাদ্যগুলো ক্রমেই কাঁচার দিকে যাচ্ছে।

বাসগৃহগুলোর জানালাগুলো বড় হতে হতে এত বড় হয়ে উঠছে যে ঘরে থেকেও বাইরে থাকা যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বরফ বিছিয়ে স্কেট্ করা হচ্ছে। দারুণ শীতেও বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে উঠে অল্পসংখ্যক পাৎলা কাপড় পরা হচ্ছে। এক কথায় দেহটাকে লোহার মতো মজবুত ক'রে গড়া হচ্ছে। গ্রীক মূর্তির মতো সব সুষম সুন্দর দেহ এখানকার আদর্শ। নর-নারী উভয়েই এ আদর্শ গ্রহণ করছে। খ্রীষ্টিয়ানিটি দেহকে তাচ্ছিল্য ক'রে ইন্দ্রিয়কে রিপু ব'লে উপবাসকে শ্রেয় ব'লে আত্মনিগ্রহকে ধর্ম ব'লে চালিয়েছিল, কিন্তু এ ধর্ম ইউরোপের প্রকৃতিগত নয়। সেইজন্যে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিক্রিয়া চলেছে। সেক্সকে খ্রীষ্টিয়ানিটি এত ঘৃণা করেছিল ব'লেই সেক্সকে হঠাৎ এত শ্রদ্ধা করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার সময় কোন জিনিসের যে কত দাম তা স্থির করা শক্ত হয়। মানুষের মধ্যে যে ভাগটা পশু সে-ভাগটাকে অযথা নিন্দা ক'রে অযথা নির্যাতন করা হয়েছে; পরিণামে আজ সেই ভাগটাই সব চেয়ে বড় ভাগ, হয়তো সেইটেই সব, এমন কথাও শুনতে হচ্ছে। গ্রীককে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপরে খ্রীষ্টানকে ঢেলে সাজলেই হয়তো সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু কোনো পক্ষের গোঁড়ারা সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়বেন না।

সরলীকরণ বলতে যারা পেগানিজম্ বুঝে দেহের বোঝা লাঘব করছে, তারাই রিলিজনের মোহ এড়াতে না পেরে গির্জায় যাচ্ছে, ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, ধর্মালোচনা করছে, ঘরে ব'সে রেডিওতে ধর্মকথা শুনছে। শ্যাম ও কুল দু-ই রাখতে কিন্তু দু'য়ের সমন্বয় করতে পারছে না। দু'হাজার বছরের অভ্যাস বড় সহজ কথা নয়, বাঘকে আফিং অভ্যাস করালে বাঘও হাই তোলে। আফিঙের বদলে কোকেন ধরিয়ে লাভ নেই—প্রাচ্য রিলিজন মাত্রেই ইউরোপের পক্ষে পরধর্ম। তার যখন ক্ষুধা প্রবল হবে সে তখন নেশার বদলে খাদ্য খুঁজে নিলেই সব দিক থেকে ভালো। সে খাদ্য তার নিজের ভাঁড়ারঘরে মালমশলা আকারে প'ড়ে রয়েছে, নিজের রান্নাঘরে নিয়ে পাক ক'রে নিলে পরে পরিপাকযোগ্য হবে। ইউরোপের রিলিজন ইউরোপের লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী-স্টুডিও-স্টেডিয়াম থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে, গির্জা-মসজিদ-মন্দির থেকে নয়।

১০

পার্লামেণ্টের সদস্য-নির্বাচন অবশ্য বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় না, কিন্তু এক নির্বাচনের পর থেকে আরেক নির্বাচন অবধি প্রত্যেকটি দিন সমস্ত দেশটাই নির্বাচনের মালা জপ্‌তে থাকে। এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে না, কেননা চোখ কাড়বার মতো দৃশ্য এটি নয়, ইংলণ্ডের মতো দেশে দু'টি চোখ নিয়ে বাস করা এক ঝক্‌মারি। সম্প্রতি এখানে বৈশাখ মাসের গরম, ষোলো-সতেরো ঘণ্টা সূর্যালোক, তাই মাস চার-পাঁচ আগে যে সময় ঘুমুতে যেতুম, সেই সময় বেড়াতে বেরিয়ে দেখি রাত্রের আহার শেষ ক'রে লোকে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে, রাস্তার মোড়ে এক-একজন বক্তা এক-একখানা টুল বা চেয়ার বা ভাঙা বাক্স বা কোনো রকম একটা উঁচু আসন যোগাড় ক'রে তার উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দেখবামাত্র আমাদের দেশের সঙ্গে দুটো তফাৎ ধর্‌তে পারি। প্রথমত, বক্তা যে দলেরই হোন যুক্তি দেখান, দেখাতে বাধ্য হন। প্রশ্নের চোটে তাঁকে নাকাল করবার মতো শ্রোতার অভাব হয় না। নানা দলের বক্তৃতা প'ড়ে শুনে প্রত্যেকেরি চোখ কান এতটা সজাগ হয়েছে যে, কারুর চোখে ধুলো দেওয়া বা কানে মন্তর দেওয়া সোজা নয়। ভাব-প্রবণতা এ জাতটার ধাতে নেই। গোল-দীঘির বক্তাদের হাইড পার্কে দাঁড় করিয়ে দিলে শ্রোতা নয় দর্শক যদি বা জোটে তবে তাদের একজনেরও চোখের পাতা ভিজবে না, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হবে না, শিরায় বিদ্যুৎ খেল্‌বে না। সুতরাং বক্তারা শ্রোতাদের অন্য রকম দুর্বলতার সুযোগ নেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ হয় বোঝে যুক্তিতথ্য, নয় বোঝে মদ। সেকালে মদ খাইয়ে ভোট আদায় করা হতো, একালে ওসব উঠে গেছে, তাই যুক্তিতথ্যকে এমন কৌশলে পরিবেষণ কর্‌তে হয় যাতে শ্রোতার বা পাঠকের নেশা ধরবে। Statisticsএর মারপ্যাঁচে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা করতে না জানলে ইংলণ্ডের ভবীকে ভোলানো যায় না। তাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা বৃথা, কান্না পাওয়ানোর চেষ্টা হাস্যকর। বক্তারা তর্জন গর্জন বা বিলাপ প্রলাপের দিক দিয়েও যান না, তাঁরা নিপুণ ক্যান্‌ভাসারের মতো বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ত, বক্তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা-সম্পন্ন নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। গালাগালি সহ্য করা তো তুচ্ছ কথা, কোনো মতেই তাঁরা মেজাজ হারাবেন না, বেফাঁস কথা ব'লে বসবেন না, তাঁদের ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, তাঁদের একমাত্র ভাবনা তাঁদের দল কেমন ক'রে পুরু হবে। অথচ তাঁরা ভাড়াটে বক্তা নন্; হয়তো পেশাদার বক্তাও নন্; কেউ দুপুরবেলা মাটি কেটে এসেছেন, কেউ গাড়োয়ানী ক'রে এসেছেন, এখন চান দলের লোকের সাহায্য করতে। রাজনৈতিক দলাদলির ঠিক নীচে ধর্মনৈতিক দলাদলি। কিন্তু সব দলেই অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবিকা আছে—তারা দলের জন্যে আর কিছু ত্যাগ করুক না করুক অন্তত অসহিষ্ণুতাটুকু ত্যাগ করেছে। তাদের দলের তালিকায় যদি একটাও নাম বাড়ে তবে বোধ করি তারা জুতোর মারও সহ্য করবে। মিশনারীরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে তারা ধর্মপ্রচার করেনি, এমন ভাষা নেই যে ভাষার বর্ণমালা না থাকলেও সে ভাষায় তারা বাইবেল ছাপায়নি। এই অসাধারণ উদ্যোগিতা এদের জাতিগত। ভোট দেবার অধিকার লাভ করবার জন্যে এদের মেয়েরা পঞ্চাশ বছর ধ'রে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে—কী অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন খেটে এসেছে। জনকয়েকের প্রচেষ্টা ক্রমশ লক্ষ লক্ষ জনের হলো, তারপরে জয়। কিন্তু ঐটুকুতে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব বিষয়ে সমান অধিকারী করবে, তার আগে থাম্‌বে না। এখন তাদের যুদ্ধ চলেছে স্ত্রী-পুরুষকে সমান খাটুনির বিনিময়ে সমান মজুরি দেওয়া নিয়ে, বিবাহিতা নারীকে বিবাহিত পুরুষের মতো চাকরি করতে দেওয়া নিয়ে, সব রকম জীবিকায় স্ত্রী-পুরুষকে সমান শর্তে স্থান দেওয়া নিয়ে। এদের শ্রমিকরাও এমনি নাছোড়বান্দা প্রকৃতির যোদ্ধা। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তারা সর্বক্ষণ সচেষ্ট। আমাদের শ্রমিকদের এখন যে অবস্থা, এদের শ্রমিকদেরও এক শতাব্দী আগে সেই অবস্থা ছিল। কিন্তু তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে সামান্য জমিজমাকে শতভাগ ক'রে মান্ধাতার আমলের চরকাখানাকে শতবার ঘুরিয়ে ফল পেলো না, কলকারখানার কাছে Slum তৈরি ক'রে ঐখানে জেদ ক'রে প'ড়ে রইল, এবং জেদের সঙ্গে লড়াই

করতে লাগল। এখনো তাদের অবস্থার যেটুকু উন্নতি হয়েছে সেটুকু তাদের মনঃপূত নয়, তাই তাদের লড়াই থামছে না, তারা সব বিষয়ে ধনিকদের মতো না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাবেই। ধনিকরাও চুপ ক'রে বসে থাকেনি, এরা চলে ডালে ডালে তো ওরা চলে পাতায় পাতায়, সুতরাং লড়াই কোনো কালে থামবার নয়।

লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে। তাই বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়। সেটা তাদের শৌখিন বাচালতা নয়, সেজন্যে তারা কারুর হাততালির আশা রাখে না, কেউ না শুনলেও তারা রণে ভঙ্গ দেয় না, যে পর্যন্ত একটিও শ্রোতা থাকে সে পর্যন্ত তাদের বক্তৃতা চলতে থাকে, বরং তখনই তাদের বক্তৃতা জোরালো হয়। আমাদের দেশে মাত্র দু'টি শ্রেণীর লোককে আমি এমন নাছোড়বান্দা হতে দেখেছি—পাণ্ডা আর ঘটক। অভিমান কাকে বলে কেবল এই দুই শ্রেণীর লোক জানে না; বাকি সকলেই অল্প-বিস্তর অভিমানী। কিন্তু ইংলণ্ডে পরের উপর মান করলে ঘরের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তাই অভিমান কথাটা ইংরেজ ভাষায় নেই। এতে ইংরেজী ভাষার ক্ষতি হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু ইংরেজ জাতটার বৃদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার সর্বত্র জাহাজ না পাঠালে ইংলণ্ডকে প্রায়োপবেশনে মরতে হয়, সুতরাং ইংলণ্ডকে দুনিয়ার সকলের দ্বারে ধাক্কা দিতেই হয়—"knock and it shall be opened unto you." এমনি ক'রে ইংলণ্ড আমেরিকার অস্ট্রেলিয়ার আফ্রিকার বন্ধ দুয়ার খুলল, ভারতবর্ষকেও ঘুমাতে দিল না।

যে কারণে ইংলণ্ডকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফিরতে হয় সেই কারণে ইংলণ্ডের লোককে ঘরের ভাণ্ডারে ভাগ বসাবার চেষ্টা করতে হয়। পার্লামেন্টের হাতে ভাণ্ডারের চাবি। চাবিটার জন্যে দিনরাত লড়াই। এক মুহূর্ত ঢিলে দিলে সর্বনাশ। চাবিটা যাদের হাতে আছে তাদের যেমন ভাবনা, চাবিটা যাদের হাতে নেই তাদেরো তেমনি ভাবনা। আমাদের দেশে রাজনীতিকে লোকে জীবন-মরণের ব্যাপার ব'লে ভাবতে শেখেনি; আমাদের কাজের লোকদের শেষ জীবন কাটে কাশীতে বৃন্দাবনে, রাজনীতি-চর্চাটা এখনো আমাদের চোখে দেশের প্রতি একটা অনুগ্রহ; সে অনুগ্রহটুকু যাঁরা করেন তাঁরা একলক্ষে

দেশপূজ্য। এদেশে কিন্তু ওটা ধর্মচর্চার মতো অবশ্যকরণীয় ব্যাপার; যাঁরা করেন তাঁরা নিজের বা নিজের দলের বা নিজের দেশের গরজে করেন; সেজন্যে বাহবা পাবার কথাই ওঠে না, দেশপূজ্য হওয়া দূরে থাক্ দেশের কাজে লাঞ্ছনা পাওয়াটাই ঘটে; লয়েড জর্জ কাশী-বৃন্দাবনে না গিয়ে পার্লামেণ্টে যান—সেজন্য তাঁকে ছেড়ে কথা কইতে হবে কেন? তাঁর পুণ্যার্জনের লোভ আছে; তাই তিনি ভারতবর্ষ হ'লে কাশী যেতেন, ইংলণ্ড ব'লে পার্লামেণ্টে গেলেন; লোকে যেমন কাশীবাসীকে ছেড়ে কথা কয় না, পার্লামেণ্টবাসীকেও ছেড়ে কথা কয় না। বলডুইন দেশের জন্যে ত্যাগ বড় কম করেননি, ইংলণ্ডের আদর্শে সে ত্যাগ চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের চেয়ে ছোট নয়। তবু তাঁকে তাচ্ছিল্য করতে রাস্তার টম্ ডিক্ও পশ্চাৎপদ নয়। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তাকে রক্ষা করলেন —অথচ তাঁকে ঠাট্টা করা ও ক্ষ্যাপানো এখানকার একটা ফ্যাশান।

ইংলণ্ড দিনকের দিন যতই গণতান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার মহাপুরুষভীতি বাড়্ছে। মাঝারি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ ক্রমশই ইংলণ্ডের মাটিতে অসম্ভব হয়ে আস্ছে। একজন ক্রমওয়েল্কে বা একজন মুসোলিনিকে ইংলণ্ড দু'চক্ষে দেখতে পারবে না। এমন কি একজন পীল্কে বা গ্ল্যাডস্টোনকেও না। ইংলণ্ডের মতো অতি স্বাধীন দেশে কোন মানুষই যথেষ্ট স্বাধীন নয়। হাজারো আইনকানুন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দশজনের একটা mass suggestion'ও আছে, সমাজের দশজন চায় না যে তাদের মধ্যে কোনো একজন সর্বেসর্বা হোক কিংবা বাকি ন'জনের চেয়ে মাথায় উঁচু হোক। গণতন্ত্রের আন্তরিক ইচ্ছা, কেউ বামন হবে না, কেউ দৈত্য হবে না, সবাই প্রমাণ সাইজ হবে। তাই ইংলণ্ডের মহাপুরুষেরা কেবল রাজনীতিতে নয়, কোনো বিষয়েই আকাশস্পর্শী হচ্ছেন না। সাহিত্য ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর ব্রাউনিং টেনিসন কার্লাইল ডিকেন্সের দোসর দেখা যাচ্ছে না, বিজ্ঞানেও কোন একজন লোক ডারুইনের মতো অতি সাধারণ নন। অথচ মাঝারি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিজ্ঞেরা গত শতাব্দীর চেয়ে এ শতাব্দীতে সংখ্যায় অধিক ও উৎকর্ষে বড়। তাঁরা লোকের নিন্দা প্রশংসা পাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা বা বিশেষ অশ্রদ্ধা পাবার মতো

মহান্ তাঁরা নন। তাঁদের নিয়ে এক-একটা school দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য schoolএর সঙ্গে মাথা-ফাটাফাটি বাধছে এমন নয়। গণতন্ত্রের দেশের জনসাধারণ কোনো একজনকে অসাধারণ হ'তে দেয় না। আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার চেয়েও ইংলণ্ডের গণতন্ত্র খাঁটি। সেইজন্যে ইংলণ্ডে একটি ফোর্ড বা আনাতোল ফ্রাঁস্ বা লেনিন সম্ভব হয় না।

তবে এটা কেবল ইংলণ্ডের নয়, এ যুগের সব দেশেরি অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে মহাপুরুষের খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সব সুখ, কেবল ঐ একটি দুঃখ। গণতন্ত্র সকলকে সমান করতে চায়, কাউকে অসমান করতে চায় না। আগে ছিল ভোটের সাম্য, এখন আস্ছে মজুরির সাম্য, তারপর আস্‌বে মাথার সাম্য। ইস্কুল মাস্টারের সাহায্যে সকলের মাথাকে সমান শক্তিবিশিষ্ট না করলে বুদ্ধির জোরে গোটাকয়েক লোক বাকি সকলের চেয়ে সুবিধা ক'রে নিতে পারে। এখন থেকেই কোনো কোনো লোক সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে এই ব'লে আপত্তি করছে যে, সকলকে যদি সব বিষয়ে সমান সুযোগ দেওয়া হয় তবে তাদের মধ্যে যারা ইহুদী বংশীয় তারাই বুদ্ধির জোরে বড় বড় পদগুলো দখল করবে ও বাকি সকলের উপরে সর্দারি করবে। সব সইতে রাজী আছি, কিন্তু ইহুদীর কর্তৃত্ব! কিন্তু ইহুদীকে কোনো বিষয়ে কোনো সুযোগ না দিলেও কি তাকে দাবিয়ে রাখা যায়? ইহুদী যে সোলার মত, তাকে সমুদ্রের তলে পাথর চাপা দিলেও সে ভাসবেই। ইউরোপ আমেরিকার এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে ইহুদীকে হাজার দাবিয়ে রাখলেও সে উপরে ওঠেনি? ভাবী কালের গণতন্ত্রে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র মুড়ি মিছরি—সকলেরি একদর হবে, কিন্তু কতকগুলো লোক যদি বেশী বুদ্ধিমান হয় তারা তো বেশী সুবিধা ক'রে নেবেই—তারা ইহুদী বা আর যা-ই হোক না কেন। শেষকালে তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বংশধরদের মাথা সমান করতে হবে। রাশিয়ার মানুষের মাথাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা ক'রে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কিন্তু উৎকর্ষে তারতম্য থেকে গেলে তম-প্রত্যয়ান্ত মাথাগুলো তর-প্রত্যয়ান্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইবে না কি?

এমন কথাও আজকাল শুনতে হয় যে আর্টকে সকলের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, দর্শনকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে, সব শাস্ত্রের অ-আ-ক-খ সকলের জানা চাই, সকলেই একখানা ক'রে মোটর গাড়ি পাবে, সকলের মাথায় bowler hat না থাকলে সর্বমানবের ঐক্যবোধ হবে না, সকলের গায়ে কটিবস্ত্র না থাকলে ভারতবর্ষের মধ্যে ধনী দরিদ্র ভেদ থেকে যাবে। গণতন্ত্রের যুগের যতগুলি প্রোফেট সকলেই সাম্যবাদী এবং সাম্য বললে এ যুগে বোঝায় বহিঃসাম্য। গান্ধী লেনিন ফোর্ড বার্নার্ড শ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউটোপিয়ায় সব মানুষকে সমান বানাতে চান। কিন্তু সব মানুষ কি আত্মায় সমান নয়—কোনো দিন সমান ছিল না? সব মানুষ কি দেহে মনে সমান হ'তে পারে—কোনো দিন সমান হবে? অতীতে আমরা অধিকারী ভেদের উপরে বড় বেশী জোর দিয়েছিলুম, বর্তমানে আমরা অধিকারী সাম্যের উপরে বড় বেশী জোর দিচ্ছি। সেইজন্যে আমাদের মধ্যে যাঁরা আর্টিস্ট তাঁরা ভাবছেন, যে আর্ট জনকয়েক সমঝদারের মধ্যে নিবদ্ধ সে আর্ট একটা মহার্ঘ বিলাসিতা। আর্টকে জনসাধারণের যোগ্য করতে গিয়ে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা এমন মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করতেই ব্যস্ত যে মোটর গাড়ি সব চেয়ে সস্তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো হবে, তা নইলে বেশী লোকে মোটর কেনবার সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। যারা শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ তাঁদের ইচ্ছা শিক্ষাকে এমন সুকর করা যাতে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্বল্পতম সময়ে বহু বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে। ইংলণ্ডে দেখছি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক শ্রেণীর বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। "Children, do you know?" এ হলো প্রশ্ন। এর উত্তর বইয়ের পাতায়। কে সর্বপ্রথম কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের চূড়ায় হাতী দেখেছিল, কোথায় গাছের ডালের বিছানা পেতে মানুষেরা শোয়, কোন্ তারাটার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে ঠিক বারো বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন তেইশ ঘণ্টা লাগে—এমনি সব উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর না জেনে রাখলে ভদ্র সমাজে বেচারা শিশু পণ্ডিত ব'লে মুখ দেখাতে পারবে না, প্রতি প্রশ্নে অপদস্থ হবে।

সব জিনিস যে সকলকে জানতেই হবে পেতেই হবে করতেই হবে এইটে

আমাদের যুগের কুসংস্কার। এরি উৎপাতে আমরা গভীরতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রসারের দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছি বেশী। একটা তাজমহল সৃষ্টি না ক'রে এক লাখ বাসগৃহ তৈরি করছি। একটি যীশুর জন্যে প্রস্তুত না হয়ে সহস্র সহস্র পাত্রী প্রস্তুত করছি। Mass production-এর পেছনেও এই মনোভাব। দু'-একজন কোটিপতির ভোগের জন্যে নির্মিত একটি ময়ূর সিংহাসন এ যুগে অসম্ভব, এ যুগের শিল্পীদের চোখ Public-এর ভোগযোগ্য একরাশ এক প্যাটার্নে তৈরি লোহার বেঞ্চির উপরে, যে বেঞ্চিতে ব'সে একজন কয়লা-ফেরিওয়ালা এক পেনী দামের Daily Mail পড়তে পড়তে বিশ্রাম করবে। রাশিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো এখন নাকি গুদামঘরে পরিণত হয়েছে, Versailles এর রাজনগর এখন একটা চিত্র-প্রদর্শনী। আভিজাত্যের ভাবটা পর্যন্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যারা লোপ পেতে দিচ্ছে তারা আর কেউ নয়, অভিজাতেরা স্বয়ং। রুমেনিয়ার রাণী এক পেনী দামের খবরের কাগজের জন্যে নিজের ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনী লিখে প্রচুর টাকা পান, তবে তাঁর ঠাট বজায় রয়। লর্ডেরাও কেউ মদ বিক্রী ক'রে লক্ষপতি হবার পরে লর্ড পদবী পেয়েছেন। কেউ জাহাজের খালাসীগিরি করবার পরে ওকালতিতে উন্নতি করে লর্ড পদবী পেয়েছেন। ইংলণ্ডে তবু নামমাত্র একটা লর্ড শ্রেণী আছে, ফ্রান্স জার্মানী প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়ারাই সর্বোচ্চ শ্রেণী এবং রাশিয়াতে সে শ্রেণীও নেই।

একদিন মানুষ প্রাণপণে যা চায় আরেকদিন যখন হাতের মুঠোয় তা পায় তখন ভাববার সময় আসে যা পেলুম সত্যিই কি তা এতই ভালো যে এর জন্যে যা হাতে ছিল তাকে ছাড়লুম! ইউরোপের কেউ কেউ এখন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, গণতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্রের চেয়ে সত্যিই ভালো? লাখ লাখ মাঝারি মানুষ কি এক আধজন মহাপুরুষের চেয়ে সত্যিই কাম্য? The greatest good of the greatest number কি প্রতি মানুষকে একটি ক'রে ভোট ও একশো টাকা ক'রে মাইনে দিলে হয়? খাওয়া পরার কষ্ট ও পরাধীনতার কষ্ট অতি অসহ্য কষ্ট—কিন্তু এ কষ্ট দূর করলেও কি সব চেয়ে বড় কষ্টটা থাকবে না? সব চেয়ে বড় কষ্ট কোয়ালিটির অভাব। দু'একটি মানুষ যদি বাকি সকলের

চেয়ে অত্যন্ত বেশী বড় হয় তবে সেই অত্যন্ত বেশী বড় হওয়াটা কি বাকি সকলের পক্ষে greatest good নয়? ক্যাপিটালিজমের পেছনেও একপ্রকার আভিজাত্য ছিল। এক-একজন ক্যাপিটালিস্ট যখন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ফাঁদেন, প্রকাণ্ড একটা combineএর কর্তা হন, তখন তাঁর সেই শ্রেষ্ঠতা কি মানব-জাতির শ্রেষ্ঠতা নয়? কিন্তু ইংলণ্ডের মতো দেশে ক্যাপিটালিজমের দৌড় সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে, আমেরিকাতেও হয়ে আসবে। ক্যাপিটালিজম্ থাম্‌বেই কিন্তু যে-বুদ্ধিবলের আভিজাত্য ক্যাপিটালিজমের পেছনে সেই আভিজাত্যও যদি সেই সঙ্গে থাকে তবে তাতে মানুষের লাভ বেশী, না ক্ষতি বেশী?

আমেরিকার স্বাধীনতা, ফ্রান্সের বিপ্লব ও ইংলণ্ডের যান্ত্রিকতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যে সাম্যবাদ জড়িত ছিল সে সাম্যবাদ সমস্ত পৃথিবীকে সমতল না করে ছাড়বে না। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যে সে ইউরোপ আমেরিকাকে একাকার ক'রে তুলেচে। এখন এক স্থানে ব'সেই দেশভ্রমণের ফল পাওয়া যায়। ইতর ভদ্র শূদ্র ব্রাহ্মণ শ্রমিক ধনিক প্রজা রাজা নারী নর তরুণ প্রবীণ সকলকেই এক নেশায় পেয়েছে—পরস্পরের সমান হ'তে হবে। এ যুগের একমাত্র বিরোধী স্বর কেবল নীট্‌শে। কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁর পরুষ কণ্ঠকে যথেষ্ট ললিত করতে লেগেছেন, তা নইলে ডেমক্রেসীর কর্ণপটহে ব্যথা লাগবে। আসল কথা বৈষম্য-বাদের সবে শুরু হচ্ছে। অসম পুরুষকে ঠিকমতো কল্পনা কর্‌তে পারা যাচ্ছে না। কল্পনা ক'রেও কোনো ফল নেই। তিনি যখন আস্‌বেন তখন আপনি আস্‌বেন, তাঁকে বানাবার ভার যে বামনরা নিতে চায় তাদের সব কল্পনার চেয়ে তিনি বড়। তিনি এলে তাঁর সমাজের যে কেমন চেহারা হবে তার নক্শা তৈরি করা এইচ. জী. ওয়েল্‌সেরও অসাধ্য।

১১

সম্প্রতি এখানে air raid হয়ে গেল। একদল লোক এরোপ্লেনে লণ্ডন আক্রমণ কর্‌লে, আরেক দল লোক লণ্ডন রক্ষা কর্‌লে। যুদ্ধটা এমন নিঃশব্দে হলো যে খবরের কাগজ ছাড়া কোথাও রেশ রেখে গেল না। নিন্দুকেরা বল্‌ছে আসল

যুদ্ধ এত সহজ ব্যাপার নয় এবং যারা সত্যিই লণ্ডন আক্রমণ করবে তারা এই যাত্রার দলের যোদ্ধাদের রিহার্সেলের সুযোগ দেবে না।

ইংলণ্ডের মতো দেশে যুদ্ধ একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। যারা পেশাদার সৈনিক তারা ভাবী যুদ্ধের জন্যে প্রতিদিন প্রস্তত রয়েছে, যারা অব্যবসায়ী তারাও "দরকার পড়লে সৈনিক হব" মনোভাব নিয়ে খাটছে ও খেলছে। এ ক্ষেত্রে বড়লোক ছোটলোক নেই, সব শ্রেণীর সব অবস্থার লোকের পক্ষে এটা সন্ধ্যাহ্নিকের মতো আচরণীয়। পাঁচ বছরের ছেলের দলও মার্চ ক'রে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রায় চলে, বড়দের তো কথাই নেই। মেয়েরা তাদের নকল ক'রে উৎসাহ দেয়, এবং নিজেরা দল ক'রে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলোর জন্যে তৈরি হয়। আহতদের শুশ্রূষার ভার তো মেয়েদেরি উপরে। আকাশ-যোদ্ধাদের মধ্যে মেয়েও আছে।

সামরিক সংস্কার এদের আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জাগত। পরিবারে দু'টি-একটি ছেলে যুদ্ধকে তাদের জীবিকা করবেই, একথা প্রত্যেক পিতা মাতা একরকম ধ'রেই রাখেন, এবং পরিবারের দু'টি-একটি মেয়ে সৈনিককে বিবাহ ক'রে বিধবা হ'লেও হ'তে পারে, এও পিতা মাতার দূরদৃষ্টির বাইরে নয়। একান্নবর্তী পরিবার এদেশে নেই, ছেলে বড় হ'লে ঘর ছেড়ে যায়, তার উপরে বাপ-মায়ের দাবী নগণ্য। সুতরাং ছেলে যদি যুদ্ধে প্রাণ হারায় তবে বাপ-মায়ের শোক যত বড়ই হোক্ অসুবিধা অপ্রত্যাশিত হয় না। একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা না থাকায় এদেশের যুবকদের পক্ষে দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের তুলনায় সহজ। বিধবাবিবাহ এদেশে নিষিদ্ধ নয়, সুতরাং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্ত্রীরও শোক যত বড়ই হোক, আশার ক্ষীণ রশ্মি থাকে। সেই জন্য হয় প্রাণ দিতে, নয় যশস্বী হ'তে, এদের স্ত্রীরা যেমন এদের যুদ্ধে ঠেলে, আমাদের স্ত্রীরা তেমনি আমাদের, যুদ্ধে দূরের কথা, বিদেশে যেতেও ঠেলে না ; অধিকন্তু বাধা দেয়। যখন সহমরণ প্রথা ছিল তখন স্ত্রীর আনুকূল্য পাওয়া দুষ্কর ছিল না : কেননা বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল ; এবং পুনর্মিলনের আশাও ছিল নিকট।

আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে

এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে স্নেহময়ী এমন মনে করলে দেশকাল-নিরপেক্ষ নারী-প্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহান্ধ, তারা আমাদের "রেখেছে বাঙালী ক'রে, মানুষ করেনি।" কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হত-ভাগিনীদের আমরা "পথি বিবর্জিতা" ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটাকেই মনে করি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সন্ন্যাসী হয়ে যাই, তখন কুলবনিতায় বারবনিতায় ভেদ রাখিনে, এক নিঃশ্বাসে বলে যাই নারী কালভুজঙ্গিনী কামিনী, কাঞ্চনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক! ইউরোপের উপরে যে খ্রীষ্টিয়ানিটি নামক সন্ন্যাসীশাসিত ধর্মমতটি চাপানো হয়েছে সেটিও সম্ভবত বৃহৎ পরিবার-কণ্টকিত কাঁটা গাছের ফল। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানিটি তো ইউরোপের সত্যিকার ধর্ম নয়, সরকারী ধর্ম ; তাই চার্চের কর্তারাও স্টেটের কর্তাদের মতো যুদ্ধবিগ্রহে পাণ্ডার কাজ ক'রে থাকেন ; এমন কি ফরাসী যাজকরা উঁচুদরের ডিপ্লম্যাট্ ও পর্তুগীজ যাজকরা উঁচুদরের ব্যবসাদারও হয়ে থাকেন। এই যে এখন যুদ্ধ নিবারণের প্রচেষ্টা চলেছে, এত চার্চের নেতৃত্ব নেই, এবং যেটুকু যোগ আছে সেটুকু চার্চভুক্ত জনকয়েক ব্যক্তি-বিশেষের।

ইংলণ্ডে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যে কারণে বাড়ছে সে কারণটা ইংলণ্ডের বার্ধক্যের লক্ষণ কি না বলা যায় না। শান্তিবাদীদের দলে যাঁদের নাম দেখি তাঁরা সাধারণতঃ বর্ষীয়ান এবং তাঁদের ভাবনা এই যে, আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়াকে যদি একটুও প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে ভাবী যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হয়ে যাবে। এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুঁড়ে এক শতাব্দীর এত বড় লণ্ডন শহরটাকে একদিনেই শ্মশান করে দেওয়া সম্ভব। মানুষ যত সহজে ধ্বংস করতে শিখেছে তত সহজে নির্মাণ করতে শেখেনি। একটা যুদ্ধে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কত বৎসর চলে যায়। আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়া এমন মারাত্মক যে যে-সব দেশ যুদ্ধে যোগ দেবে না সে-সব দেশেও মহামারী পৌঁছতে পারবে। এবং এক দেশের বিষে সব দেশ জর্জর হ'তে পারবে। এক জাতির ক্ষতিতে সব জাতির ক্ষয়, এটা যে কত বড় সত্য তা মানুষ এতকাল বুঝত না, এখন বুঝছে।

কিন্তু বুঝলে কি হয়, বুদ্ধি তো মানুষের সব নয়, প্রবৃত্তি যে তার বুদ্ধির অবাধ্য। "জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।" গত মহাযুদ্ধে যে শিক্ষাটা হলো, সে শিক্ষা ইতিমধ্যেই বাসি হয়ে গেছে। আর কয়েক বছরেই নতুন জেনারেশন মানুষ করবে; নবীন চিরদিনই বেপরোয়া; শৈশবের যুদ্ধস্মৃতি যৌবনে মিলিয়ে যাবে; তখন চলবে নতুন যুদ্ধে নতুন কীর্তির আয়োজন। সে আয়োজনে তরুণকে প্রেরণা দেবে তরুণী: সে তার কানে কানে বল্‌বে, "None but the brave deserves the fair"; অর্জুনের রথে সারথি হবে সুভদ্রা। তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; তারপরে পতিপুত্রহীনাদের নারীপর্ব: তারপরে আবার নতুন বংশ নতুন পুরুষ নতুন সৃষ্টি।

বেঁচে থেকে মানুষ করবে কী? মানুষ যে কঠিন কিছু না করতে পারলে জড় হয়ে যায়, ভীরু হয়ে যায়। যুদ্ধ মানুষ হাজার হাজার বছর ক'রে আসছে শুধু কঠিন কিছু না ক'রে তার শান্তি নেই ব'লে। যুদ্ধহীন জগতের শান্তির মতো অশান্তি তার পক্ষে আর নেই। মানুষ আঘাত করতে ও আঘাত পেতে ভালোবাসে, কারণ মানুষ প্রেমিক। তার প্রেমে আঘাত আছে, অবহেলা নেই; অহিংসা তো অবহেলারই নামান্তর। আমি তোমাকে অহিংসা করি বললে তোমার প্রতি কিছুই করা হয় না, না ভালো না মন্দ। অহিংসা হচ্ছে একলা মানুষের নিষ্ক্রিয় মানুষের ধর্ম, সে মানুষ অসহযোগীই বটে। তেমন মানুষের সমাজে বাস ক'রে আনন্দ নেই। আমরা চাই দু'টো মারতে দুটো মার খেতে, আমরা রাগীও বটে, অনুরাগীও বটে, কিন্তু রক্ষা করো আমরা বৈরাগী নই।

আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়ায় মানুষকে কি মানুষের নিকট ক'রে তোলেনি? মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়নি? অধিকাংশ মানুষ দেশের বাইরে যাবার সুযোগ পায় না, প্রধানত আর্থিক কারণে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে গিয়ে তারা যখন বিদেশ অভিযান করে তখন বিদেশকে জানবার সুযোগ পায়, বিদেশীকেও জানে। গত মহাযুদ্ধে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজ প্রথমবার জার্মান সংস্পর্শে এসে জার্মান জাতিকে জান্‌ল, তার ফলে এখন জার্মানীর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের কত। গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স থেকে যাঁরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো

লেখায় পড়লুম, জীবনমরণের সন্ধিক্ষণেই দুই যোদ্ধা বোঝে যে তাঁরা দু'জনেই মানুষ; তাদের দু'জনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। কিসের এক অবোধ্য প্রেরণায় তাদের এক ক্ষেত্রে মিলিয়েছে; অমূল্য এ মিলন, কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে জীবন দান ক'রে। মিলন মাত্রেই বিয়োগান্ত।

ভাবী যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী মহামারীতে মানুষকে আরেকটুখানি মেলাবে। অকথ্য লোকসান দিয়ে মানুষ জানবে যে, সকলেরই স্থান এক নৌকায়। ভারতবর্ষের লোক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখে গেছে পৃথিবীটা নেহাৎ ছোট, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর এক কোণের ছোঁয়াচ আরেক কোণে পৌঁছায়। গত মহাযুদ্ধের পর সকলেই অল্পাধিক বুঝেছে যে, জেলায় জেলায় যুদ্ধ যেমন জ্ঞাতিবিরোধ, দেশে দেশে যুদ্ধও তেমনি জ্ঞাতিবিরোধ। সেদিন এক গির্জার দ্বারে লিখেছে "Duelling is illegal. War is a duel between nations. Why not make it illegal by taking your national quarrel to an international court of justice?"

এদেশের "লীগ্ অব্ নেশন্স্ ইউনিয়ন" যুদ্ধনিবারণের জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। নানাদেশের নানাজাতির মানুষের যাতে দেখাশুনা আলাপ-পরিচয় হয় সে চেষ্টারও বিরাম নেই। ভাবী যুদ্ধ যদি নিকট ভবিষ্যতে ঘটে তবে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আত্মরক্ষার গুরুতর কারণ না দেখলে যুদ্ধে নামতে চাইবে কি না সন্দেহ। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটে তবে বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিই প্রবল হবে বোধ হয়। পৃথিবীকে একরাষ্ট্রে পরিণত না করা অবধি যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। শুধু এক-রাষ্ট্র নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শুধু গণতান্ত্রিক নয়, ধনসাম্যমূলক। রেল স্টীমার যেমন কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ দিল্লীকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর ক'রে ভারতবর্ষকে ঐকরাষ্ট্র করেছে, এরোপ্লেন তেমনি নিউইয়র্ক লণ্ডন কায়রো সিঙ্গাপুর টোকিওকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর না করা অবধি পৃথিবীব্যাপী একরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবার আশা নেই। তবে ইউরোপ যে তাড়াতাড়ি একরাষ্ট্র হয়ে উঠছে এর সন্দেহ নেই। "United State of Europe" আর বেশী দিন নয়, পঞ্চাশ বছর।

যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যুদ্ধেরই মতো কঠিন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে। নতুবা মৃত্যু-সংখ্যা কমাবার জন্যেই যদি যুদ্ধ তুলে দিতে হয়, তবে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে; সমগ্র পৃথিবীটাই একটা ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে, যেখানে যযাতির রাজত্ব হাজার কয়েক বছর থেকে চ'লে আসছে। তখন পৃথিবীময় "পিতা স্বর্গ" ও "জননী স্বর্গাদপি"র জ্বালায় মাথাটা ভক্তিতে এমন নুয়ে আসবে যে মেরুদণ্ড যাবে বেঁকে, এবং পিঠের উপর চেপে বসবেন পতিব্রতার দল। ইউরোপেও যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে পৃথিবীর কোথাও বাস ক'রে শান্তি থাকবে না, সর্বত্রই এত শান্তি! যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যৌবনের পক্ষে সে বড় দুর্দিন। ভাবুকরা বলছেন প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যাবে, ভয় নেই। এই যেমন Olympic games। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এমন কিছু চাই যা আরো বিপজ্জনক, আরো প্রাণান্তক। সমাজকে অতীতকালের মতো ভাবীকালেও প্রচুর প্রাণক্ষয় ক'রে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হবে, সমাজের বাজেটে লোকসানের ঘরের অঙ্ক চিরকাল সমান বিপুল হওয়া চাই। ইতিহাসে দেখা গেছে যে, কোটি প্রাণীর তপস্যায় কয়েকটি প্রাণী সিদ্ধিলাভ করেছে, অভিব্যক্তির ইতিহাসে যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন। যে মানুষ সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে যোগ্যতম, সে মানুষকে সহজ পথ দেখিয়ে মানবজাতি লাভবান হবে না।

যুদ্ধকে অনাবশ্যক ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তো ভালোই, কিন্তু ক্ষতিকর ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে ক্ষতি স্বীকার করবার মতো ক্ষমতা মানবজাতির নেই। সে ক্ষমতা বর্বরের ছিল, কেননা বর্বরের প্রাণশক্তি ছিল প্রভূত। সভ্যতা যদি মানবের প্রাণশক্তি হরণ ক'রে থাকে তবে সভ্যতার পক্ষে সেটা ভয়ের কথা। বর্বরতার শক্ত বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সভ্যতার পাকা দালানে ফাটল দেখা দেয়। মানবের মধ্যে যে পশু আছে তাকে দুর্বল করলে মানব দুর্বলই হয়। বহুকাল মানবকে মনে করা হয়েছে পশু থেকে স্বতন্ত্র একটা সৃষ্টি, একেবারে ভুঁইফোড়। সভ্য মানবকে মনে করা হয়েছে বর্বর থেকে স্বতন্ত্র একটা জাতি, পূর্বপুরুষহীন। কৌলীন্যের পেছনে যেন সাঙ্কর্য নেই, আভিজাত্যের পেছনে যেন জারজতা নেই, পদ্মের পেছনে যেন পাঁক নেই। আসলে

কিন্তু পাঁকই হচ্ছে সার, সে না থাকলে জলের পদ্ম হতো কাগজের পদ্ম। বহুকাল থেকে আমরা বর্বরতার তেজ হারিয়ে সভ্যতার আলো নিয়ে খেলা ক'রে এসেছি, তৈমুরের ভোঁতা তরোয়ালে শান দিয়ে তাকে দাড়ি চাঁচবার ক্ষুর বানিয়েছি, জীবনের মোটা কথাগুলোর সূত্র হারিয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বের জট পাকিয়েছি।

সেই জন্যে দেখি আমাদের যুগে আদিম যুগের সঙ্গে অন্বয়রক্ষার চেষ্টা; কেউ বল্‌ছে "back to the village"; কেউ বল্‌ছে "back to the forest"; কেউ বল্‌ছে বর্বরের মতো দিগম্বর হও; কেউবল্‌ছে পশুর মতো আকাশের তলে ঘাসের উপরে খাও-শোও। এ সবের তাৎপর্য এই যে, আমরা আদিম প্রাণীর জোর হারিয়েছি, আপনার গাঁথা জালে জড়িয়েছি। অতিবুদ্ধির নাকে দড়ি; সেই হয়েছে সভ্য মানবের দশা। যুদ্ধ দোষের নয়, দোষের হচ্ছে কূটনীতি, গুপ্তচরবৃত্তি, বিষবায়ু-প্রয়োগ, ব্যাধিবীজবিক্ষেপ ইত্যাদি কৌরবসুলভ কুকার্য। মানুষ ধর্মযুদ্ধ ভালোবাসে, সে যুদ্ধে তার গুণাগুণের পরিচয় দিয়ে সে তৃপ্তি পায় মরণেও। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে বারো আনাই যে মিথ্যাপ্রচার, কাগজে কাগজে যুদ্ধ। অসির চেয়ে মসীর উপদ্রব বেশী। আধুনিক যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণে মরে তার বেশী মানুষ আত্মায় মরে,—এইখানেই অধর্ম, যুদ্ধে অধর্ম নেই।

যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার পরীক্ষা। যুদ্ধের চেয়ে সহজ উপলক্ষ্য চাইনে, যুদ্ধের পরিবর্তে অন্যবিধ উপলক্ষ্যে আপত্তি নেই কিন্তু সে উপলক্ষ্যে যেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত রাখে, সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে প্রত্যেককে ভ'রে দেয়। যুদ্ধনিবারণী প্রচেষ্টার যাঁরা নায়ক তাঁরা যুদ্ধের বদলে করবার কী আছে তা বলেননি, শুধু বল্‌ছেন, "যুদ্ধ করো না"; হাঁ-মন্ত্র না দিয়ে দিচ্ছেন না-মন্ত্র; "Thou shalt" না ব'লে বল্‌ছেন, "Thou shalt not"! যুবকের প্রাণ ভাবের বদলে অভাবে ভ'রে ওঠে না, যুবক চায় positive commandment। যুদ্ধের বদলে সালিশি করা তরুণের কাজ নয় এবং যুদ্ধের বদলে পুলিসি ক'রেও তরুণের তৃপ্তি নেই। তাই শান্তিবাদীদের আবেদন তরুণের বুক দোলায় না। এখন যদি কেউ এসে বলতেন, "তোমরা প্রেমের অভিযানে জগতের হৃদয় জিনে নাও" তবে সেও

হতো একরকম যুদ্ধ, তাতে দুঃখ কিছুমাত্র কম হতো না, মরণাধিক বেদনা থাকতো। সে যুদ্ধে স্বার্থপরতার গ্লানি ও মিথ্যাভাষণের পাপ চাপা পড়ত এবং ভীরুতার স্থান থাকতো না। সে যুদ্ধে বর্বরকে ঘৃণা ক'রে তার দান হ'তে সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হতো না: পশুকে অবহেলা ক'রে তার সংস্পর্শ হ'তে মানুষকে দূরে রাখা হতো না। যে ডাক শুচিবাতিকগ্রস্তের নয়, নীতিবাতিকগ্রস্তের নয়, অহিংসাবাতিকগ্রস্তের নয়, প্রেমিকের,—সেই ডাকের প্রতীক্ষায় আমাদের যুগ পদচারণ করছে।

১২

বসন্ত যখন আসে তখন এমনি ক'রেই আসে। তখন ফুল যত ফোটে কুঁড়ি ঝ'রে যায় তার বেশী, যত ফুল সফল হয় তার বেশী ফুল হয় নিষ্ফল। "বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের খেলা রে? দেখিস্ নে কি ঝরা ফুলের মরা ফুলের মেলা রে?" লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী: তবু অপরিসীম লাভ, সেই অপরিসীমতাকে বলি বসন্ত। জীবনের চেয়ে জরা ব্যাধি মৃত্যুই বেশী; তবুও অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।

জার্মানীতে এসে দেখতে পাচ্ছি জাতির জীবনে বসন্ত এসেছে। জার্মানীদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে কিছুদিন আগে এরা যুদ্ধে হেরে সর্বস্বান্ত হয়েছে এবং এখনো এরা অংশত পরাধীন, অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত। মুখে হাসি নেই এমন মানুষ আছে কিনা খোঁজ নিতে হয় এবং সকলেরই স্বাস্থ্য অনবদ্য। অথচ যুদ্ধে এরা প্রত্যেকেই ধন জন হারিয়েছে এবং মার্কমুদ্রার পতনকালে এদের অধিকাংশের সর্বস্ব গেছে। কিন্তু সর্বস্ব গেলেও যদি যৌবন থাকে তবে সর্বস্ব ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। জার্মানীর লোক ধন দিয়েছে, কিন্তু যৌবন দেয়নি। তাই এমন অবিশ্রান্ত যৌবনচর্চা চলেছে ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে। যারা গেছে তাদের স্থান পূরণ করছে যারা এসেছে তারা, শিল্প বিজ্ঞানে ক্রীড়ায় কৌতুকে নবীন জার্মানীর পরাক্রম দেখে মনে হয় না যে প্রবীণ জার্মানী বেঁচে থাকলে এর বেশী পরাক্রমী হ'তে পারত।

বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ঝরাতে হয় লাখে লাখে, সমাজকে তেমনি মানুষ খোয়াতে হয় লাখে লাখে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের শর্ত এই যে, প্রকৃতি আমাদের যা দেবে তা আমরা পালা ক'রে ভোগ করবো। আমাদের এক দলকে মরতে হবে আরেক দলকে বাঁচতে দেবার জন্যে। মৃত্যুর মধ্যে যে তত্ত্ব আছে সে আর কিছুই নয়, সে এই—যারা জন্মায়নি তাদেরকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে যারা জন্মিয়েছে তারা মরবে। সমাজকে তাই হয় দুর্ভিক্ষের জন্যে নয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়—দুর্ভিক্ষের মরা তিলে তিলে, যুদ্ধের মরা এক নিমেষে।* দুর্ভিক্ষে যারা মরে তারা আগে থাকতে দুর্বল, তারা সাধারণতঃ বৃদ্ধ কিংবা শিশু কিংবা স্ত্রীলোক। আর যুদ্ধে যারা মরে তারা যুবা, সবচেয়ে বলবান, সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। যে সমাজের যৌবন অফুরন্ত সে সমাজ যুবাকেই মরতে পাঠায় যুবাকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে, সে সমাজ কোনোদিন যুবার অভাব বোধ করে না। আর যে সমাজের যৌবন অল্প তার ব্যবস্থা অন্যরকম, সে সমাজের যৌবন শুকিয়ে শুকিয়ে লোলচর্ম হ'লে পরে যখন তার মৃত্যু আসে তখন এক স্থবিরের স্থান পূরণ করতে থুড়থুড় ক'রে অগ্রসর হয় আরেক স্থবির। ঠাকুরদা মশায়ের পরে জ্যাঠামশায়, তার পরে বাবা মশায়, তারপরে কাকা মশায়, তারপরে দাদা, তারপরে আমি। চুল না পাকলে রাজত্ব করবার অধিকার কারুর নেই। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই বার্ধক্য চর্চা করতে হয়।

কিন্তু ইউরোপে দেখছি বিপরীত ব্যাপার। যৌবন রক্ষা করবার জন্যে মহাস্থবিরেরা monkey glandএর শরণ নিচ্ছেন, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা বালক-বালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি পায়ে খোলা জায়গায় সাঁতার কাটছেন, নৌকা চালাচ্ছেন, কঠিন কাঠের তক্তার উপরে প'ড়ে প'ড়ে মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে সিদ্ধ হচ্ছেন। এটাও একটা ফ্যাশান, কিন্তু ফ্যাশান তো weather cockএর মতো দেখিয়ে দেয় বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে। যুদ্ধের আগে জার্মানীতে প্রত্যেক

* যে সমাজ দুর্ভিক্ষও চায় না, যুদ্ধও চায় না সে সমাজের তৃতীয় পন্থা জন্মশাসনে। কিন্তু যে সমাজ না চায় দুর্ভিক্ষ না চায় যুদ্ধ না চায় জন্মশাসন, সে সমাজের আবদার প্রকৃতির অসহ্য।

পুরুষকেই রণশিক্ষা কর্‌তে হতো। এখন তার উপায় নেই, কিন্তু সংস্কার যায় কোথায়? জার্মানদের বহুকালাগত আদর্শ—মানুষকে হ'তে হবে "blood and iron." পুরুষদের সঙ্গে এখন মেয়েরাও যোগ দিয়েছে, জাতীয় দুর্দশা স্মরণ ক'রে কেউ তাদের বাধা দিতেও পার্‌ছে না। চার্চ একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল। ওরা বললে, অমন করলে চার্চ মানব না। তখন চার্চ হাল ছেড়ে দিলে। জার্মানদের মতো গোঁড়া খ্রীষ্টান জাতি নিতান্ত দায়ে না ঠেক্‌লে এ অনাচার সহ্য করতো না।

যারা যুদ্ধে প্রাণ দেয় তারা দেশের সব চেয়ে প্রাণবান পুরুষ। যারা বেঁচে থাকে তারা বালবৃদ্ধবনিতা। তবু তাদের ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টির উদ্গম যখন হয় তখন অবাক হয়ে দেখি এ সৃষ্টিও আগেরি মতো পরাক্রান্ত। তখন মনে হয় একে পরাক্রান্ত হবার সুযোগ দেবার জন্যেই আগের সৃষ্টিকে ধ্বংস হ'তে হলো। জীবনকে আমরা ব'লে থাকি লীলা, এরা ব'লে থাকে সংগ্রাম। একই কথা। কেননা লীলা যেমন নবনবোন্মেষ, সংগ্রামও তেমনি নূতন সৃষ্টির জন্যে পুরাতনের ধ্বংস। বহু শতাব্দী ধ'রে দেখা যাচ্ছে প্রতি জেনারেশনে ফ্রান্স একবার করে নিঃক্ষত্রিয় হয়, তার বলবান পুরুষেরা প্রাণ দেয়, তার সুন্দরী নারীরা nun হয়ে যায়। তবু ভস্মের ভিতর থেকে আগুন জ্বলে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্তি পুরাতন ফ্রান্সের গৌরব ম্লান ক'রে দেয়। "হইলে হইতে পারিত" কথাটা অক্ষম দেশের পক্ষে প্রযোজ্য; ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফ্রান্স যা হয়েছে তাই এত আশ্চর্য যে, এই হওয়াটার খাতিরে তার "হইলে হইতে পারা"টা চির-কালের মতো না-হওয়া থেকে গেল। যা হ'তে পারতুম তাই যদি হতুম, তবে যা হয়েছি তা হ'তে পারতুম না। বাস্তবটা এমন শোচনীয় নয় যে সম্ভাব্যতার জন্যে হাহুতাশ কর্‌ব। স্বর্গ থাক্‌লে মর্ত্য যদি না থাকে তবে চাইনে স্বর্গ।

মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন ক'রে দিয়ে জার্মানী নতুন দিনের আলোয় নতুন ক'রে বাঁচ্‌ছে। তার ধনবল নেই, সৈন্যবল নেই, কিন্তু তার লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকা যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যেরূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সহিষ্ণুতার

সঙ্গে যৌবনচর্চা কর্‌ছে তা দেখে মনে হয় ভাবীকালের জার্মান জাতিকে নিয়ে আবার বিপদ বাধ্‌বে। জার্মানী যা কর্‌ছে তার কোথাও কিছু কাঁচা রাখছে না। পৃথিবীর যেখানে যে বিষয়ে যে বই প্রকাশিত হয় জার্মানী তার অনুবাদ ক'রে পড়ে, ক্ষুদ্র শহরের ক্ষুদ্র দোকানেও আমি ভারতীয় আর্টের উপরে লেখা বৃহৎ বই এবং মহাত্মা গান্ধীর "Young India"র অনুবাদ দেখ্‌লুম! তা ব'লে ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানীর পক্ষপাত নেই, Sigrid Undset-এর নূতনতম বইয়ের অনুবাদও সে দোকানে ছিল এবং যে বই অল্পদিন আগে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে সে বই অনুবাদ কর্‌তে জার্মানীর বিলম্ব হয়নি। জার্মানীর ছোট ছোট শহরেও যে সব মিউজিয়াম আছে সেগুলিতে পৃথিবীর কোনও দেশ বাদ পড়েনি। জার্মানীর শিক্ষাপ্রণালীর গুণে দেশের ইতর সাধারণ পৃথিবীর কোন্ দেশে কতটা উন্নতি হয়েছে সে খবর রাখে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এমন সর্বজ্ঞ নয়।

কিন্তু আমাকে সব চেয়ে চমৎকৃত করেছে দু'টি বিষয়। প্রথমত, জার্মানীর যে ক'টি ছোট ও বড় গ্রাম ও শহর দেখলুম সে ক'টিতে Slum নেই, বরং মজুরদের বাড়িগুলি আমাদের মধ্যবিত্তদের বাড়ির তুলনায় অনেক উপভোগ্য। জার্মানীর গরীব লোকদের অবস্থা ইংলণ্ডের গরীব লোকদের চেয়ে অনেক ভালো। জার্মানীর জাতীয় দুর্দশার দিন তার শক্তিকে অপচয় থেকে রক্ষা করেছে তার অন্তর্বিবাদের স্বল্পতা। তাছাড়া জার্মানী প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে Slumএর কিছু সোদর সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়ত, জার্মানীর শ্লীলতাবোধ এমন্ বনেদী যে কলকারখানার সঙ্গে কদর্যতাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। ফ্যাক্টরিগুলো যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম বা শহরের চতুঃসীমায় বাগান ক'রে দেওয়া হয়েছে কিংবা বাড়ির সঙ্গে একটি বাগান কর্‌তে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা যে-সব বাড়িতে থাকে সে-সব বাড়িরও সুন্দর গড়ন সুন্দর রং; কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই আছে। হোটেল বা রেস্তোরাঁর দেওয়ালেও ওয়াল্ পেপারের বদলে একপ্রকার আল্‌পনা। স্টেট্ থেকে অপেরা হাউস্ ও থিয়েটার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক শহরে।

গান বাজ্‌নার একটি আবহাওয়া সর্বত্র বোধ করা যায়। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক বোবা-কালা, এবং সিনেমা দেখে দেখে তাদের চোখও গেছে। কিন্তু জার্মানীর সকলেই গান বাজ্‌নায় যোগ দেয়। আর জার্মানীতে ছবি আঁকার ঝোঁক নিয়ে যত লোক বেড়ায় ফোটো তোলার বাতিক নিয়ে তত লোক বেড়ায় না।

বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দু'টি জাতির আছে, আমেরিকান আর জার্মান। কিন্তু আমেরিকান যখন বেড়ায়, তখন ভেসে ভেসে বেড়ায়, দিনের দু'চার ঘণ্টায় দু'শো মাইল দেখে নিয়ে বাকি সময়টায় বার বার খায় দায় নাচে খেলে। তার জন্যে সব চেয়ে দামী রেল জাহাজ, সব চেয়ে আরামের মোটর কোচ, সব চেয়ে বড় হোটেল। ভ্রমণ কর্‌বার সময় যাতে সে বিশ্রামসুখ পায় সেই দিকেই তার দৃষ্টি। কিন্তু জার্মান যখন বেড়ায় তখন পায়ে হেঁটে বেড়ায়, ফোর্থ ক্লাস রেল গাড়িতে চড়ে, নিজের পিঠে বাঁধা "ruck sack" থেকে কিছু "wurst" বার ক'রে খায়, সস্তা সরাইতে গিয়ে পেট ভ'রে এক ঘড়া সস্তা beer পান করে, বিশ্রাম কর্‌তে কর্‌তে ছবি আঁকে, আর চল্‌তে চল্‌তে প্রাণ খুলে গান গায়। জার্মানী দেশটি আমাদের যে কোনো প্রদেশের চেয়ে বড়। তার উত্তরটা প্রোটেস্টাণ্ট প্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিক প্রধান। তার প্রত্যেক জেলার নিজস্ব ইতিহাস আছে, প্রত্যেক জেলাই ছিল স্বতন্ত্র। জার্মানীকে একটি ছোট স্কেলের ভারতবর্ষ বলতে পারা যায়, তেমনি বহুধা বিভক্ত। তাই জার্মানরা চায় নিজের দেশের অলিতে-গলিতে ঘুরে নিজের দেশকে সমগ্রভাবে জান্‌তে। তাদের বেড়ানোর নেশার পেছনে তাদের এই উদ্দেশ্যটি আছে। যুদ্ধে হেরে জার্মানী এক হয়েছে। আগে ছিল প্রাশিয়ার একাধিপত্য। তবু প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণ মরেনি এবং প্রোটেস্টাণ্টে ক্যাথলিকে বিরোধ আছে।

জার্মানরা ইংরেজদের মতো প্রধানত প্রোটেস্টাণ্ট বা ফরাসীদের মতো প্রধানত ক্যাথলিক নয়। এদের দুই সম্প্রদায়ই সমান প্রবল। রাইনল্যাণ্ড ও ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র ক্যাথলিক প্রভাব লক্ষ্য কর্‌ছি। গির্জার যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি গির্জার বাইরে ও ভিতরে মূর্তি ও চিত্রের সংখ্যা নেই। এখনো লোক সে-সব প্রতিমার কাছে দীপ জালে, ফুল রাখে, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায়,

মনস্কামনা জানায়। খ্রীষ্টিয়ানিটি বহুদূর থেকে এলেও ইউরোপের হৃদয় অধিকার করেছে।

মূর্তি ও চিত্রগুলি সচরাচর ক্রুসবিদ্ধ যীশুর কিংবা যীশুজননী মেরীর। যীশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু—এই দু'টি বিষয় নিয়ে অসংখ্য চিত্রকর চিত্র এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সঙ্গীতকার গান রচনা করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আর্ট প্রধানত এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেনেশাঁসের পরে ইউরোপ নিজেকে চিন্‌ল, বিষয়ের দারিদ্র্য রইল না, এবং ইউরোপীয় আর্ট গির্জার আঁচল ছাড়ল। খ্রীষ্টিয়ানিটি যে ইউরোপের অন্তরের অন্তস্থলে পৌছায়নি তার প্রমাণ খ্রীষ্টিয়ানিটিকে ইউরোপ আপন ইচ্ছামতো ভাঙতে গড়তে পারেনি, যেমনটি পেয়েছিল তেমনটি রাখতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর সামগ্রী উপহাররূপে পেলে লোকে সাজিয়ে রাখতেই ব্যস্ত হয়।

খ্রীষ্টিয়ানিটিকে তার বাড়ির পাশের আরব পারস্যের লোক গ্রহণ কর্‌ল না; এমন কি তার বাড়ির লোক ইহুদীরা পর্যন্ত অসম্মান করল, কিন্তু দূর থেকে ইউরোপ ডেকে নিয়ে মান দিল। কেন এমন ঘটল? সম্ভবত ইউরোপের পরিপূরক-রূপে এশিয়াকে দরকার ছিল। কিংবা ইউরোপীয় চরিত্রের পরিপূরকরূপে যীশুর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তটির প্রয়োজন ছিল। জার্মানীর যেখানে যাই সেখানে দেখি যীশুর ক্রুসবিদ্ধ করুণ মূর্তিটি বাণবিদ্ধ পাখির মতো দু'টি ডানা এলিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন বিনা কথায় বল্‌তে চায়, "আমার দুঃখ দেখে কি তোমাদের মায়া হয় না? তোমরা এখনো পাপ করছো?" ভোগ-লোলুপ ইউরোপকে ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিল। শুধু কথায় তার মন ভিজত না। দৃষ্টান্ত তাকে মুগ্ধ করলে। আমার কিন্তু এ দৃশ্য ভালো লাগে না। কসাইয়ের দোকানে গরু ভেড়ার ধড় ঝুলছে, তার ঠিক সামনে গির্জার দেয়ালে যীশুর শব-মূর্তি ঝুলছে, এ যেন যীশুকে বিদ্রূপ করা। মনে হয় যেন ইউরোপের লোক পরস্পরকে যীশুর দোহাই দিতে চায় এই জন্যে যে তাদের কারুর পক্ষে যীশুর আদর্শ অন্তরের দিক থেকে সত্য নয়, অথচ বাইরের দিক থেকে সে আদর্শের প্রয়োজন আছে।

চোখে দেখতে জার্মান ও ইংরেজ একই রকম, ফরাসীও ভিন্ন নয়। ইউরোপে সব জায়গায় একই পোশাক, একই খানা, আদব-কায়দা—সব জাতির বহিরঙ্গ একই। স্থান ও পাত্র ভেদে যেটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটুকু ধর্তব্য নয়। জার্মানদের ধারণা তারা ভয়ানক কেজো মানুষ। তাই তারা মাথা মুড়োয়, plus fours কিংবা breeches পরে সাধারণত। তাদের মেয়েদেরও মোটা কাপড়ের প্রতি টান—খদ্দর পরা মেয়ে অহরহ দেখছি। জার্মান মেয়েরা কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষের দোসর। তারা গোরু ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় ও পিঠে বোঝা বেঁধে হাঁটে। ফরাসী মেয়েদের দেখ্‌লে যেমন মনে হয় সারাক্ষণ পুষিমেনির মতো শরীরটিকে ঘষে মেজে সাজিয়ে রেখেছে, জার্মান মেয়েদের দেখ্‌লে তেমন মনে হয় না। আবার ইংরেজ পুরুষদের দেখ্‌লে যেমন মনে হয় মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো অবধি ফিট্‌ফাট্‌, জার্মান পুরুষদের দেখ্‌লে তেমন মনে হয় না। জার্মানরা কেজো মানুষ, স্মার্ট্‌ হবার মতো সৌখিনতা তাদের সাজে না। সাজ-সজ্জায় তারা ভোলানাথ—তালি দেওয়া চামড়ার হাফপ্যাণ্ট্‌ পরে পা দেখিয়ে রাস্তায় বা'র হলে লণ্ডনে ভিড় জ'মে যেত, মিউনিকে কেউ কিছু ভাবে না।

১৩

অষ্ট্রিয়ায় যাবার আগে বড় ভাবনা ছিল, কী আর দেখব! গত মহাযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ায় যে সর্বনাশ ঘ'টে গেল কোন্ দেশের তেমন ঘটেছে! কত শতাব্দীর কত বড় সাম্রাজ্য, চারটি বছরের যুদ্ধে তার চৌচির অবস্থা! কোথায় গেল হাঙ্গেরী, কোথায় গেল ট্রানসিলভানিয়া, কোথায় গেল ক্রাকাউ, কোথায় বোহেমিয়া, কোথায় গেল ক্রোয়েশিয়া, ড্যাল্‌মেশিয়া, বস্‌নিয়া। চারটি বছরে চারশত বছরের কীর্তি নিঃশব্দে ভেঙে পড়্‌ল, যেন একটা তাসের কেল্লা—একটি আঙুলের একটু ছোঁয়া সইতে পারল না। সাম্রাজ্য যদিও চার শতাব্দীর, রাজবংশ প্রায় আট শতাব্দীর। যেন আলাউদ্দিন খিল্‌জী থেকে পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত একটি রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসনে ব'সে রাজ্যবিস্তার ক'রে আসছিলেন। ভেবেছিলেন চন্দ্রসূর্য যতদিনের তাঁরাও ততদিনের। ভা—

সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটও গেলেন, নইলে এখনকার ঐটুকু অষ্ট্রিয়ায় অত বড় বনেদী রাজবংশকে মানাত না।

বড় ভাবনা ছিল, ভিয়েনায় গিয়ে কী আর দেখ্‌ব; সুন্দরী ভিয়েনার বিধবার সাজ কি আমার ভালো লাগ্‌বে! ভিয়েনাকে রাণীর বেশে সাজাবার সামর্থ্য অষ্ট্রিয়ার নেই, অষ্ট্রিয়ার না আছে বন্দর, না আছে খনি, অষ্ট্রিয়ার লোক-সংখ্যা এখন এত অল্প যে ভিয়েনার মতো বৃহৎ নগরীর নাগরিক হবার জন্যে আমেরিকানদের সাধাসাধি কর্‌তে হয়। আর কিছুদিন পরে ভিয়েনাটাকেও তারা প্যারিস ক'রে ছাড়বে—প্যারিসেরই মতো আমেরিকার উপনিবেশ।

ভিয়েনার সঙ্গে তার আশপাশের সঙ্গতি নেই। একটা কৃষিপ্রধান দেশের এক প্রান্তে এত বড় একটা শিল্পপ্রধান শহর, যার ত্রিসীমানায় বন্দর বা খনি নেই। বন্দর যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও কেড়ে নিয়েছে ইটালী। আর খনি যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও পড়্‌ল চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগে। কেবল টুরিস্ট্‌ নিয়ে তো একটা বড় শহর বাঁচতে পারে না। ভিয়েনার লোকসংখ্যা কমেছে। বাদশাহী জাঁকজমক আর নেই। কিন্তু তৎসত্বেও ভিয়েনা অতুলনীয়া সুন্দরী। তার প্রায় চারদিকে পাহাড়, কাছেই ড্যানিউব্‌ নদী, ভিতরে নদীর খাল। "Ring" নামক রাজপথটি ভিয়েনারই বিশেষত্ব। বার্লিন দেখিনি, কিন্তু লণ্ডন প্যারিসের চেয়েও ভিয়েনা দু'টি কারণে সুন্দর। প্রথমত, ভিয়েনার পথঘাট প্যারিসের চেয়ে তো নিশ্চয়ই, লণ্ডনের চেয়েও পরিষ্কার। দ্বিতীয়ত, ভিয়েনার সৌধগুলি লণ্ডনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই প্যারিসের চেয়েও সুধা-ধবল। ধোঁয়া আর ফগের ভয়েই বোধ হয় লণ্ডনের বাড়িগুলো চুন মাখ্‌তে চায় না। কিন্তু আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটিও যদি অন্ধকার হয় তো মনের উপরে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। ভিয়েনায় এ আপদ্‌ নেই, তাই সেখানে 'নয়ন দু'টি মেলিলে পরে পরাণ হয় খুশি।'

কিন্তু ভিয়েনার নির্জনতা লণ্ডন প্যারিসের মনকে ঘুম পাড়াতে চায়। মধ্যাহ্নকে মনে হয় মাঝরাত। কত বড় বড় বাড়ি, কত বড় বড় রাস্তা—কিন্তু 'ত জনবিরল যে ঘুমন্তপুরীর মতো লাগে। বৃহৎ রেস্তোরাঁ, ঢুকে দেখা গেল

লোক নেই, অথচ অমন রান্না যারা ইউরোপ ঢুঁড়লেও পাওয়া যায় না, অপিচ অত সস্তায়। প্যারিসে লোক কিলবিল করছে, আর মানুষ যত নেই মোটর আছে তত; আর সে-সব মোটর যারা হাঁকায় তারা বিদ্যুতের সঙ্গে টক্কর দেবার স্পর্ধা রাখে। প্যারিস্ থেকে ভিয়েনায় গেলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। অথচ ভিয়েনা চিরদিন এমন ছিল না। এই বিগত-যৌবনা রূপসী একদিন ইউরোপে রাণী ছিল। তখন কত ডিপ্লোম্যাট্, কত বণিক, কত গুণী ও কত পর্যটক সোনা দিয়ে তার মুখ দেখ্‌তে আস্‌তো। সঙ্গীতে ভিয়েনার সমান কেউ ছিল না। ভিয়েনার অপেরা এখনো তার পূর্ব গৌরব হারায়নি। কিন্তু মহাকাব্যের মতো অপেরারও দিন যায় যায়। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিকাগোর অপেরা লণ্ডনে ব'সে দেখ্‌বার শোন্‌বার উপায় হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু নতুন একখানা অপেরা লেখ্‌বার মতো প্রতিভা একমাত্র Strauss-এর আছে এবং সম্ভবত তাঁর সঙ্গেই লোপ পাবে। থিয়েটারে সাজসজ্জার যে উন্নতি হয়েছে তা শেক্‌স্‌পিয়ারের পক্ষে কল্পনাতীত, কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ারের পায়ের ধুলো নেবার উপযুক্ত নাট্যকার একটিও জন্মাচ্ছে না। এবং রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় জগতের শেষ মহাকবি।

ঠাট বজায় রাখ্‌তে ভিয়েনার লোক অদ্বিতীয়। অত বড় সাম্রাজ্য হারাবার পরে সোশ্যালিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা আগের মতোই কায়দা-দুরস্ত আছে। রেস্তোরাঁয় লোকই আসে না, তবু ওয়েটার বাবাজীদের দরবারী পোশাকটি অপরিহার্য। পাহারাওয়ালা অন্য সব দেশে কেবল পাহারাই দেয়, তার হাতে একটা বেটন থাকলেই যথেষ্ট, কিন্তু ভিয়েনার পাহারাওয়ালার গায়ে সৈনিকের সাজ ও কোমরে সুখচিত তরবারি। ভিয়েনার লোক কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে তাদের সম্রাট ও তাঁর সভাসদেরা ছিলেন ইউরোপের মধ্যে অভিজাততম, যদিও এখন তারা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বললে হয় এবং খেতে পায় না ব'লে লীগ্ অব্ নেশন্‌সের মধ্যস্থতায় টাকা ধার নিয়েছে। অষ্ট্রিয়াকে সম্ভবত একদিন বাধ্য হয়ে জার্মানীর অন্তর্গত হ'তেই হবে, কিন্তু ভিয়েনা কেমন ক'রে ভুলবে যে সে-ই ছিল জার্মানীর তথা ইউরোপের দীর্ঘকালের রাজধানী! সেদিনকার বার্লিনের কাছে ভিয়েনা কেমন ক'রে হাত জোড় করে দাঁড়াবে!

যে প্রাশিয়া একদিন তার ভৃত্যের মতো ছিল তার কাছে অষ্ট্রিয়া হবে ছোট! কিন্তু গরজ বড় বালাই। কত বড় বড় উঁচু মাথাকে সে ধূলায় মিশিয়েছে। যে কারণে এখন ছোট ছোট কারবার টিকতে পারছে না, পৃথিবীব্যাপী combine গড়ে উঠছে, ঠিক সেই কারণে একদিন ছোট ছোট রাষ্ট্র টিক্‌তে পারবে না, মহাদেশব্যাপী মহারাষ্ট্র গ'ড়ে তুল্‌তেই হবে।

অষ্ট্রিয়ানদের দরিদ্র বললুম ব'লে যেন না মনে করেন ওরা আমাদের মতো দরিদ্র। ভিয়েনার পশ্চিমদিকে যাকে দারিদ্র্য বলা হয় ভিয়েনার পূর্বদিকে তার নাম সচ্ছলতা। অর্থাৎ ইউরোপের দরিদ্ররা এশিয়ার মধ্যবিত্ত। ইংলণ্ডে যাকে slum বলে সেটা আমাদের উত্তর কল্‌কাতার চেয়ে কুৎসিত নয়। ইউরোপের পারিয়াদের দাবীর ফিরিস্তি আমাদের মধ্যবিত্তদের তাক লাগিয়ে দেয়—চড়া হারের মজুরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, সস্তায় আমোদ-প্রমোদের টিকিট, ঘন ঘন ছুটি, প্রচুর পেন্সন, আপদে-বিপদে জীবনবীমা। আরো কত কী! জীবনের কাছে আমাদের দাবী কোনোমতে বংশ-রক্ষা করা ও মরে গেলে পিণ্ডিটুকু পাওয়া। এদের দাবী হয় রাজসিক জীবন নয় রাজসিক মৃত্যু। সামান্য কারণে এরা বিদ্রোহ ক'রে বসে, যত সহজে মরে তত সহজে মারে। জীবনের মূল্য যত প্রাণের মূল্য তত নয়। স্বল্পতম ভার সইতে পারে না ব'লে এদের সমাজ লোক-সংখ্যা বাড়লেই যুদ্ধের অছিলা খোঁজে। এদের সমাজকে পাতাবাহারের গাছের মতো মাঝে মাঝে ছাঁটলে তবে তার স্বাস্থ্য থাকে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের অংশটি এদের কাছে এত মূল্যবান যে এই জন্যে যুদ্ধের আর বিরাম নেই, এই জন্যে এরা পিণ্ডাধিকারী না রেখে চিরকুমার অবস্থায় মরাটাকে অধর্ম জ্ঞান করে না, বেশী বয়সে বিয়ে করার আনুষঙ্গিক অন্যায়—হয় আত্মনিগ্রহ নয় অপকীর্তি—তো করেই, বিয়ের পরেও যে কোনো মতে জন্মশাসন করে। এত বড় ইউরোপে কোথাও একটি পশু-পাখি-সাপ-ব্যাঙ-মশা-মাছি দেখ্‌তে পাওয়া শক্ত, অন্নের ভাগ দিতে পারবে না ব'লে অভক্ষ্য প্রাণীকে এরা মেরে সাবাড় করেছে ও ভক্ষ্য প্রাণীকে অন্নে পরিণত করেছে। একটা পোষা প্রাণীর যদি স্বাস্থ্য গেল তো তাকে এরা তখুনি গুলি ক'রে ভাব্‌ল দু'পক্ষের আপদ চুক্‌ল। অপরপক্ষে কিন্তু

পোষা প্রাণীকে এরা রুগ্‌ণ হতেই দেয় না, এত যত্নে রাখে। পীড়িত পশুকে দিয়ে গাড়ি টানালে কঠিন সাজা। হত্যা ব্যাপারটা যাতে এক মুহূর্তে সমাপ্ত হয়, পশুর পক্ষে যন্ত্রণাকর না হয়, সেজন্যে কসাইদের পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একটা মুমূর্ষু প্রাণী দশদিন ধ'রে—না, দশ ঘণ্টা ধ'রে—একটু একটু ক'রে মরছে ও অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছে এ দৃশ্য ইউরোপে দেখবার জো নেই। নিজে যন্ত্রণা পেতে ভালোবাসে না ব'লে এরা যন্ত্রণা দিতে ভালোবাসে না। Vivisectionএর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে। ইউরোপের সব দেশেই এখন নিরামিষাশী-সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হয়েছে অনেকেই।

অনাবশ্যককে ইউরোপ নির্মমভাবে ছেঁটেছে। বুড়ো-বুড়ীকেও না খাটিয়ে খেতে দেয় না। "Dying in harness" তার জীবনের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকের বহরকেও সে বাড়াতে লেগেছে। যৌবন আগে ছিল গোটাকয়েক বছরের। এখন চাই শতবর্ষের যৌবন। এর জন্যে কত প্রাণী হত্যা করতে হবে, কত মানুষকে যুদ্ধে মারতে হবে, কত লোককে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে হবে, কত অজাত শিশুকে জন্মাতে দেওয়া যাবে না, কত শিশুকে প্রকারান্তরে হত্যা করতে হবে। এত কাণ্ড করলে তবে হবে জনকয়েকের দীর্ঘ যৌবন, নিখুঁত স্বাচ্ছন্দ্য। দুর্ভিক্ষের চেয়ে আত্মনিগ্রহের চেয়ে শিশুমৃত্যুর চেয়ে চিররুগ্‌ণতার চেয়ে এ ভালো, না, মন্দ?

দূর থেকে শুনতুম অস্ট্রিয়ানদের মরো মরো অবস্থা, তারা বুঝি আর বাঁচে না! দেখলুম তারা দিব্যি আছে, আমাদের চেয়ে সচ্ছল ভাবে। বুঝলুম ইউরোপের লোক সামান্য অসুবিধাকেও বাড়িয়ে দেখে, চার বেলার এক বেলা না খেতে পেলে বলে দুর্ভিক্ষে মরে গেলুম। লণ্ডনে সেদিন দশ বারোটা লোক নাকি অনশনে মরেছিল, তাই নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর আসন ট'লে উঠল। অথচ ওরা যদি যুদ্ধে মরতো তবে কেউ ওদের কথা ভুলেও ভাবত না। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের দুর্ভাবনা এই যে তাদের স্ত্রীরা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অনবদ্য স্বাস্থ্য অটুট রাখতে পারে না, তাদের স্বামীদের মজুরী এত কম! আর আমাদের বড়লোকের মেয়েরাও কুড়িতে বুড়ী হন। দূর থেকে আমাদের দেশটাকে মাঝে মাঝে মনে

হয় একটা বিরাট Slow suicide club—এত আমাদের সহিষ্ণুতা, অল্পে সন্তোষ, আত্মনিগ্রহ, চক্ষুলজ্জা। আমরা বলি, নিজের ছাড়াবাকি সকলের উপকার করো। এরা বলে, "Help yourself", কেননা "God helps those who help themselves", অর্থাৎ নিজের মাথায় যদি তেল ঢালো তো ভগবান তোমার তেলা মাথায় তেল ঢালবেন। বেকারসমস্যা নিয়ে ইংলণ্ড বড় বিব্রত। অথচ ইংলণ্ডের ধনীরা যদি একখানা ক'রে রুটি দেয় তবে ইংলণ্ডের যত বেকার আছে, প্রত্যেকেই এক একজন মোহান্ত মহারাজের মতো বৈষ্ণবী নিয়ে পরম আহ্লাদে মালা জপতে পারে। শুধু তাই নয়, ইংলণ্ডের ধনীরা ইচ্ছা করলেই বিশ ত্রিশ কোটি ইঁদুর বাঁদর প্রভৃতি কেষ্টর জীবের জন্য একটা দেশব্যাপী চিড়িয়াখানাও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ভিক্ষা দিয়ে অপরের উপকার করা এদেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—যোগ্যতা না দেখলে, বাধ্য না হ'লে দেয় না। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে এমন মন-কষাকষি আমাদের দেশে নেই, এত দলাদলিও আমাদের দেশে নেই। তবে সন্ধি করবার কায়দাও এরা জানে। সময় বুঝে সন্ধি না করলে দু'পক্ষের একপক্ষ অবশিষ্ট থাকবে না, একহাতে তালি বাজবে না। যুদ্ধটা হচ্ছে সহিংস সহযোগ, ও ব্যাপার একা একা হয় না। ভবিষ্যতে আবার লড়বে ব'লে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কেননা শত্রুই হচ্ছে যুদ্ধের সহযোগী। যে জন্তুকে এরা শিকার করবে সে জন্তুকেও এরা বন-জঙ্গলে পালন করে। খাবার জন্যেই এরা গোরু শুওরকে খাইয়ে মোটা করে।

ইউরোপের বহিঃপ্রকৃতি তার অন্তঃপ্রকৃতিকে কী পরিমাণ নিকরুণ করেছে তার একটা নিদর্শন ইউরোপের যে দেশে যাই সে দেশে দেখি। আমাদের যেমন চালের দোকান এদের তেমনি মাংসের দোকান; প্রায় প্রত্যেক গলিতে আছেই, কষ্ট ক'রে খুঁজতে হয় না, আপনি খোঁচা দেয়। বেচারা মুসলমানেরা ক'টাই বা গোরু খায়, যদি বা খায় তবে ক'টা গোরুর ছাল-ছাড়া ধড় রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে, খদ্দের এলে করাত দিয়ে নির্দিষ্টস্থানের মাংস কেটে ওজন ক'রে প্যাক্ ক'রে বিক্রি করে? একসঙ্গে একশোটা মরা পাখি, পাকা কলার মতো ঝুলছে কিংবা একশোটা মরা

খরগোস! সাজিয়ে রাখাটাকে ওরা একটা আর্ট ক'রে তুলেছে ব'লে বীভৎস ঠেকে না, ক্রমে ক্রমে কলা-মূলো-কপি-কুমড়ার মতো লাগে, আমিষ নিরামিষের পার্থক্যবোধ লোপ পায়। রাগ করবার উপায়ও নেই, কেননা মাছকেও তো আমরা কলা-মূলোর সামিল মনে ক'রে থাকি, বিশেষ ক'রে বাঙালীর চোখে মাছ একটা প্রাণীই নয়। প্রাণ সম্বন্ধে ঐ অসাড়তাকে আরেকটু প্রশ্রয় দিলে আমরাও ইউরোপীয় হয়ে পড়তুম, ঝুলন্ত হ্যাম দেখে—চোখে নয়—জিভে জল এসে পড়ত।

দোকান সাজানোতে ইংরেজ জার্মান অষ্ট্রিয়ান সুইস্‌রা ওস্তাদ্‌। ফরাসীরা আমাদের মতো এলোমেলো। শুধু দোকান নয়, রেল স্টীমার হোটেল রেস্তোরাঁ পথঘাট প্রদর্শনী—সর্বত্র একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য উত্তর ইউরোপের বিশেষত্ব ব'লেই মনে হয়। ভিয়েনা প্যারিস এই দুটি শহরের মধ্যে ভিয়েনা অনেক বেশি সৌষ্ঠবসম্পন্ন, যদিও এলোথেলো সৌন্দর্য প্যারিসেই বেশি। ভিয়েনায় তো সেন্‌ নদীর মতো আঁকাবাঁকা নদী নেই, তার কূলে বসে মাছ-ধরা নেই, তার কূলে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা নেই, তার বাঁধা পুরোনো বইয়ের দোকানে ঝুঁকে-পড়া বই-পাগলা বুড়ো নেই, তার আশেপাশের রাস্তায় রঙিন কার্পেট কাঁধে নিয়ে পায়চারি-করতে-থাকা ইজিপশিয়ান ফেরিওয়ালা নেই। এত রকম রাস্তায় দৃশ্য প্যারিসের মতো আর কোথায় আছে? সারাক্ষণ যেন অভিনয় চলেছে প্রতি রাস্তায়। অথচ নোংরা রাস্তা, মোড়ে জল জমেছে, ফুটপাতে দোকানের নীচে দোকান, তাতে একসঙ্গে একশো রকম জিনিস জট পাকিয়েছে, তরমুজ আর বাঁধা-কপির সঙ্গে খরগোস আর মাছ এবং গেঞ্জি আর পুলোভার। দোকানের গায়ে-গায়ে একটা কাফে আর মদের দোকান—সেও অকথ্য নোংরা অগোছাল। এ-সব অনাচার ভিয়েনায় কিংবা লণ্ডনে নেই, কোলোনে কিংবা মিউনিকে নেই, বার্ণে কিংবা লুসার্ণে নেই। মার্সেলসে আছে, ভার্সেলসে আছে এবং সম্ভবত সমস্ত ফ্রান্সে আছে; এবং সম্ভবত সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে। প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো ফরাসীদের নিখুঁত বাস্তুকলার সঙ্গে প্রচুর ধুলো কাদা যোগ দিয়েছে। ভিয়েনা চিত্রে ভাস্কর্যে বাস্তুকলায় প্যারিসের নকল, কিন্তু শৃঙ্খলায় ও পারিপাট্যে

প্যারিসের বাড়া। অবস্থা-বিপর্যয় সত্ত্বেও তার এই গুণগুলি যায়নি, তার সোশ্যালিস্ট মিউনিসিপ্যালিটির মেজাজটা বোধ হয় বাদশাহী ধরনের।

বাদশাহের প্রাসাদগুলি অবশ্য এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। দশ বছর আগে যে বাগানে বাদশাজাদীরা হাওয়া খেতেন এখন সেখানে গরীবের মেয়েরা খেলা করতে যায়। দশ বছর আগে যে সব ঘরে বাদশাহ শয়ন বিশ্রাম ভোজন করতেন বা নাচের মজলিস্ ডাকতেন, সে-সব ঘর এখন সামান্য কিছু দর্শনী দিলে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তার লোকের সম্পত্তি। দশ বছর আগে সাধারণের চোখে যা আলাদীনের প্রদীপের মতো ছিল তাই এখন ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তারই মতো সাধারণ মানুষকে বাদশাহ পদবী দিয়ে তারই গৃহের মতো সাধারণ গৃহকে অমরাবতী কল্পনা করেছিল এবং সমস্ত ব্যাপারটির গায়ে পুরাণ ইতিহাসের রূপকথার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সেটিকে নিজের প্রতিদিনের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে রেখেছিল। ঈশ্বরভক্তির মতো রাজভক্তিও মানুষের নিজের তৃপ্তির জন্য; এবং একটা কাল্পনিক দূরত্বই তার প্রাণ। আজ সে-দূরত্ব ঘুচে গেছে; প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে রাজপ্রসাদটা বাহির থেকে হাঁ ক'রে দেখবার মতো এমন কিছু মায়াপুরী নয়, বারো আনা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে নিতান্তই রক্তমাংসের মানুষের আহারনিদ্রার স্থান, এবং ছোট ছোট মান-অভিমান পরশ্রীকাতরতার দাগে দাগী। মানুষে মানুষে যে কাল্পনিক ব্যবধান এতকাল এত কাব্য ও এত কলহ উদ্রেক করেছিল আজ মনে হচ্ছে—সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। এবার মানুষ যে নতুন জগতের দ্বারে দাঁড়িয়েছে সে জগৎ দিনের আলোর জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা তার নাড়ী-নক্ষত্র জানা, কোথাও একটু কল্পনার অবকাশ নেই, নিদারুণ মোহভঙ্গের মধ্যে তার পথ। কোন্ রাজ-প্রাসাদকে দেখে স্বর্গ কল্পনা করবে? কোন্ রাজাকে দেখে দেবতা? কোন্ রাজপুত্রকে নিয়ে উপকথা রচনা করবে? কোন্ রাজবংশকে নিয়ে কাব্য? তাই শেক্‌স্‌পিয়রও আর হয় না, রবীন্দ্রনাথও আর হবে না।

যতগুলো রাজপ্রাসাদ দেখলুম তাদের কোনটাই মনে ধরল না, কেননা কোনোটাই আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোশাকে প্রাসাদে যানে। বাহনে বেগমে গোলামে আমাদের রাজা-রাজড়ারাই দুনিয়ার সেরা। আগ্রা দিল্লী লক্ষ্ণৌ বেনারসের সঙ্গে ভার্সেল্‌স ভিয়েনা মিউনিক বুডাপেস্টের এইখানেই হার যে রাজাতে প্রজাতে ভারতবর্ষে যেমন আস্‌মান জমীন্ ফরক্, সম্ভবত এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও তেমন ছিল না। আমরা ধাতে একস্ট্রীমিস্ট। আমরা রাজা বাদশা ও ভিখারী ফকির ছাড়া কারুকে সম্মান করিনে। তাই আমাদের দেশে ভোগের নামে লোকে মূর্ছা যায়, ভাবে না জানি কোন্ রাজা-রাজড়ার মতো ভোগ করতে গিয়ে ভিখারীতে সমাজ ভরিয়ে দেবে! আর ত্যাগের নাম করলে ধড়ে প্রাণ আসে,—হাঁ, সমাজের পাঁচজনের উপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখছ না আমাদেরি জন্যে উনি কৌপীন ধরলেন।

ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর বোধ হয় কেবল ভারতবর্ষের নয়, প্রখর সূর্যালোকিত দেশগুলির দুর্ভাগ্য। ইজিপ্টে ও গ্রীসে সমাজের একটা ভাগ দাসত্ব করেছে, অপর ভাগ সেই দাসত্বের উপর পিরামিড খাড়া করেছে। অতটা একস্ট্রীমিজম প্রকৃতির সহ্য হয় না—ইজিপ্ট্ ও গ্রীস ট'লে পড়েছে। দাসও মরেছে, দাসের রাজাও। ভারতবর্ষেও কোনো একটা রাজবংশ দু'চার পুরুষের বেশি টেকেনি, যত বিজেতা এসেছে সবাই দু'চার পুরুষ পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেলা এর ব্যতিক্রম হ'লো কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জল-হাওয়া কিংবা ধাত কোনোটাকেই স্বীকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে শাসন করে এবং ঘরের প্রভাববশত মনেপ্রাণে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ইংরেজের temper গরমও নয়, নরমও নয়; অসহিষ্ণুও নয়, সহিষ্ণুও নয়। ইংরেজ আশ্চর্যরকম মধ্যপন্থী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেশী মাঝারি। এই মাঝারিত্বকে লোকে গালাগাল দিয়ে বলে conservatism; আসলে কিন্তু ইংরেজের conservatism স্থাণুত্ব নয়, ধীরেসুস্থে চলা, slow but sure—কচ্ছপ-গতি। সূর্যের আলোর

এদের মধ্যে ফরাসীরা কতকটা আমাদেরই মতো এক্স্ট্রীমিস্ট, তাই তারা সুদীর্ঘ-কাল মহাশয়ের মতো যাই সওয়াবে তাই সয়, অবশেষে একদিন এট্না আগ্নেয়-গিরির মতো অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আবার চুপচাপ ব'সে মদে চুমুক দেয়। তার ফলে খরগোশকে ছাড়িয়ে কচ্ছপ এগিয়ে যায়।

তবে ফরাসী বলো জার্মান বলো ইংরেজ বলো—কেউ আমাদের মতো ছোটতে বড়তে আস্‌মান জমীন্ ব্যবধান ঘটতে দেয় না, সময় থাকতে প্রতিকার করে। এই যে সোশ্যালিস্ট মুভ্‌মেণ্ট, এটার মতো মুভ্‌মেণ্ট প্রতি শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিয়েছে। আজ যদি এ মুভ্‌মেণ্ট অতি বৃহৎ হয়ে থাকে যার বিরুদ্ধে এ মুভ্‌মেণ্ট, সেও আজ অতি বৃহৎ হয়ে উঠেছে। সমাজের একটা পা আজ বিপর্যয় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে ব'লেই অপর পা'টা বিপর্যয় লাফ দিয়ে সঙ্গ রাখতে ব্যগ্র। ইউরোপের ধনীরা আজকের এই উন্মুক্ত পৃথিবী থেকে যে প্রচুর ধন আহরণ ক'রে ঘরে আন্‌ছে, ইউরোপের শ্রমিকরা সেই প্রচুর ধনেরই একটা সমানুপাত বণ্টন চায়।

এক হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা যে ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সইতে না পেরে সুতো-ছেঁড়া ঘুঁড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব ক'রে দরিদ্রের দরিদ্রতার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগতে হয় এবং কোনোদিন সে ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যন্ত এই যে সাধনা, এই ভারসাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। যে জগতে প্রতিদিন বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র ভাঙছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড় বড় নৌকাডুবি ঘটছে, প্রতিদিন ছোট ছোট অণুপরমাণু থেকে নব নব গ্রহ নক্ষত্র গ'ড়ে উঠছে, ছোট ছোট প্রবালকীট মিলে অপূর্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথে তুলছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সন্ন্যাসীকে কেউ পাবে না। সে তার কাঁথা কম্বল ছাল বল্কল আঁকড়ে ধ'রে বিবাগী হয়ে গেছে। এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রাণীমক্ষিকার সংখ্যা বাড়ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনগুঞ্জনে সংসারচক্র মুখর হচ্ছে। প্রাসাদে আর কুটীরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত নয়, একাধারে স্বর্গ-

ব্যবধান দুরতিক্রম্য নয়, কিন্তু হিমালয় পর্বত ও ভারতসাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট ও নিচে বিশ হাজার ফিট—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দুরতিক্রম্য। ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজারা যে চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষী-মজুররা যে চালে থাকে ইউরোপের ভিখারীদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার খুব সম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চ'লে আসছে। কেননা আমরা চিরকাল Intemperate Zone-এর লোক। আর আমাদের দেশটাও চিরকাল এত বেশী উঁচু নিচু যে আমাদের চোখে জীবনের বিশ্রী রকম উঁচু নিচুও একটা সহজ উপমার মতো স্বাভাবিক ঠেকে।

রাজপ্রাসাদগুলি পরিদর্শন করবার সময় লক্ষ্য করেছি সেগুলি কেবল রাজ-প্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর দুঃখ-সুখের নীড়—এক-একটি "home"। ইংরেজী "home" কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই, কেননা "home" কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠপাথরের রূপান্তরিত প্রেম। ইংরেজ যুবক যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন একটি গুহা প্রত্যাশা করে যেখানে সে সিংহীর মতো স্বাধীন, যেখানে তার স্বামী পর্যন্ত তার অতিথি, শাশুড়ী শ্বশুর জা দেবর তার পক্ষে ততখানি দূর, শাশুড়ী শ্বশুর শ্যালক শ্যালিকা তার স্বামীর পক্ষে যতখানি। গুহার বাইরে তার স্বামীর এলাকা গুহার ভিতরে তার নিজের; কেউ কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। বাড়িতে একটা চাকর বাহাল করবার অধিকারও স্বামীর নেই, কিংবা চাকরকে জবাব দেবার। বাজার করাটাও স্ত্রীর এলাকা, কেবল দাম দেবার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক অফিসে এবং ক্লাবে ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আসবাবের দোকানে গহনার দোকানে পোশাকের দোকানে ধোপার বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে বাড়িওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে পার্টিতে নাচে সর্বত্র স্ত্রীর বৈজয়ন্তী। এ সমস্তই "home"এর এলাকায় পড়ে। অতএব "home"কে আপনারা কেউ চারখানা দেওয়াল ও একখানা ছাদ ঠাওরাবেন না। ছেলের দোলনা থেকে ছেলের বাপের খাবার টেবিল পর্যন্ত যাঁর রাণীত্ব নয়

তিনি সুগৃহিণী নন্, সমাজে তাঁর নিন্দা, তিনি কুনো। গির্জায়, charity bazaarএ সমাজসেবার সব আয়োজনে যার হাত (বা হস্তক্ষেপ) তিনিই সুগৃহিণী।

এত যদি স্ত্রীর অধিকার তবে feminismএর ঝড় উঠল কেন? কারণ industrial revolutionএর ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে, ছেলেরা সারাজীবন দেশ-দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা "home" কর্‌বে কাকে নিয়ে? "Home"এর মধ্যে একটা স্থায়িত্বের ভাব আছে, স্থানিক স্থায়িত্ব না হ'ক, সাময়িক স্থায়িত্ব। প্রেম স্থায়ী না হ'লে "home" হয় না। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই-ঠাঁই হ'লেও ভাবনা ছিল না, দু'জনের হৃদয় যে ঠাঁই-ঠাঁই হ'তে আরম্ভ করেছে। আমরা হ'লে বল্‌তুম, দুয়ো-সুয়ো চলুক্ না? অন্ততঃ সদর মফঃস্বল? মুশকিল এই যে, এতটা পতিব্রতা হ'তে এদেশের মেয়েরা এখনও শিখ্‌ল না। সুয়োকে কোথায় বোন ব'লে আপনার ক'রে নেবে ও স্বামীর শয্যায় পাঠিয়ে দেবার পার্ট প্লে কর্‌বে—আরে ছি ছি, রাম রাম, স্বামী-দেবতাকে বিগ্যামীর অপরাধে পুলিসে দেয়! আর মফঃস্বলের খবর পেলে, একেবারে ডিভোর্স কোর্ট—ধিক্! এরি নাম সভ্যতা!

ইংরেজ জার্মান স্কাণ্ডিনেভিয়ান মেয়েরা নিজের পাওনাগণ্ডাটি চিরকাল বুঝে নিয়েছে। অতীতকালে এরা স্বামীকে বলেছে, তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা বাবাকে না। তাই এদের স্বামীরা পিতৃ-পিতামহের সনাতন ট্রাইব ছেড়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ফ্যামিলি সৃষ্টি করেছে—ফ্যামিলি ও পরিবার এক কথা নয়, যেমন "home" ও গৃহ এক কথা নয়। এ মজ্জাগত পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার স্বভাব থেকেই বর্তমানকালে feminismএর উৎপত্তি। এর মূল সুরটি এই যে, "home"-এর দায়িত্ব যখন তোমরা স্বীকার কর্‌ছ না তখন আমরাও স্বীকার করব না, আমরাও মুক্ত হই। আপনারা বল্‌বেন, সহিষ্ণুতাই নারীর ধর্ম, মা বসুমতী কত সইছেন! কিন্তু ম্লেচ্ছ মেয়েরা এত বড় তত্ত্বকথাটা বোঝে না, তাই তাদের স্বামীদের পদভারে মা বসুমতী টলমল, এবং তাদের পদভারে স্বামীরা শিবের মতো চিৎপাত।

ভিয়েনার রাজপ্রাসাদগুলিতে রাণী মারিয়া থেরেসার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। রাণী বল্‌তে অসপত্ন রাণী বুঝতে হবে—এবং জা-শাশুড়ী-হীন। এবং সামাজিক

প্রাণী। দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রীতে বেগমের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন-বিশেষ যদি বা দেখা যায় তবু ও-সব রাজপ্রাসাদকে "home" মনে করতে পারিনে। এবং সামাজিক প্রাণী হিসেবে বেগমের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের পাঁচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আতিথ্য পাননি ; রাজন্যশ্রেণীর পাঁচজন পুরুষ সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করতে পারেননি, দু'দণ্ড নাচবার আস্পর্ধা রাখেননি। বাঁদী ও বান্দায় ভরা বিশাল বেগমমহলে বাদশা মাসে একবার পূর্ণচন্দ্রের মতো উদয় হন, পুত্র-কন্যারা মা-বাবার সঙ্গে দু'বেলা আহার করবার সৌভাগ্য না পেয়ে দাস-দাসীর প্রভাবে বাড়েন। এমন গৃহকে গৃহিণীর সৃষ্টি বলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য রাজপ্রাসাদ আড়ম্বরে অপ্সরাপুরীর মতো হয়েও দুঃখে সুখে নীড়ের মতো নয়। এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, লুই রাজার বা নেপোলিয়নেরও মফঃস্বল ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে রাজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইন কানুনের উপরে, তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মানুষ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পোপের নির্দেশ অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই চালিত হোতো। ইংলণ্ডের রাজা চার্চ অব ইংলণ্ড ও পার্লামেন্টের কাছে এতটা দায়ী যে তাঁর বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ পর্যন্ত সমাজের এই দু'টির হাতে। রাশিয়ার এত বড় স্বেচ্ছাচারী জারও স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্বার বিবাহ করতে পারতেন না কিংবা সুয়োরাণীর ছেলেকে রাজ্যাধিকার দিয়ে যেতে পারতেন না। সে-ক্ষেত্রে তিনি গ্রীক চার্চের নির্দেশসাপেক্ষ। তবে এও অস্বীকার করছিনে যে পোপ বা প্যাট্রিয়ার্করা মাঝে মাঝে ঘুষ খেয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতেন। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক চিরদিন বিদ্রোহ করেছে। প্রোটেস্টাণ্টিজ্‌ম্ তো এই জাতীয় একটা বিদ্রোহ! ওটাও আধুনিক সোশ্যালিস্ট মুভ্‌মেণ্ট্ বা এর আগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই মতো মানুষে মানুষে দুরতিক্রম ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আসবাব-শিল্পের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। এই মুহূর্তে ইউরোপের সর্বত্র আস্‌বাব-শিল্পের বিপ্লব চলেছে। কোলোনে মিউনিকে ও ভিয়েনায় নতুন ধরনের ঘর ও নতুন ধরনের আস্‌বাবের কত রকম নমুনা দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধের

পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মাঝখান থেকে আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। চাষী-মজুরদের অবস্থার যতটা উন্নতি হয়েছে মধ্যবিত্তদের অবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই দুই শ্রেণীর জন্য অল্প দামের মধ্যে মজবুত অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক বাড়ি ও আসবাব দরকার হয়েছে লাখে লাখে। যার যে নমুনা পছন্দ হয় সে অবিলম্বে সে রকম জিনিসটি পায়। Large scale productionএর নীতি অনুসারে খরচ বেশী পড়ে না, হাঙ্গামাও নেই, পছন্দ করবার পক্ষে নমুনাও যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে যে ঘরের সাইজ ও রঙ্ ইত্যাদি অনুসারে আসবাবের সাইজ, রঙ্ রেখা ও গড়ন। দুই দিকেই বিপ্লব ঘটেছে— বাড়ি ও আসবাব দুই দিকের দুই বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। দুই-ই সরল, লঘুভার, নাতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরলবসতি, নিরলঙ্কার! মানুষের রুচি এখন সভ্যতার অতিবৃদ্ধিকে ছেড়ে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বলকারক সত্যগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। সেইজন্যে নতুন ধরনের চেয়ার, টেবিল, খাট বা দেরাজের উপরে পাগলামির ছাপ যদি বা দেখতে পাওয়া যায় চালাকির মারপ্যাঁচ বা বড়মানুষীর চোখে আঙুল দেওয়া ভাব এক রকম অদৃশ্য। এর একটা কারণ, আগে যে-শ্রেণীর লোক slumএ থাকত তাদেরও চাহিদা অনুসারে এ সবের যোগান। এবং তাদের রুচি অতি সূক্ষ্ম বা অতি খুঁতখুঁতে নয় ব'লে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উপরিতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও রুচি মেলাতে হচ্ছে। Mass productionএর মজা এই যে, চাষী-মজুরের সিকিটা দুয়ানিটার জন্যে যে সিনেমার ফিল্ম তার রুচির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের রুচি না মেলে তো কলেজের ছাত্র নাচার। সিকি দুয়ানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষী-মজুর দু'পক্ষই সমকক্ষ, অগত্যা রুচির দিক থেকেও দু'পক্ষকে সাম্যবাদী হতে হবে।

১৫

ইংলণ্ড দেশটা যে কী সাংঘাতিক ছোট একটু ঘুরে ফিরে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ছোট তো আমাদের এক-একটা প্রদেশও, কিন্তু তাদের ছোটত্ব মানুষের হাতে গড়া। আর ইংলণ্ডের ছোটত্ব নৈসর্গিক। এর সর্বাঙ্গ ঘিরেছে আঁট

পোশাকের মতো সমুদ্র, এর মাথার উপরে চাপ দিয়েছে টুপির মতো আকাশ। না, আকাশ বলতে আমরা যা বুঝি তা এদেশে নেই। সেইজন্তেই তো দেশটাকে অস্বাভাবিক ছোট বোধ হয়। একটা অন্ধকূপ বিশেষ। এর ভিতরে যারা থাকে তারা পরস্পরের বড্ড কাছাকাছি থাকে, পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোনে। ইংলণ্ডে যখনি যে এসেছে সে বেমালুম ইংরেজ হয়ে গেছে। এর উদরের জারক রস এতই প্রবল যে আমিষ ও নিরামিষ দুধ ও তামাক যখন যাই পেয়েছে তখন তাই পরিপাক ক'রে এক রক্ত মাংসে পরিণত করেছে। ইংলণ্ডের আশ্চর্য একতার কারণ ইংলণ্ড দেশটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় অত্যন্ত আঁটসাট ও ছোট।

ভারতবর্ষে যখন সারাদিনের খাটুনির শেষে তারা-ভরা আকাশের তলে ব'সে নিঃশ্বাস ছাড়ি তখন সে নিঃশ্বাস শত যোজন দূরে নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যায়, মনে হয় না যে ভারতবর্ষ আমাদের বেঁধে রেখেছে। আমাদের বিশাল দেশ, বিরাট আকাশ: আমরা কোটি তারকার সঙ্গ পেয়ে ধন্য, মানব সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে আমরা তুচ্ছ ব'লেই জানি। আর এরা? এদের কিবা রাত্রি কিবা দিন—সমস্ত জীবনটাই non-stop dance কিংবা non-stop flight. ছন্দহীন যতিহীন বেতালা জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অশ্রান্ত বন্যাবেগ, এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে বসলে প্রতিযোগীরা লাথি মেরে এগিয়ে যায়, বৃদ্ধ বয়সে অন্নচিন্তায় অস্থির ক'রে রাখে। দিনের পর কখন রাত আসে, রাতের শেষ কোনো দিন হয় কি না, ঠিক নেই। এদেশের সূর্য সাম্রাজ্য পাহারা দিতে বেরিয়ে স্বরাজ্যে হাজিরা দেবার সময় পায় না। মাটি ও আকাশের মাঝখানে মেঘ ও কুয়াশার প্রাচীর। মানুষের প্রাণের কথা তারালোকে পৌঁছায় না, ঘরের কোণে ছোট ছোট দুঃখ সুখকে মহাজগতের বড় বড় দুঃখ সুখের সঙ্গে মিলিয়ে ধরবার সুযোগ মেলে না, "the world is too much with us night and day!"

তারপর এদের আকাশের আঁধার এদের মনকেও আঁধার করেছে, হাৎড়াতে হাৎড়াতে যখন যেটুকু সত্য পায় তখন সেইটুকু এদের কাছে সব। এরা কত বড় একটা সাম্রাজ্য চালায় নিজেরাই জানে না,' সাম্রাজ্য এরা গড়েছে অন্যমনস্ক ভাবে।

খাটি প্রাদেশিকতা যাকে বলে তা দ্বীপবাসীতেই সম্ভব এবং আকাশহীন দ্বীপবাসীতে। এরা তিন dimensionএর দ্বীপবাসী। ইংলণ্ডে দলাদলির অন্ত নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই স্বভাবে ইংরেজ অর্থাৎ আকাশহীন দ্বীপবাসী। কোনো একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন ইংলণ্ডে টি‍ঁকবে না, খ্রীষ্টধর্ম টি‍ঁকল না, সোশ্যালিজ্‌ম্ টি‍ঁকছে না। একদিন যেমন চার্চ অব্ ইংলণ্ড নিজস্ব খ্রীষ্টধর্ম সৃষ্টি করল আজ তেমনি লেবার পার্টি নিজস্ব সোশ্যালিজম্ সৃষ্টি করছে। নির্জলা ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইংলণ্ডেই প্রথম সম্ভব হয়, ইংলণ্ডেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এর কারণ নৈসর্গিক। তবে নিসর্গের উপরে খোদকারী করছে মানুষ। জাহাজের যা সাধ্যাতীত ছিল এরোপ্লেন তাকে সাধ্যায়ত্ত করছে, channel tunnel হয়তো অসাধ্য সাধন করবে, ইংলণ্ড আর দ্বীপ থাকবে না। কিন্তু মেঘের প্রাচীর?

দক্ষিণ ইংলণ্ডের নানা স্থানে ঘুরে ফিরে দেখা গেল। নিসর্গ ও মানুষ মিলে অঞ্চলটাকে সর্বতোভাবে একাকার ক'রে দিয়েছে। একই রকম অগুন্তি ছোট শহর, প্রত্যেকটাতে একই হোটেলের শাখা-হোটেল ও একই দোকানের শাখা-দোকান। স্থানীয় সংবাদপত্র ও থিয়েটারও বহুদূর থেকে চালিত। রেল ও বাস্ যদিও অগুন্তি তবু একই কোম্পানীর। একই আবহাওয়া, একই রকম ছিঁচ্-কাঁদুনে আকাশ, অসমতল ভূমি। মানুষও বাইরে থেকে একই রকম—পোশাকে চলনে বুলিতে আদবকায়দায় সামান্য যা ইতর বিশেষ তা বিদেশীর চোখে স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি মানুষ ইংরেজ হয়ে গেছে, প্লিমাথ-ওয়ালা বা টর্কী-ওয়ালা বলে কেউ নেই। অধিকাংশ বাড়িই এখন বাসা, বাড়ির মালিকরা হয় বাড়িতে থাকেন না হয় বাড়িতে বোর্ডিং-হাউস খোলেন। এই সব শহরের সর্বপ্রধান ব্যবসায় অতিথিচর্চা। অতিথিরা হয় ছুটিতে বেড়াতে আসে, নয় বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজে আসে। যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরও দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারা হয় দূরস্থিত পিতামাতার বোর্ডিং-স্কুলে পড়তে-থাকা সন্তান, নয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পেন্‌সনপ্রাপ্ত পিতামাতা। ছোটদের জন্যে বোর্ডিং-স্কুল ও বুড়োদের জন্যে নার্সিং হোম সমুদ্রতীরবর্তী বহুশত শহরে ও গ্রামে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

ইংলণ্ড যে দিন দিন socialised হয়ে উঠেছে, এর প্রমাণ ইংলণ্ডের এই সব বোর্ডিং স্কুল নার্সিং হোম হাসপাতাল পাব্লিক লাইব্রেরী ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান জনসাধারণের চাঁদায় চল্‌ছে, এসব অনুষ্ঠানে যারা থাকে তারা অনেক সময় জনসাধারণের চাঁদায় থাকে, এসব অনুষ্ঠানের শিক্ষায় বা চিকিৎসায় কোনো একজনের প্রতি পক্ষপাত নেই। গভর্নমেণ্টের খরচে চললেও এগুলি এমনি ভাবেই চল্‌তো। যে দেশে জনসাধারণ যা গভর্নমেণ্টও তাই, সেদেশে জনসাধারণের চাঁদায় চালিত বে-সরকারী হাসপাতাল ও জনসাধারণের খাজনায় চালিত সরকারী হাসপাতালে তফাৎ কতটুকু? ইংলণ্ডের অসচ্ছলরা চার্চ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে যে চাঁদা পায়, গভর্নমেণ্টের মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকেই সেই চাঁদাই পেতে চায়, যদিও তার নাম চাঁদা হবে না, হবে পাওনা। কিন্তু সেই পাওনা ও এই পাওনা তলে তলে একই জিনিস—এমনি বোর্ডিং-স্কুলের অপক্ষপাত শিক্ষা, হাসপাতালের অপক্ষপাত চিকিৎসা, নার্সিং হোমের অপক্ষপাত সেবা। এতে আত্মীয়-স্বজনের হাত নেই, হৃদয় নেই, এর উপর সমাজের ফরমাস প্রবল, ব্যক্তির রুচি-অরুচি ক্ষীণ। সমাজের অলিখিত হুকুমে মা তার কোলের ছেলেকে বোর্ডিং-স্কুলে দেয়, রুগ্ণ ছেলেকে হাসপাতালে রাখে। নিজের হৃদয়ের দাবীকে সমাজের দশজনের মতো নিজেও সেণ্টিমেণ্টাল্ বলে উড়িয়ে দেয়।

এই সব হোটেল বোর্ডিং-হাউস স্কুল ও নার্সিং হোম সাধারণত মেয়েদের হাতে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো এরা homeএর সাধ হোটেলে ও আত্মীয়-স্বজনের সাধ অতিথি দিয়ে মেটায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই আদর্শ উদ্‌যাপিত হ'তে চলল। নাম নিয়ে মারামারি ক'রে ফল নেই, এও একরকম সোশ্যালিজ্‌ম্। তলিয়ে দেখলে সোশ্যালিজ্‌মের আসল কথাটা কি এই নয় যে, সমাজ ও ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থ থাকবে না, সম্পর্কে ও সম্পত্তিতে "private" অঙ্কিত বেড়া থাকবে না? যে-জননী জন্মের পরমুহূর্তে সন্তানকে Dr Barnardo's Homeএ ত্যাগ করে ও যে-জননী জন্মের অল্পকাল পরে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়, তাদের একজনের সন্তানের খরচা বহন

করে বদান্য জনসাধারণ, অপরজনের সন্তানের খরচা বহন করে দূরস্থিত পিতা-মাতা; শিক্ষা উভয়েই পায় আত্মীয়দের অপক্ষপাত তত্ত্বাবধানে, পক্ষপাতী পিতামাতার সান্নিধ্য কেউই পায় না অধিকাংশ স্থলে। এদের আর্থিক অবস্থার উনিশ-বিশ থাকলেও এরা সোজাসুজি সমাজের হাতে গড়া।

প্রবীণাদের মুখে চোখে কথাবার্তায় এমন একটি স্নিগ্ধতা ও শান্তি লক্ষ্য করা গেল যা কোনো দেশবিদেশের বিশেষত্ব নয়, যুগবিশেষের বিশেষত্ব। অস্তগামী চন্দ্রের স্নিগ্ধতারও দিন শেষ হয়ে এলো। এর পরে বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্রা নারীর প্রখর জ্বালা, লাবণ্যহীন পিপাসাময় দুঃসাহসিক অরুণরাগ। ভারতের কল্যাণী নারীকে ভিক্টোরীয় ইংরেজ নারীতে কত স্থলে প্রত্যক্ষ করেছি, বহু সহোদরবিশিষ্ট প্রশস্ত গৃহাঙ্গনে এঁদের বাল্যকাল কেটেছে, যন্ত্রমুখর জীবন-সংগ্রামে জীবিকার জন্যে এঁরা প্রাণ পণ করেননি, পাঁচজনকে খাইয়ে খুশী ক'রেই এঁদের তৃপ্তি, জগতের সামান্যই এঁরা জানেন ও একটি কোণেই এঁদের স্থিতি,উদ্যানলতার ভঙ্গি এঁদের স্বভাবে ও উদ্যানপুষ্পের সুরভি এঁদের আচরণে। অনূঢ়া হ'লেও এঁরা গৃহিণী নারী, এঁরা স্বতন্ত্রা নারী নন্। আর এঁদের পরবর্তিনীরা ফ্ল্যাটে বা বোর্ডিং-হাউসে থাকা সাবধানী পিতামাতার স্বল্প-সহোদরবিশিষ্ট সন্তান। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাত্যহিক দান প্রতিদান কলহ মিলনে যে শিক্ষা সে শিক্ষা অল্পবয়স থেকে বোর্ডিং-স্কুলে বাস ক'রে হয়নি। তারপরে জীবিকার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে এঁরা যখন হরিণীর মতো ছট্ফট করেন তখন স্বভাবে আসে রুক্ষতা, আচরণে আসে ব্যস্ততা এবং বিবাহের সৌভাগ্য ঘটলেও নীরব নিভৃত জীবনে মন বসে না, মন চায় অভ্যস্ত মত্ততা, আগের মতো খাটুনি, আগের মতো নাচ, আগের মতো সন্তানঘটিত দুশ্চিন্তার প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বামীঘটিত তন্ময়তার প্রতি অনিচ্ছা। এ নারী গৃহিণী নারী নয়, স্বতন্ত্রা নারী। সমাজের কাজে এর অতুল উৎসাহ, প্রভূত যোগ্যতা, নার্স হিসাবে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে হোটেলের ম্যানেজারেস হিসাবে আপিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে এ নারী নিখুঁত। সচিব সখী ও শিষ্য রূপে এ নারী পুরুষের শ্রদ্ধা জিনে নিয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সর্বঘটে বিদ্যমান

দেখি যাকে সে নারী এই স্বতন্ত্রা নারী—গৃহহীন, পক্ষপাতহীন, জনহিতপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যে অটল। এ নারী সব পুরুষের সহকর্মিণী, কোনো একজনের রাণী ও দাসী নয়, সকলের সম্মানের পাত্রী, কোনো একজনের প্রেম ও ঘৃণার পাত্রী নয়।

যুগলক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ইংরেজ নারীর কতক বিশেষত্ব আছে—প্রবীণা ও নবীনা এক্ষেত্রে সমান। প্রথমত, ইংরেজ নারী চিরদিনই স্বাধীনমনস্ক শক্তমনস্ক। ইংরেজ পুরুষও তাই। গুরুজনের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়া তার দ্বারা কোনো যুগে হয়নি। সে নিজের ইচ্ছাকে নিজের হাতে রেখে স্বেচ্ছায় সমাজের বাঁধন স্বীকার করেছে, সামাজিক ডিসিপ্লিন মেনেছে। এই জন্যেই বিবাহটা দু'জন স্বাধীন মানুষের contract; এতে গুরুজনের হাত পরোক্ষ। দ্বিতীয়ত নারীত্বের কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শ এ দেশের নারীর সামনে তেমন ধরা হয়নি যেমন আমাদের সীতা সাবিত্রীর আদর্শ। এর ফলে এ দেশের নারী প্রত্যেকেই এক একটি আদর্শ, কোনো দু'জন ইংরেজ নারী কেবল ব্যক্তি হিসাবে নয়, type হিসাবেও এক নয়। সীতা সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমাদের নারীজাতিকে আমরা সীতা সাবিত্রী জাতি বানিয়েছি, তাদের মধ্যে নারীত্বের অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের নিয়ে আরেকখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত লেখা হ'লো না, অথচ হেলেন ও পেনেলোপীর পরিবর্তিনীদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কত কাব্যই লেখা হয়ে গেলো, কত ছবিই আঁকা হয়ে গেলো। তৃতীয়ত, ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই যেমন মনোযোগ গৃহসজ্জার প্রতি, শিশুচর্যা বা পশুচর্যার প্রতি। অধিকাংশ ইংরেজ নারীর সাজসজ্জা রূপকথার Cinderellaর মতো। কতকটা এই কারণে, কতকটা অন্য কোনো কারণে অধিকাংশ ইংরেজ নারীরই বাইরের charm নেই। পুরুষের প্রেমের চেয়ে পুরুষের শ্রদ্ধাই এদের কাম্য, সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার কামনা তীব্র।

আবহতত্ত্ববিদ্‌দের মুখে ছাই দিয়ে আবার সোনার সূর্য উঠছে, দশ দিক সোনা হয়ে গেছে।

কিছুদিন থেকে এমনি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিদিন আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছে, এ যেন একটা প্রাত্যহিক miracle। আকাশ উজ্জ্বল নীল, পৃথিবী উজ্জ্বল শ্যাম, গাছেরা এখনো পাতা ফিরে পায়নি, কিন্তু ফুলের ভারে ভেঙে পড়ছে, মেঠো ফুলের রঙের বাহার দেখে মনে হয় যেন ফুলের আয়নায় সূর্যের আলোর সব ক'টি রঙ্ বিশ্লেষিত হয়েছে। পাখিরাও বসন্তের সঙ্গে দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরল, তাদের নহবৎ আর থামেই না।

এমনি miracleএর উপর আস্থা রেখে আমরা মাঝে মাঝে লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে চোখ যায় সেইদিকে চরণ যায়, আহার নিদ্রার ভাবনাটা একাদশতম ঘটিকার আগে হাজির হয় না, এবং ভাবনা যদি বা হাজির হয় আহার নিদ্রাকে হাজির করানো সেও এক প্রাত্যহিক miracle। "মোটের উপর একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।"

অথচ এটুকু অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাল কাটতেও পারিনে। এত বড় উৎসব-সভায় পান পায়নি ব'লে খুঁৎ খুঁৎ করবে কোন্ বেরসিক? একসঙ্গে এতগুলো আনন্দ মিলে আক্রমণ করেছে—রঙ, রূপ, গান। সৌন্দর্যের বাণ সর্বাঙ্গ বিঁধে শরশয্যা রচনা করল। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই, এত অসহায়। জ্বরের মতো দেহমন লুটিয়ে পড়ে। পরস্পরকে অকারণে ভালোবাসি, অপরিচিতকে হারানো বন্ধুর মতো বুকে টানি। কুয়াশার মতো সংশয় উধাও হয়ে গেছে, ফেরার! আকাশব্যাপী আলোর মতো হৃদয়ব্যাপী প্রত্যয় দিবসে সূর্যের মতো নিশীথে চন্দ্রের মতো জাগরূক। জগতের পূর্ণতা জীবনের অপূর্ণতাকে সমুদ্রের কোলে শাঙ্খের মতো ওতপ্রোত করেছে। ধন্য আমরা—সৌন্দর্যসায়রের কোটি তরঙ্গাঘাত সইতে সইতে আমরা আছি, আমাদের দুঃখগুলি আনন্দসায়রের বীচিবিভঙ্গ। অভাব? এমন দিনে অভাবের নাম কে মুখে আনবে?

আমাদের একমাত্র অভাব—বাণীর অভাব, তৃপ্তি জানাবার বাণীর। আদিম মানবেরই মতো অন্তিম মানবও বাণীর কাঙাল থেকে যাবে, কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণীর। সেই জন্যেই তো মানুষের মধ্যে কবি সকলের বড়—ঋষির চেয়েও, বীরের চেয়েও, ব্যবস্থাপকের চেয়েও, ক্ষুধা-নিবারকের চেয়েও, লজ্জা-নিবারকের চেয়েও। কবিকে বাদ দিলে সুন্দরের সভায় মানুষ বোবা, কবিকে কাছে রাখলে তার কথা ধার নিয়ে মানুষের মান থাকে। নইলে ঋষি থেকে ক্ষুধা-নিবারক পর্যন্ত কেউ একটা পাখীর সম্মানও পেতেন না।

শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগ্বিজয়ে যেতেন, বসন্তকালে একালের আমরাও দিগ্বিজয়ে যাই। আমরা যাই কোন দিকে কোন আপনার লোক অচেনার মতো আত্মগোপন ক'রে রয়েছে তাদের মুখোশ খসাতে। এমন দিনে কি কেউ কারুর পর হ'তে পারে? এ কি কুয়াশা-কালো দিন যে শত হস্ত দূরের মানুষকে শৃঙ্গী ব'লে ভ্রম হবে? নিজের দুধের বাটিতে মুখ ঢেকে ভাবব পৃথিবীসুদ্ধ আমাকে দেখে হিংসায় জ্ব'লে পুড়ে মরছে? না, বসন্তকালে আমাদেরও মুকুল খোলে, আমরা ভালোবাসার সীমা খুঁজতে ফুলের গন্ধের মতো দিশাহারা হই, কোন শহর থেকে কোন গ্রামে পৌঁছই, কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন বেড়া টপকাই, কোন গাছের তলায় শুয়ে কোন কোকিলের গলা শুনি, কোন চেরির গুচ্ছ চুরি ক'রে কোন প্রিয়জনকে সাজাই, অপরিচিত শিশুর গায়ে চকোলেটের চিল ছুঁড়ে ভাব করি। এটা আমাদের দোষ নয়, ঋতুর দোষ। নইলে আমাদের মতো কাজের লোকেরা কি টাইপ-রাইটারের খট্‌খটানি ফেলে মোরগের কু-ক্-ক-কু-উ শুনতে যায়? না, রাজারা রঙমহল ছেড়ে রণক্ষেত্রে রঙ মাখতে যায়?

শীতকালের ইংলণ্ড যদি নরকের মতো গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড স্বর্গের মতো। প্রতিদিন হয়তো সূর্য ওঠে না, উঠলেও প্রতি ঘণ্টায় থাকে না, কিন্তু তাতে কী? ফুলের মধ্যে তার রঙ, পাতার মধ্যে তার আলো, পাখির গলায় তার তাব জমা থাকে: মেঘলা দিনে ঐ সঞ্চয় ভেঙে খরচ করতে হয়। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রথম কথা তার গড়ন। ইংলণ্ড বন্ধুরগাত্রী। যে কোনো

একটা ছোট গ্রামে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে কী দেখি? দেখি যেন একখানা concave আয়না। রেখার উপরে রেখা হুড়্‌মুড়্‌ করে পড়েছে। অসমতল বললে ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না। বলতে পারি অযুত-সমতল। সমতলের সঙ্গে সমতল মিলে অযুত কোণ রচনা করেছে, এবং এক কাঠা জমিকেও সমতল রাখেনি। যেটুকু সমতল দেখা যায় সেটুকু মানুষের কুকীর্তি। সুখের বিষয় ইংলণ্ডের সমাজের মতো ইংলণ্ডের মাটিকেও মানুষ সরল রেখা দিয়ে সরল করেনি। এই এক কারণে শীতকালেরও ইংলণ্ড অসুন্দর বা অস্বাস্থ্যকর হয় না, হয় কেবল অন্ধকার। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই ইংলণ্ডে বর্ষা। কিন্তু বর্ষার জল দাঁড়াবার মতো একটু সমতল খুঁজে পায় না।

দেশের মাটির সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ বোধ হয় কথার কথা নয়। প্রাণীসৃষ্টির একটা স্তরে মানুষ ও উদ্ভিদ্‌ একই পর্যায়ভুক্ত নয় কি? আমার মনে হয় ইংরেজের মন যে law and orderএর জন্যে এত ব্যাকুল এর কারণ তলে তলে সে তার মাটির মতো law and order-হীন, অযুত-সমতল। ইংলণ্ডের মাটির উপরকার জল যেমন অহরহ সমতল পাবার চেষ্টা করছে, পাচ্ছে না, ইংরেজের সমাজও তেমনি যুগে যুগে সাম্যের চেষ্টা ক'রে এসেছে, পায়নি। Snobbery ইংরেজ সমাজের মজ্জাগত, উপর-তল না হ'লে তার সামাজিক রথ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারে না। অথচ সাম্যকেও তার মন চায়; নইলে চেষ্টা থাকে না, সবই আপনা-আপনি ঘটতে থাকে, উপরের জল চোখ বুঁজে নীচে যায়, নীচের ধোঁয়া চোখ বুঁজে উপরে ওঠে। এমনি নিশ্চেষ্টতা আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে আমাদের সামাজিক রথ কোনো মতে চলছে ও কোনো মতে থামবারও নয়। হিন্দুর মরণ নেই, সে হিন্দু-বিধবার মতো টিকে থাকবেই।

ইংরেজের মনের ভিত্তি অস্থির—সে যেন পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেখানে সবই বিশৃঙ্খল, সবই আগুন। অবচেতন ভাবে সে ঝড় ঝঞ্ঝাকে ভালোই বাসে, সমস্যার অভাব সইতে পারে না, কিছু না হ'ক একটা crossword puzzle তার চাইই, কোনো রকম একটা যুদ্ধ—হোক না কেন "যুদ্ধের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ"—না থাক্‌লে সে বেকার। "হরি হে, কবে শান্তি ও শৃঙ্খলা পাব", এটা তার চেতনার কথা। তার অবচেতনার কথা কিন্তু "শান্তি ও শৃঙ্খলাকে পাবার চেষ্টা যেন কোনো দিন ক্ষান্ত না হয়, এমনি চল্‌তে থাকে।" ইংলণ্ডের একটা হাত সমস্যার সৃষ্টি করে, আরেকটা হাত সমস্যার ধ্বংস করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র না থাকলেও অন্তরালে দুই হাতের একই স্বার্থ—তারা পরস্পরের অন্তরটিপুনি অনুসারে সমস্যার বাড়্‌তি কম্‌তি ঘটায়, মীমাংসা কাঁচা-পাকা রাখে। আপিসের দুই চালাক কর্মচারী তারা, অদরকারী ব'লে কোনো দিন তারা বেকারের দলে পড়ল না। ইংলণ্ডকে দেখলেই মনে হয়, সাবাস, খুব খাটছে বটে, কী ব্যস্ত! কিন্তু তদারক করলে ধরা প'ড়ে যায়, সমস্যা ও মীমাংসার উপরে যে একটা স্তর আছে সে স্তরে কি এদেশ কোনো দিন উঠবে! সাত্ত্বিকতার শিবনেত্র কি কখনো এর ললাটে জ্বলবে! এ যেসব পর্যবেক্ষণ করে, কিছুই দেখে না, সব জ্ঞাত, হয় কিছুই জানে না, সব বোঝে কিছুই উপলব্ধি করে না। এর জীবন যেন জীবনব্যাপী ছেলেমানুষি। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত লাট্টুর সঙ্গে লাট্টুর মতোই ঘুরছে!

প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী সাজে, মানুষ তখন তার সাজ দেখবার জন্যে কাজকর্ম ফেলে রাখে; এই জন্যে আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। ইংলণ্ডেও নাকি এককালে মাসে মাসে দোল-দুর্গোৎসব ছিল, কিন্তু তে হি দিবসাঃ গতাঃ। এখন প্রতিরাত্রে পার্বণ চলে নাচঘরে ও সিনেমায়, প্রতিদিন খেলার মাঠে। বড়দিন বা ঈস্টার এখন নামরক্ষায় পর্যবসিত। ভারতবর্ষের লোকের কাছে এই হিসাবে ইংলণ্ড অত্যন্ত নিরানন্দ দেশ। এ দেশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পূজ্যের সঙ্গে পূজারীর সম্বন্ধ থেকে কখন নেমে এসে শিকারের সঙ্গে শিকারীর সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছে। এখনকার আমোদপ্রমোদগুলো যেন যুদ্ধে জিতে শত্রুর মৃতদেহের উপরে মাতলামি করা। এখন আমাদের শিরায় শিরায় ভয়, মৃত্যুভয় দারিদ্র্যভয় ব্যাধিভয়। প্রকৃতির প্রতিশোধগুলোর নামে মানুষ বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতি যে কত রকমে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে হিসাব হয় না। একটা মস্ত প্রতিশোধ হচ্ছে যুদ্ধ। আধুনিক কালে আমরা অধিকাংশই রুটিন দেখে ভুলে

পড়ি, অফিসে কাজ করি, খেলতে যাই ও তামাসা দেখি। প্রত্যেক দেশেই এখন হাজার হাজার ইস্কুল কলেজ, লাখে লাখে অফিস, কারখানা, সংখ্যাতীত সিনেমা নাচঘর। প্রত্যেকটি মানুষ হয় সরকারী নয় বেসরকারী ব্যুরোক্রাট্—সরকারী ডাক-ঘরের কেরানী থেকে Lyonsএর চায়ের দোকানগুলোর কর্মচারিণী পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। এই কোটি কোটি মৌমাছির:চিত্তবিনোদনের জন্যে একই অভিনেতা অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয় ক'রে যান। তিনশোবার বাজালে একখানা গ্রামোফোনের রেকর্ডের ইজ্জৎ থাকে না, কিন্তু ধন্য এদের গলা!

এর পরিণাম জীবনে বিরক্তি। ছুটির দিন সস্তা টিকিট কিনে ট্রেন বোঝাই ক'রে একই স্থানের পাশাপাশি হোটেলে যখন হাজার হাজার জন অভ্যাগত টমাস কুকের তর্জনী সংকেতে পরিচালিত হন্ ও charabancএর পিঠে চড়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে যান, তখন অন্তঃপ্রকৃতি বহিঃপ্রকৃতি দু'জনেই "ত্রাহি" "ত্রাহি" ক'রে ওঠেন। তাঁরা বলেন, "রুটিনের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, মানচিত্রের হাত থেকে, এষ্টিমেটের হাত থেকে।" তখন এমন কোথাও যাবার জন্যে মানুষ ছট্‌ফট করে যেখানে টমাস কুক নেই, পাকা সড়ক নেই, শোবার ঘরওয়ালা মোটর কোচ নেই—এক কথায় আমাদের শিশুবর্জিত পশুবলদৃপ্ত সর্বস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ফ্ল্যাটের আরাম নেই। সমস্ত পৃথিবীটা যেমন শনৈঃ শনৈঃ একই রকম হয়ে উঠ্‌ছে, দেখে মনে হয় টমাস কুক গ্রামে গ্রামে দোকান খুলবে, কাউকে প্রাণ হাতে ক'রে বেহিসাবীভাবে অজানা পথে বিবাগী হ'তে দেবে না। তখন মানুষের একমাত্র আশাভরসার স্থল হবে যুদ্ধক্ষেত্র। সত্যিকারের ছুটি পাওয়া যাবে ঠিক সেইখানেই, যেখানকার কিছুই আগে থেকে জেনে রাখা যাবে না, প্রতি পদেই অকস্মাতের সঙ্গে দেখা।

গত মহাযুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে তারই পূরণের জন্যে প্রকৃতি অপেক্ষা করছে, তাই এখনো আমরা যুদ্ধের নামে জিভ্ কাটছি, মেয়েরা আগামী পার্লামেন্টটাকে Parliament of Peacemakers করবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু যে শিশু গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হয়ে বাড়ছে, যাদের কল্পনাকে খোরাক দেবার জন্যে

দ্যুলোকে ও ভূলোকে একটিও অপরিচিত প্রাণী একটাও অপরিচিত স্থান নেই, সেই সব বাস্তববাদী যখন বড় হয়ে দলে দলে সরকারী বে-সরকারী ব্যুরোক্রেসীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে রুটিন্ সাম্‌নে রেখে কাজ করবে তখন তাদের প্রত্যেকের চোখের সমুখে না হয় ঝুলিয়ে রাখা গেল "There is 'no fun like work" এবং সোশ্যালিস্টদের দয়ায় তাদের কর্মকাল না হয় ক'রে দেওয়া গেল দিনে পাঁচ ঘণ্টা, তবু তারা সেই সোনার খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে মরতে চাইবে না কি? অত্যন্ত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার পরিণাম চিরকাল[1] যা হয়েছে তাই হবে, প্রকৃতি কোনো সঙ্ঘকেই টিক্‌তে দেয়নি,—না বৌদ্ধ সঙ্ঘকে, না খ্রীষ্টান সঙ্ঘকে। এবং অন্নবস্ত্রের জন্যে যে নতুন সঙ্ঘটা প্রতি দেশেই নানা নাম দিয়ে শশীকলার মতো বাড়ছে সোশ্যালিজম্ তার শেষ অধ্যায় বটে, কিন্তু তার পরেও উপসংহার আছে। এবং সেউপসংহার তেমন মুখরোচক নয়।

প্রকৃতির প্রতি ইংরেজের দরদ এখনো লোপ পায়নি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাতি নাতনীকে দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার দু'ধারে গাছ রুইবার জন্যে সমিতি হয়েছে, উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপান্ত (Garden Suburb) রচিত হচ্ছে, পল্লীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার আন্দোলন তো কবে থেকে চ'লে আসছে, কিন্তু রেলগাড়িওয়ালা মোটরগাড়িওয়ালা ও নতুন বাড়িওয়ালাদের লুব্ধদৃষ্টির উপরে ঘোমটা টেনে দেওয়া পল্লীসুন্দরীর ক্ষমতার বাইরে।* দু'পাঁচজন অসমসাহসিক স্বপ্নদ্রষ্টা পল্লীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের নব সভ্যতাকে আবাহন করতে ব্যগ্র, কিন্তু হাটের কোলাহলে তাঁদের কণ্ঠস্বর বড়ই ক্ষীণ। পলিটিশিয়ানদের কাছে তাঁরা আমল পান না, কেননা পলিটিশিয়ানরা হয় বড় বড় কলকারখানাওয়ালাদের তাঁবেদার, নয় কলকারখানার শ্রমিকদের সর্দার। দুই দলের স্বার্থই আরো অধিক সংখ্যক কলকারখানা পাকা সড়ক নতুন বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বেকার সমস্যা দূর করবার জন্যে এরা যে যা হাতের কাছে পাচ্ছে তাই করতে উদ্‌গ্রীব,

---

* একটি সমিতির সেক্রেটারী লিখছেন: "আপনি কি জানেন যে আমাদের ফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই সমিতির প্রয়াস ও টাকা উভাবনে আপনি যোগ দেবেন?"

দশ বছর পরে তার ফলে দেশের চেহারাটা কেমন হবে তা ভাবতে গেলে ভোট পাওয়া যায় না, ক্ষুধিতের ক্ষুধাও বাড়তে থাকে। এমনই তো দেশটাতে জমি যত আছে রাস্তা তার বেশী, রাস্তা যত আছে বাড়ী তার বহুগুণ, আরো দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সারা ইংলণ্ডটা একটা বিরাট শহর, এবং এই শহরের লোক নিজেদের খাদ্য নিজেরা একেবারেই উৎপাদন করে না। বলা বাহুল্য সোশ্যালিস্টরা শহুরে শ্রমিকদের ভোটের উপর নির্ভর করে; গ্রাম্য কৃষকদের জন্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। কৃষকদের ভোট পাবার জন্যে অন্যান্য দলের এক-একটা কৃষি-পলিসি আছে বটে কিন্তু পলিটিসিয়ান জাতীয় প্রাণীদের কাছে দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা বৃথা, তারা তুবড়ির মতো হঠাৎ জলে হঠাৎ নেবে। তাদের জীবদ্দশা বড় জোর বছর পাঁচেক। সমগ্র দেশের নব সভ্যতার আবাহন করা তাদের কাজও নয় তাদের সাজেও না। তাদের একদল আরেক দলের জন্যে বসবার জায়গা রেখে যেতেই জানে, সমস্ত জাতিটার চলার ভাবনা তাদের অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না।

এখনকার ইংলণ্ডকে দেখে দুঃখিত হবার কারণ আছে। সে কারণ এ নয় যে ইংলণ্ডের নৌবহরকে আমেরিকার নৌবহর ছাড়িয়ে উঠছে, ইংলণ্ডের উপনিবেশরা পর হয়ে যাচ্ছে, ইংলণ্ডের অধীন দেশগুলি স্বাধীন হয়ে উঠছে, ইংলণ্ডের অন্তর্বিবাদে তার ধনবৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যের জন্য ইংলণ্ড কোনোদিন কেয়ার করেনি, যেমন ঐশ্বর্যের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশ কোনোদিন কেয়ার করেন নি। ইংলণ্ড একহাতে অর্জন করেছে অন্যহাতে উড়িয়ে দিয়েছে, একদিন যাদের ক্রীতদাস করেছে অন্যদিন তাদের মুক্ত ক'রে দিয়েছে, যেদিন আমেরিকা হারিয়েছে সেইদিন ভারতবর্ষ পেয়েছে পুরুষস্য ভাগ্যম্‌। আধিভৌতিক লাভক্ষতির কথা ইংলণ্ড এতদিন ভাবেনি, এইবার ভাবতে শুরু করেছে দেখে মনে হয় এবার আর তার সেই পুরাতন অন্যমনস্কতা নেই, এবার সে অক্ষমের মতো নিজের অক্ষমতার কথাই ভাবছে। ব্যাপার এই যে ইতিমধ্যে কবে একদিন উনবিংশ শতাব্দীতেই বোধ হয়—ইংলণ্ডের আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে কিংবা জীবন্মৃত হয়েছে। শেকসপীয়ার থেকে ব্রাউনিং পর্যন্ত এসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যে ইংরাজের

প্রাণ ছিল adventure বা বিপদ্‌বরণ, সে এখন মন্ত্র নিয়েছে, "Safety first"। যা-কিছু এককালে অর্জন করেছে তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ কর্‌তে চায়। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, বীর ছাড়া অন্য কেউ বসুন্ধরাকে ভোগ কর্‌তে পার্‌বে না, অর্থাৎ অর্জন করা ও ভোগ করা একসঙ্গে চলা চাই। বস্তুতঃ অর্জন করাটাই ভোগ করা। অর্জিত ধনকে ব'য়ে ব'সে ভোগ করা হচ্ছে সংসারের আইনে চুরি করা। এ আলস্যকে সংসার কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। যার মাইট্‌ নেই তার রাইট্‌ তামাদি হয়ে গেছে, যার হজম করবার ক্ষমতা নেই সে খেতে পাবে না।

কিছুকাল থেকে আধিভৌতিক ঐশ্বর্যের উপরে মন দেওয়া ছাড়া ইংলণ্ডের গত্যন্তর থাকেনি, কেননা মন দেবার মতো আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য তার কখন ফস্কে গেছে। আধিভৌতিক ঐশ্বর্য যায়-যায় দেখে তার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ধনকে যে মানুষ পরম কাম্য মনে ক'রে কোটিপতি হলো, সে যখন দেখে যে আরেকজন কেমন ক'রে দ্বিকোটিপতি হয়েছে তখন সে চোখে আঁধার দেখে, তার পা টল্‌তে থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে যখন ইতরলোকের ছেলের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি কর্‌তে যায় ও একটি অশ্লীল কথা বলতে গিয়ে দশটি শুনে আসে, তখন তার যে অবস্থা হয় ইংলণ্ডের অনেকটা সেই অবস্থা। ধনবলকে সে সকলের থেকে শ্রেয় মনে করেছিল, আজ ধনবলে সে প্রথম থাক্‌তে পার্‌ছে না। আমেরিকা তার চেয়ে বড় "Power" হয়ে "জগৎ গ্রাসিতে করেছে আশয়"। ইংলণ্ডের এই অপমান এখনো তার মর্মে বেঁধেনি, কিন্তু চামড়ায় বিঁধছে। বেশ একটু "inferiority complex"ও তার মধ্যে লক্ষ্য কর্‌ছি। ভারতবর্ষের মতো সেও বল্‌তে আরম্ভ করেছে, "আমি বড় গরীব, আমি গোবেচারা", কিন্তু সংসারের আইনে গরীব হওয়া হচ্ছে ফাঁসীর আসামী হওয়া। হয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে হবে, নয় আধিভৌতিক ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে হবে, অস্তিত্বের মূল্য দেবার জন্যে ধনী না হ'লে চলে না।

কেবল সূর্যের আলোর দ্বারা একটা দেশের কতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে তার সাক্ষী গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড। মাটি তেমনি আছে, মানুষ তেমনি আছে, সভ্যতার জগন্নাথের রথ তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে চলেছে; কিন্তু মেঘ-কুয়াশার কপাট যেই খুল্‌ল অমনি দেখা দিল সূর্যলোক চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোক। ইংলণ্ড ছাড়াও যে দেশ আছে, সমুদ্রের নজরবন্দী হয়ে মেঘ-কুয়াশার কারাগারে সে-কথা আমরা জানতুম না; এখন দেখা গেল আকাশজোড়া অমরাবতী। স্বর্গ আমাদের এত কাছে যে হাত বাড়ালে হাতে ঠেকে, কেবল হাতে বাড়ানোটাই শক্ত, কেননা হাত দিয়ে যে আমরা মাটি আঁকড়ে থাকতেই ব্যস্ত।

এমনি মধুর গ্রীষ্মকালে কেমন ক'রে মানুষের যুদ্ধে মতি হয় অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে ভাবি। শীতের অন্ধকারে শরীরটাকে গরম রাখ্‌বার জন্যে পরস্পরের শরীরে বেয়োনেটের চিমটি কাটা ও পরস্পরের মুখ দেখবার জন্য বারুদে আগুন ধরানো, এর অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু বসন্তকালে গ্রীষ্মকালে শরৎকালেও অংসিকের মতো যুদ্ধ করতে কেমন ক'রে ইউরোপের লোকের প্রবৃত্তি হলো? আকাশের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে দিনের পর দিন যায়, তবু তার রহস্যের কূল পাওয়া যায় না। সে আমাদের নিত্য বিস্ময়। পাখিগুলো যে কেন সারাবেলা গান গেয়ে মরে: এত ফুল যে কোন্ আনন্দে ফোটে, বন ও মাঠ দখল করেও রাজপথের বক্ষ ভেদ ক'রে ঘাস মাথা তোলে কেন, মোটরের দাপাদাপিকে অগ্রাহ্য ক'রে শামুক তার অবসরমতো ঘণ্টায় দশ ইঞ্চি অগ্রসর হয় কেন, এই অপরূপ শহরটাকে কেন এমন অপূর্ব দেখায়, কলকারখানার কলঙ্ক নিয়েও কেন ইংলণ্ড এখনো অম্লানযৌবনা—এসব ধাঁধার একমাত্র জবাব সূর্যের করুণা।

সূর্য অভয় দিয়ে বল্‌ছে, পৃথিবীকে তোমরা যত খুশি কুৎসিত যত খুশি দুঃখময় যত খুশি বিশৃঙ্খল করো না কেন আমি আছি তার সুখ-সৌন্দর্য-শৃঙ্খলার কুবের-ভাণ্ডারী, আমি তাকে সোনা ক'রে দেবো।

সূর্য আমাদের বিনামূল্যের বীমা-কোম্পানী। যখন যা হারায় তা গড়িয়ে দেয়। জীবন হারালেও জীবন ফিরিয়ে দেয়। সূর্যের assurance শুনতে পেয়ে তাই ফুল-পাখি-ঘাস-শামুকের মতো আমাদেরও প্রাণে ভরসা আসে, আমরা জীবনকে একটা কানাকড়ির চেয়ে মূল্যবান মনে করিনে, আমরা ওদেরি মতো নিরুদ্বেগে দিন কাটাই, অকারণে খুশি হই। ঐ যে সাদা প্রজাপতিটি, ওর জীবন একটা দিনের—কোথায় ওর মৃত্যুভয়, কোথায় ওর জীবনের মূল্য, কোথায় ওর অপ্রিয় কর্তব্য? খোলা আকাশের জানালা দিয়ে সভ্য মানুষের অর্থহীন হট্টগোল ও আর্তনাদ সুতো-ছেঁড়া ফানুসের মতো কোথায় উড়ে গেল।

এমন দিনে চোখ-কান-মন খোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়ে সুখ আছে। যাই দেখি তাই নতুন মনে হয়, আশ্চর্য মনে হয়। রাস্তার এক কোণে দুই বুড়ী ব'সে ফুল বেচ্‌ছে। অত ফুল তারা পেল কোথায়? সব ফুলের কি তারা নাম জানে, মর্ম বোঝে, যত্ন জানে? শাকসব্‌জীর হাটে নানা দেশের ফল পাতা জাহাজে ক'রে গাড়িতে ক'রে এসেছে। গাড়ি সেই মান্ধাতার আমলের টাট্টু ঘোড়ার গাড়ি, গাধার গাড়ি, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার গাড়োয়ান ছকচ্ছার শব্দ ক'রে চলেছে, তার হাঁটু থেকে পা অবধি একটা পাটের থলে কম্বলের কাজ করছে, তার অলক্ষিতে কখন একটা ছোঁড়া গাড়ির পেছন ধ'রে ঝুলে পড়েছে। হাটের কাছে অপেরাহাউস, রাত্রে Chaliapine অপেরায় নামবেন, সকাল থেকে লোক জমে গেছে; একখানা ক্যাম্বিসের চেয়ার ভাড়া ক'রে এক একজন বসে গেছে সন্ধ্যাবেলা কখন টিকিট-ঘর খুলবে তারি প্রতীক্ষায়; কেউ সঙ্গীতের স্বরলিপি নকল করছে; কেউ বই পড়্‌ছে; কেউ গল্প করছে; কেউ বা চেয়ারের উপর নিজের নামের কার্ড এঁটে দিয়ে আপিসে গেছে কিংবা বেড়াতে গেছে। কাছেই ড্রুরী লেনের থিয়েটার—কবেকার থিয়েটার—গ্যারিক্ ও সেরা সিডন্‌স্ একশো দেড়শো বছর আগের মানুষ। ইংলণ্ডের থিয়েটারগুলোর অধিকাংশই অত পুরানো নয় কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে বহু শতাব্দীর রুচি ও সাধনা রয়েছে—এক অভিনেতার থেকে আরেক অভিনেতায় সংক্রামিত লুপ্ত থিয়েটার থেকে চলিত থিয়েটারে হস্তান্তরিত। সেই জন্যে ইংলণ্ডের থিয়েটার এক একটা যুগে খুব উচুদরের না

হলেও কোনো যুগেই নীচুদরের হ'তে পারে না, আগে যুগের আদর্শ তাকে পাঁক থেকে টেনে তোলে। ফ্রান্সের থিয়েটার আরো পুরাতন—ফ্রান্স যতদিনের থিয়েটার ততদিনের। সে যেন জাতির ধমনী। তার স্বাস্থ্যনাশ জাতির স্বাস্থ্যনাশের সামিল। ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, মহাযুদ্ধের দিনেও ফ্রান্সের থিয়েটারে লোকারণ্য। ইংলণ্ডের থিয়েটার তার অতখানি নয়—ইংলণ্ডের ধমনী তার ক্রিকেট খেলার মাঠ তার ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

কাছেই হাইকোর্ট। হাইকোর্টটি যে কোনো ভারতবর্ষীয় হাইকোর্টের চেয়ে ছোট ও জনবিরল। ইংরেজের দেশের স্পেক্‌টাকুলার কিছুই নেই এক যুদ্ধ-জাহাজ ছাড়া। তাই ভারতবর্ষের লোক লণ্ডনে এসে বিষম ক্ষেপে যায়—এই তো দেশ, এই তো মানুষ, এই তো দৃশ্য, এই দেখ্‌তে এতদূর আসা! লণ্ডনের অর্ধেকের বেশী লোক অকথ্য বস্তির বাসিন্দা, মেফেয়ারের অদূরেই ওয়েস্ট-মিন্‌স্টারের বস্তি, পার্লামেন্টের প্রদীপ যেখানে জলছে সেইখানেই আঁধার। মেফেয়ারও এমন কিছু আহা-মরি নয়, আমাদের মালাবার হিল ওর থেকে ঢের বিলাসযোগ্য! ব্যাঙ্ক্‌ পাড়াতে বেড়াতে যাও—কল্‌কাতার ক্লাইভ স্ট্রীটের দোসর। টেম্‌স নদীর চেহারা তো জানোই—সিন্ধুপ্রদেশে বোধ করি ওর থেকে বড় বড় নালা আছে। লণ্ডনের বাগানগুলো দেখে একজন লাহোরবাসীর নাক সিঁট্‌কানো দেখবার মতো।' উত্তর ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মসজিদ ও দক্ষিণ ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির ইংলণ্ডের ক্যাথিড্রালগুলোকে হার মানায়। রাজবাড়ির তুলনা ভারতবর্ষে অন্ততঃ ছ'শো বার মিলবে, কেননা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা ক্ষমতায় যাই হোন জাঁকজমকে এক একটি চতুর্দশ লুই। পঞ্চম জর্জ তো তাঁদের তুলনায় একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষের লোক সাইট্‌সীয়ার হিসাবে ইংলণ্ডে এলে ঠকে যাবে। সিনেমা দেখাই যদি অভিপ্রায় হয় তবে দেশে সিনেমা স্থাপন কর্‌তে তো বেশী খরচ লাগে না। বিদ্যালাভের জন্যে যদি আসতে হয় তবে এত দেশ থাক্‌তে কেবল ইংলণ্ডে কেন? হাঁ, ব্যবসা করতে আসা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তা কর্‌তেও গোটা দুনিয়া প'ড়ে আছে।

তবু ভারতবর্ষের লোকের সব দেশের চেয়ে বেশী ক'রে ইংলণ্ডেই আসা উচিত। এবং সব দেশের লোকের চেয়ে ভারতবর্ষের লোকেরই ইংলণ্ডে আসা বেশী দরকার। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড চরিত্রের জগতে antipodes. ইংলণ্ডের যে গুণগুলি আছে ভারতবর্ষের সেই গুণগুলি নেই, ও ভারতবর্ষের যে গুণগুলি আছে ইংলণ্ডের সেই গুণগুলি নেই। এই এক কারণে এত দেশ থাকতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যোগাযোগ ঘটল। এবং এই এক কারণে স্বাধীন ভারতবর্ষকেও সাম্রাজ্যহীন ইংলণ্ডের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে। ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া কমবেশী ভারতবর্ষেরই মতো। তাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শেখবার আছে অনেক কিন্তু তাদের চরিত্র ভারতবর্ষের চরিত্রের সঙ্গে এত মিলে যায় যে তাদের চরিত্র থেকে ভারতবর্ষের আয়ত্ত করবার আছে অল্পই। অন্য কথায় তারা ভারতবর্ষের সগোত্র, তাদের সঙ্গে বিবাহ বড় বেশী ফল দেবে না। ইংলণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে ঘরে টানে, ইংলণ্ড সবাইকে পথে বার করে। ইংলণ্ড খোঁজায়, ভারতবর্ষ খোঁজার শেষ ব'লে দেয়। ইংলণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ব্রিটানিয়া নিষ্ঠুরা স্বামিনী,—তাকে খুশী করবার জন্যে প্রাণ হাতে ক'রে জাহাজ ভাসাতে হয়, রত্ন নিয়ে ফিরে আসা, নয় প্রাণ হারিয়ে দেওয়া, নয় উপনিবেশ গ'ড়ে ফিরে আসবার নাম না করা। ভারতবর্ষ করুণাময় ঋষি গৃহস্থ,—ক্রৌঞ্চ পাখিকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামীবর্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সে-ই তার স্নেহের অতিথি। একের চরিত্রের চিরবিপদ্-বরণ স্পৃহা অপরের চরিত্রের সহজ শান্তির সঙ্গে সমন্বিত হবে, এই অভিপ্রায় উভয়ের বিধাতার মনে ছিল। ইতিহাস তো একরাশ আকস্মিকতা নয়। আকাশের এক কোণে বাতাসের অভাব ঘটলে অন্য কোণ থেকে যেমন বাতাস ছুটে যায়, ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণতা দিতে ইংলণ্ড তেমনি ছুটে গেছে। অন্য দেশ যায়নি, কারণ অন্য দেশ ভারতবর্ষেরই মতো। অন্য দেশ গিয়ে-ফিরে এসেছে, কারণ অন্য দেশকে ভারতবর্ষের দরকার ছিল না।

এ-কথা ঠিক যে ফ্রান্স যদি ভারতবর্ষের হাত ধরত তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার মনের অমিল ঘটত না, যেমন ইংলণ্ডের সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু তা হলে

ভারতবর্ষের চরিত্র কোনো দিন পূর্ণতা পাবার সুযোগ পেত না। ফ্রান্স যে দেশে গেছে সে দেশকে ফ্রান্সে পরিণত করেছে, সে দেশকে বলেছে তোমরাও ফরাসী, তোমরাও স্বাধীন। এ বাণীর সম্মোহন কোনো দেশ এড়াতে পারেনি। ফ্রান্সের দখলে থাকলে আমরা কেউ কেউ ফ্রান্সের সেনাপতি হয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট বা সম্রাটও হ'তে পারতুম, যেমন কর্সিকাবাসী ইতালিয়ান বংশীয় নেপোলিয়ন একদিন হয়েছিলেন। কেবল নিজেকে ফরাসী ব'লে ঘোষণা করতে হতো, এই যা কষ্ট। ফরাসীরা অনেকটা মুসলমানদের মতো ডেমোক্রাটিক—তাদের দলে ভর্তি হওয়া খুব সোজা, এবং ভর্তি হ'লে আর পালাতে ইচ্ছা করে না। ভারতবর্ষের মুসলমান আরব দেশের মুসলমানের কাছ থেকে কী-ই বা পেয়েছে, শুধু নামটা ছাড়া। তবু সেই নামটাকে পাসপোর্ট ক'রে সে পৃথিবীর সব দেশে সমনামাদের প্রীতি পায়। ফরাসী নামটারও তেমনি মহিমা। এই নাম নিয়ে আমরা এত দিনে ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে লিখ্‌তুম "ফ্রেঞ্চ রেপাব্লিকের কয়েকটা জেলা"—যেমন আলসাস্‌ বা লোরেন তেমনি বাংলা বা আসাম।

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সবই আমরা পেতুম, ফ্রান্স্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতুম না। কিন্তু আমাদের কোনো বৈশিষ্ট্যকেই ফ্রান্স্‌ আমল দিত না, ফ্রান্সের লজিকপ্রিয় মগজ অসঙ্গতি সহ্য করতে পারে না। সম্ভবত ফরাসীরা আমাদের দেশে একটিও দেশীয় রাজ্য থাকতে দিত না, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা আঁকবার পক্ষে সোজা হতো। হিন্দুমুসলমান আইনের বদলে চালাত কোড্‌ নেপোলিয়ন। এক কথায় আমাদের ভারতীয়ত্বটুকু কেড়ে নিয়ে আমাদের দিত তার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ফরাসীত্ব।

কিন্তু গোড়ায় গলদ, ফ্রান্স্‌ কোন দিন ভারতবর্ষ নিতেই পারত না। কেননা ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষগুণ মোটের উপর আমাদের কাছাকাছি। ফরাসীরা গৃহপ্রিয়, দেশ ছেড়ে বেরুতেই চায় না, বড় জোর খিড়্‌কির কাছে আফ্রিকা পর্যন্ত ওদের গতিবিধি। ইন্দোচীন প্রভৃতি খুচরো উপনিবেশগুলোকে ধর্তব্য মনে করলে ফিজি প্রভৃতি জায়গায় আমাদের উপনিবেশকেও ধরতে হয়। গৃহপ্রিয় মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া করা, চক্রান্ত করা, দল্ভি

করা ও পাশাপাশি থাকা। ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভায় যতগুলো চেয়ার ততগুলো দল। ফ্রান্সের সাহিত্যরাজ্যেও যতগুলি লেখক ততগুলি পত্রিকা, যতগুলি পত্রিকা ততগুলি দল। কোনো একটা দলের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে লেখককে লোকে অজ্ঞাতকুলশীল ভেবে খাতিরই করতে চায় না। ফ্রান্স পরিবারপ্রধান দেশ। পরিবারের সঙ্গে জড়িত না হ'লে পরিবারের ভার মাথায় না নিলে ব্যক্তিকে সে ব্যক্তিই মনে করে না। ইংলণ্ড ব্যক্তিকে চ'রে বেড়াবার পক্ষে যথেষ্ট মুক্তি দিয়েছে, John Bull ষাঁড়ই বটে, তার পারিবারিক দায়িত্ব সামান্য। তাই ইংরাজের ব্যক্তিত্ব একলা মানুষের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ষাঁড়েরও গোষ্ঠ থাকে, বৃহৎ গোষ্ঠ। ইংরাজের বৃহৎ ক্লাব বৃহৎ পার্টি। বৃহৎ পার্টির একজন না হ'লে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এদেশে নগণ্য এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অক্রিয়। এদেশের মাটিতে আকাশকুসুম যদি না জন্মায় তবে সে নেহাৎ আগাছা, তাকে উপড়ে ফেলবার আগেই সে মানে মানে সরে পড়ে। Shelley ইতালী প্রয়াণ করলেন।

ইংলণ্ডের চরিত্রের আরেকটা গুণ, তার চরিত্র মুহুর্মুহু বদলায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরাজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরাজকে দেখলে প্রপৌত্র ব'লে চিনতে পারবে না, এরা আরেক জাতি। তিন পুরুষের ব্যবধানে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘ'টে গেছে। কিন্তু চাকার তলার দিকটা কখন উপরের দিক হয় চাকা তা জানে না, চাকা ঘুরতেই ব্যাপৃত। প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বিপ্লব চলছে : চোখে পড়ে না এই জন্যে যে চোখও বিপ্লবের অঙ্গ। Galsworthyর নতুন নাটক "Exiled"এ নীচের ধাপের লোক উপরের ধাপে উঠল, Galsworthy একে ঠাট্টা করে বললেন, "evolutionary process" এবং যারা নবাগতের ধাক্কা খেয়ে উপরের ধাপ থেকে পা পিছলে পড়ল তাদের জন্যে দুঃখ করলেন। কিন্তু তারাও তো "evolutionary process"-এরই কল্যাণে ভুঁই ফুঁড়ে উপরে উঠেছিল। এখনকার ভুঁইফোড়রাও পঞ্চাশ বছর পরে উপরের ধাপ থেকে "exiled" হবে। তা ব'লে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, ইংলণ্ড যতই বদলাক ইংলণ্ডই থাকবে, চাকা যতই ঘুরুক চাকাই থাকবে। পুরাতনকে ইংলণ্ড সমীহ করে, কিন্তু নির্বাসিতও করে. য়ারিস্টক্রাটের

প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা, কিন্তু পালা ক'রে সবাইকে সে একই গদিতে বসাবে ব'লে কাউকেই দীর্ঘকাল গদিয়ান্ হতে দেয় না। পর্বতের চূড়ায় যে-ই ওঠে সে-ই টাল সাম্‌লাতে না পেরে আছাড় খায়, অথচ যে দেশের সমাজের গড়ন পার্বত্য সে দেশে কতকগুলো লোককে চূড়ায় চড়ে চূড়াচ্যুত হতেই হবে। অধিকাংশ য়্যারিস্টক্র্যাটেরই বংশলোপ হয়, সুতরাং কষ্ট ক'রে তাদের মাথা কাটতে হয় না। স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ বাড়াতে গিয়ে অতিমাত্রায় জন্মশাসন, তার ফলে বংশলোপ। উচ্চতর মধ্যবিত্তরাও জন্মশাসনপূর্বক নিজেদের সংখ্যা কমাতে লেগেছে, তার ফলে নিম্নতর মধ্যবিত্তরা উচ্চতর মধ্যবিত্ত হয়ে উঠ্‌ছে। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের পরিবারে আজকাল তিন-চারটির বেশী সন্তান দেখতে পাওয়া ভার। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর লোক ক্রমশ নিম্নতর মধ্যবিত্ত হয়ে উঠ্‌ছে। এই হলো "evolutionary process." এটা ইংলণ্ডের একটা মস্ত উদ্ভাবন। এতে শ্রেণীবিশেষের লাভ-লোকসান হতে পারে, সমস্ত দেশটার লাভ-লোকসান কিছুমাত্র নেই। পরিবর্তন বিনা কোনো জীবন্ত দেশের জীবন থাকে না, অতএব দু-তিন পুরুষ অন্তর মাথা কাটাকাটি না ক'রে প্রতি পুরুষেই একের নির্বাসন ও অপরের রাজ্যপ্রাপ্তি ভালো, না, মন্দ? এতে জাতির চরিত্রটাতেও মরচে ধরে না, নতুন গুণাবলী পুরোনো গুণাবলীকে মুছে সাফ ক'রে দেয়। পুরোনো য়্যারিস্টক্র্যাসীর সঙ্গে তুলনা কর্‌লে নতুন য়্যারিস্টক্র্যাসীর কোনো গুণ দেখতে পাও না কি? ভুঁইফোড় ব'লে ঠাট্টা যদি করো তবে ভুঁইফোড়ের ভিতরকার সত্যকে হারাবে। দুটোকে যে একসঙ্গে বাহাল করেনি এর কারণ ইংলণ্ড একসঙ্গে দুটো সত্যকে সইতে পারে না। ইংলণ্ডের পাকশাস্ত্রে পাঁচমিশেলি নেই। মাছমাংসের সঙ্গে আমরা আলু-কপি মিশিয়ে রাঁধি, এ-কথা শুনে এক-জন থ' হয়ে গেলেন। "তা হ'লে তোমরা মাছের কিংবা মাংসের কিংবা আলুর কিংবা কপির বিশেষ স্বাদটি পাও কী ক'রে?" এর জবাব—"তা পাইনে। কিন্তু সমস্তটার সমন্বয়ের স্বাদটি পাই।"

বিপ্লবকে ইংলণ্ড ঠেকিয়ে রাখে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে ঘটতে দিয়ে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর রেভল্যুশন যেমন প্রতিদিনের ব্যাপার অথচ কোনোদিন

আমরা খবর পাইনে যে আমরাও সেই রেভলুশনের ব্যাপারী, ইংলণ্ডেও তেমনি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক রেভলুশন নিত্যকারের ঘটনা ব'লে কোনো ইংরেজ টের পায় না কত বড় ঘটনায় সে লিপ্ত। টের পেলে সে ঘটতে দেবে না, সেইজন্যে বিপ্লবটাকে কিস্তিবন্দী ভাবে ঘটাতে হয়। য়্যারিস্টক্র্যাটের হাত থেকে শ্রমিকের হাতে শাসনভার আসতে দু'শো বছর লেগেছে, স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন অন্তত একশো বছরের ; দেড়শো বছর ধ'রে আক্রমণ ক'রেও টাট্টু-ঘোড়ার গাড়িকে এখনো খারেজ করতে পারা যায়নি, চরকা এখনো কোনো ঘরে ঘর্ ঘর্ করছে ; এবং এমন লোক এখনো অনেক আছে যারা "immaculate conception" প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস হারায়নি। তথাচ ইংলণ্ড কোনোদিন চুপ ক'রে ব'সে নেই ; সে প্রতিদিন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, প্রতিদিন পুরোনো গহনাকে ভেঙে নতুন ফ্যাশানে গড়িয়ে নিচ্ছে। ইংলণ্ডের মন সংস্কারকের মন। পলিটিক্সের মতো সব বিষয়েই ইংলণ্ডে একটা চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ (permanent opposition) আছে—ইংরেজ মাত্রেই কোনো না কোনো বিষয়ে একজন বিদ্রোহী। আবহমানকাল ইংরেজ মাত্রেই ব'লে আসছে—"This State of things must not continue." আমাদের বুলির সঙ্গে এ বুলির কত না তফাৎ। আরো ভাববার কথা, এ বুলি আবহমান-কালের ও প্রতিজনের। "Something must be done"—এই হলো এ বুলির উপসংহার। একটা নমুনা দিই। সার্কাস ইংলণ্ডে নেই বললেও হয়। তবু সার্কাসে বাঘহাতী প্রভৃতি বন্যজীবকে নাচানো অনেকের চোখে নিষ্ঠুর ঠেকে। এখনো ইংলণ্ডের কোনো কোনো জায়গায় খরগোশ-শিকার পাখি-শিকার চলে, সেটাও নিষ্ঠুর কাজ। খুনীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া তো রীতিমতো বর্বরতা। এইসব বন্ধ করবার জন্যে পার্লামেন্টকে আবেদন করা চলেছে। এই ধরনের আবেদন প্রতিবছর পার্লামেন্টে পৌঁছয়। Vivisection-এর বিরুদ্ধে লোকমত গড়া বহুকাল থেকে চ'লে আসছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এই সব ছোটখাটো সংস্কার অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অবসর সময়ের উদ্যোগিতার ফল—মহাত্মা গান্ধীর মতো অসাধারণ লোকের সারা সময়ের কাজ নয়। সমাজ রাষ্ট্রের এক

একটা চক্রাংশ যদি প্রত্যেকে ঘোরায় তবে সমস্ত চাকাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘোরে, সমাজ-রাষ্ট্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে বদলে যায়, অধ্যবসায়ীর পক্ষে জীবিতকালেই চক্র-পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা শক্ত হয় না। প্রত্যেক ইংরেজ মরণকালে এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, আমি কিছু না কিছু ঘটিয়েছি। অবশ্য খুব বেশী নয়, খুব অসাধারণ নয়, তবু কিছু—আমাদের দেশেও যদি সবাই সামান্য ক'রেও কিছু কর্‌ত—তবে আমাদের অসাধারণ মানুষগুলিকে অহরহ চরকার মতো ঘুর্‌তে হ'ত না এবং আমাদের সাধারণ মানুষগুলি কর্‌বার মতো কত কাজ প'ড়ে রয়েছে দেখে "কোন্‌টা করি, কোন্‌টা করি" ভাব্‌তে ভাবতে জীবন ভোর ক'রে দিত না, কিংবা একসঙ্গে সব ক'টাতে হাত দিয়ে সব ক'টা মাটি কর্‌ত না, কিংবা হাজার বছরের আলস্যের হাজারটা নোঙরকে এক বিপ্লবের ঝড়ে বিপর্যস্ত কর্‌বার দিবাস্বপ্ন দেখত না। Eternal vigilance-এর বদলে দুটো দিনের খুনোখুনি খুব স্পেক্‌টাকুলার বটে, কিন্তু দুটো দিনই তার পরমায়ু।

১৮

সেদিন যে জেনারেল ইলেক্‌শন হয়ে গেল সেটা সম্ভবত ইতিহাসের বিষয়; কিন্তু এত নিঃশব্দে ঘট্‌ল যে আমাদের কারুর বিয়েতেও ওর বেশী ধুমধাম হয়। শুন্‌লুম লণ্ডনে না হ'লেও মফঃস্বলে বেশ ধুমধাম হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাত্রীর পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ ক'রে দিই—"আমি লেবারকেই ভোট দিলুম, কারণ প্রথমত আমি সোশ্যালিস্ট, দ্বিতীয়ত আমাদের এ অঞ্চলে নির্বাচনটা যাদের নিয়ে তাদের একজনের ছিল যৌবন, মগজ ও উৎসাহ, অন্যজনের জরা, জেদ ও অসামর্থ্য। তবু কিন্তু খুবই আশ্চর্য হলুম শুনে যে H—নির্বাচিত হয়েছেন; কেননা এই অঞ্চলটা সেই থেকেই কন্‌জারভেটিভদের একচেটে হয়ে এসেছে যেদিন নোআ তাঁর আর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। মাত্র গোটা কয়েক ভোটের আধিক্যে H—জিতে গেলেন। আমার ঘরের কাছেই একটা নির্বাচনস্থলী। শুক্রবারের রাত্রি পৌনে তিনটের সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় যারা ফলাফল জান্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল তাদের অতি উদ্দাম আনন্দধ্বনি

শুনে। যেই আমার চেতনা ফিরল চটি পায়ে দিলুম ও ড্রেসিং গাউন্ গায়ে দিলুম, আর দৌড়ে গিয়ে ঢুকলুম মায়ের ঘরে—সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। মা'কে বিরক্ত ক'রে জানালা খুললুম, মাথা বাড়িয়ে দিলুম, একজন অচেনা পথিককে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে জিতল?' খবরটা শুনে পরম উল্লাসে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।"*

মোটের উপর ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগল। মাসখানেক আগে এখানে ওখানে বক্তৃতা চল্‌ছিল, ঘরে ঘরে নির্বাচনপ্রার্থীদের বিজ্ঞাপন ঝুলছিল, এবং কাগজে কলমে খুবই বাগ বর্ষণ হচ্ছিল। কার কোন পক্ষে ভোট তা এক রকম জানাই ছিল, এক ফ্ল্যাপারদের ছাড়া। যেই মন্ত্রীদল গঠন করুক জনসাধারণের বড় বেশী যায় আসে না, রাষ্ট্র যেমন চল্‌ছিল তেমনি চলে। দোকান বাজার থিয়েটার সিনেমা ডাকঘর রেল—কোথাও কোনো পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয়। আমার ঘরের কাছে যে সব মজুর কাজ কর্‌ছে তাদের একজন গান ধরেছে—কাবুলীতে গান গায় ("শ্রীকান্ত") সেও যেমন অবিশ্বাস্য, ইংরেজেতে গান গায় এও তেমনি অপূর্ব। আমরাই এবার দেশের হর্তাকর্তা, আমাদের র‍্যাম্‌জে সর্দারকে রাজা দেশের সর্দার করেছেন, এই ভেবে তার যদি গান পেয়ে থাকে তবে ধন্য বল্‌তে হবে। নইলে এমন সুন্দর মেঘ ও রৌদ্রের খেলার দিনটাতে কি কেবল পাখীই গান গাইত, মানুষ তার পাল্টা গাইত না?

ইংরেজ মজুর শ্রেণীর লোকেরা খুব শিষ্ট—তারা হল্লা কর্‌তে দাঙ্গা কর্‌তে শান্তিভঙ্গ কর্‌তে জানে না। তবে চিরদিন যে তারা এত সুবোধ বালক ছিল ইতিহাস কিংবা জনশ্রুতিতে ও-কথা বলে না। ক্রমে ক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ হবার পর থেকে ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার করবার পর থেকে তারাই হয়েছে দেশের সবচেয়ে আইন-মানা সম্প্রদায়। আইনের প্রতি অনাস্থা যদি কেউ দেখায় তো সে বড়লোক, মোটরওয়ালা কিংবা নাইট্‌ক্লাবওয়ালী। মোটের উপর ইংরেজ মাত্রেই অত্যন্ত আইন-বশ। পুলিসকে বাধা দেবার কথা

* H-টি হচ্ছে আর্থার খুড়োর এক ছেলে—খুড়োর আরেক ছেলে আরেক জায়গায় জিতেছেন। খুড়োর নাম তো জানে বিশ্বের সব জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি বলব না।

তো কেউ ভাবতেই পারে না, পুলিসকে সাহায্য করবার জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। এদিকে পুলিসের উপরে খবরের কাগজওয়ালাদের কড়া নজর থাকায় পুলিসও যারপরনাই ভদ্র হয়ে উঠেছে। আগে এতটা ছিল না, তার প্রমাণ আছে। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। ইংলণ্ড দেশটি ছোট ও সব ক'টি ইংরেজ রক্তসম্বন্ধে এক হওয়ায় আইন অমান্য করতেও মানুষের সহজে প্রবৃত্তি হয় না, হ'লেও তেমন মানুষের সঙ্গী জোটে না, ধরা পড়াও তার পক্ষে সোজা। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা ইংলণ্ডে ক্রাইম্ ক'মে আসছে। দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতা—এ দুটোকে আমাদের দেশে ক্রাইম্ বলে না, এ দুটোর বিচার করতে এদের আদালতের অনেক সময় যায়। দ্বি-বিবাহ বেশ বাড়ছে ব'লেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে লোকমত হু হু ক'রে বদলাচ্ছে বলতে হবে। কেননা দ্বি-বিবাহকারীকে বিচারক নামমাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এক শর্তে যে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না ও প্রথম স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। যে দেশে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষ-সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী সে দেশে এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভালো। দুয়ো সুয়ো দুটিকে নিয়ে একসঙ্গে ঘরকরাটা নিতান্ত প্রাচ্য প্রথা, তাতে পাশ্চাত্যদের সংস্কারে বাধে।

ইংরেজদের সমাজে আইন যা আমাদের সমাজে আচার তাই। অথচ আইন সম্বন্ধে ইংরেজেরা প্রতিদিনই বলাবলি করছে যে "অমুক আইনটা এত অযৌক্তিক যে সবাই ঐ আইন ভাঙছে আর পুলিস নিজেও যখন বোঝে ওটা অযৌক্তিক তখন অপরাধটা দেখেও দেখছে না! এমনি ক'রে একটা আইন ভাঙতে ভাঙতে আর সব আইন ভাঙতে মানুষ প্রশ্রয় পাচ্ছে। অতএব অমুক আইনটা বদলানো দরকার, তুলে দেওয়া দরকার।" আচার সম্বন্ধে আমরাও যদি প্রতিদিন এমনি বলাবলি করতুম তবে আচারমাত্রের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত ঔদাস্য এবং অশিক্ষিত সাধারণের একান্ত আসক্তি দেখা যেত না। ইংরেজ সমাজের মাথা হচ্ছে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট।* নিকটে যে আমাদের দেশে

* কেউ তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কিনা, শ্যালীকন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কিনা পার্লামেণ্ট এ সম্বন্ধে বিধান দেয়। আগে ছিল চার্চের এলাকা, এখন চার্চের অধীনে আদালত নেই।

পার্লামেণ্ট জাতীয় কিছু গ'ড়ে উঠবে ও আমাদের অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত শাসন করবে এমন আশা করা শক্ত। হিন্দুসভা যদি রাজনৈতিক না হয়ে সামাজিক হয়ে থাকত তবে হয়তো রবীন্দ্রনাথের :স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা তারই মধ্যে মূর্তি পেত। আগে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতের নিজস্ব আচার নিয়ামক সভা ছিল এখন সমগ্র হিন্দু সমাজের তেমনি কোনো সভা কেন হয় না, যে-সভায় প্রত্যেক জাতের প্রতিনিধি ব'সে সকল জাতের সাধারণ আচার নির্দেশ করবেন? এই সভার অধীনে সামাজিক আদালত থাকে না কেন, যে আদালতে অনাচারের প্রতিকার হয়? গ্রাম্য স্থবিরদের অত্যাচার থেকে সমাজকে উদ্ধার ক'রে ন্যায়সঙ্গত আচারের প্রতি মানুষকে সশ্রদ্ধ করতে হলে এছাড়া অন্য উপায় কী?

ভারতীয় চরিত্রের মূলকথা যেমন সমন্বয় ইংরেজ চরিত্রের মূলকথা বিনিময়। ইংরেজ কঞ্জুস নয়, কিন্তু হিসাবী। একটা পেনীরও হিসাব রাখে—নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে নিলে নিজের স্ত্রীকে ফেরত দেয়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হওয়া ইংরেজের পক্ষে অসম্ভব, তার খাদ্য আনতে হয় বিদেশ থেকে বিদেশকে দিয়ে আসতে হয় পরিধেয় বা অন্য কিছু। এমন ক'রে তার বিনিময়বোধ পাকা হয়েছে, বণিকসুলভ বৃত্তিগুলি পোক্ত হয়েছে। ফরাসী দোকানদার ও ইংরেজ দোকানদার দুইয়ের তুলনা করলে দেখা যায় ইংরেজ দোকানদার কঞ্জুস নয়, ঠকায়ও না, ভদ্রও, কিন্তু দোকানদারের বেশী নয়, মানুষ নয়। ফরাসী দোকানদার দোষে গুণে উল্টো। ইংরেজকে নেপোলিয়ন দোকানদার ব'লে সেই যে প্রশংসাপত্রটা দিয়েছিলেন সেটার মর্ম এ নয় যে ইংরেজ ঠকায়, সেটার মর্ম ইংরেজ বিনিময়শীল। গ্রাহককে খুশি করতে ইংরেজ দোকানদার প্রাণপণ করে, কিন্তু দেনা-পাওনা ভোলে না, আত্মীয়তা করে না। আত্মীয়তার জন্যে ক্লাব আছে, খেলা-ক্ষেত্র আছে। দোকানে শুধু প্রয়োজন বিনিময়। আমার ঘরের অনতিদূরে স্বামী-স্ত্রীর দুটো আলাদা দোকান, দুই আলাদা তহবিল, একজনের কাছে আরেকজন সওদা করলে তক্ষুনি বিল্ দেয়। এদের দেশে একান্নবর্তী পরিবার কেন গড়ে উঠল না? পরিবারও কেন ভেঙে গেল? যে কারণে বার্টার থেকে আধুনিক

একসঙ্গেই অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই কারণে স্বামী স্ত্রীর দুই উপার্জন দুই তহবিল হয়েছে। সন্তানের জন্যে দু'পক্ষ চাঁদা দেবে, কথা চলছে। তারপর সন্তানরা ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করলে মা-বাবার কাছ থেকে মাইনে পাবে এমন কথাও শোনা যায়। এক কথায়, যার যতটুকু যোগ্যতা সেটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এবং দু'পক্ষের যোগ্যতার ভগ্নাংশ টাকার মধ্যস্থতায় বিনিময় করতে হবে। আমরা ওটা হৃদয়ের মধ্যস্থতায় ক'রে থাকি ব'লে আমরা এখনো বার্টারের যুগে আছি, আমরা "সভ্য" হয়ে উঠিনি। সভ্যতার লক্ষণ ভগ্নাংশ-ভাগ চুলচেরা বিচার। অতি সূক্ষ্ম ন্যায়। এদেশের ভিক্ষুক যে দেশলাই বেচ্-বার ভান ক'রে পয়সা চায় এও বিনিময়শীলতার বিকার। কিছু না দিয়ে শুধু নিলে পুলিস ধ'রে নিয়ে যায়—ওটা একটা ক্রাইম। আইনের চোখে ভিখারী হচ্ছে আসামী!

জগতের অন্তত একটা জাতির এই গুণটি চরিত্রগত হওয়ায় জগতের অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও কত লাভ হয়েছে ভাবীকাল তা খতিয়ে দেখ্‌বেই। ইংরেজ যতগুলো দেশকে শোষণ ও শাসন করেছে ততোগুলো দেশকে এক সূত্রেও বেঁধেছে, ঐক্য দিয়েছে। মৌমাছি যেমন ফুলেদের মধু নেয় তেমনি মিলন ঘটায়। মধুটা ঘটকালির মজুরী। তা'ছাড়া, মৌমাছিরও তো অন্নদায় আছে। ফুলেরা চাঁদা ক'রে তাকে না খেতে দিলে সে বাঁচে কী ক'রে?

নানা কারণে ইংরেজ এখনো বহুকাল বাঁচ্‌বে। প্রথমত মৌমাছির কাজ এখনো শেষ হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক প্রকার লীগ্ অব্ নেশন্‌সই বটে। নতুন লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ যতদিন না শৈশব অতিক্রম ক'রে আন্তর্জাতিক ঘটকালির দায়িত্ব নেয় ততদিন সে দায়িত্ব ব্রিটিশ্ ফ্রেঞ্চ্ ও ডাচ্ লীগ্ অব্ নেশন্-গুলোরই থাকবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজী ভাষা ক্রমশ সার্বভৌম ভাষা হয়ে ওঠায় পৃথিবীর সবাইকেই ইংলণ্ডে এসে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ ক'রে যেতে হবে কিংবা ইংলণ্ড থেকে লোক নিয়ে নিজের দেশে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। কিছুকাল আগে যখন ফরাসী ছিল বিশ্বভাষা তখন বিশ্ব ছিল ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত। এখন বিশ্বের সীমানা বেড়েছে—এখন কাশ্মীর সঙ্গে কাশ্মীরকে

কথা কইতে হবে ইংরেজীতে। "Talkies"এর দৌরাত্ম্যে ইংরেজী ভাষার ছিরি যেমনি হোক, প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ভাষাশিক্ষা-রাজধানী প্যারিস থেকে উঠে এসে লণ্ডনের চতুষ্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হলো ব'লে। এদিকে কিন্তু বিশ্বের বাণিজ্যরাজধানী নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিল ও যন্ত্র-শিল্পরাজধানী বার্লিনে। বার্লিন এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। তার লোকসংখ্যা বিয়াল্লিশ লাখ। একা বার্লিন শহরেই একশ তেরটা মাটির উপরের রেল স্টেশন ও একাত্তরটা মাটির নীচের রেল স্টেশন আছে।* এরোপ্লেনের রাস্তা আছে আঠারোটা (গ্রীষ্মকালে), ও সাতটা (শীতকালে)। এখন থেকে প্যারিস হবে কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদ-রাজধানী। এবং জেনেভা রাজনীতি রাজধানী।

বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো—এক দেশের অভিজ্ঞতা আরেক দেশে পৌঁছে দেওয়া ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের কাজ। সেই সূত্রে অষ্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগে, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ঈজিপ্টের। ইংরেজ জাতিকে বিধাতা ঘরছাড়া ক'রে সৃষ্টি করেছেন, এরা চ'রে বেড়ায়, খুঁটিতে বাঁধা থেকে জাবর কাট্‌তে জানে না। এই কারণে ইংরেজের সেই সব কোমল বৃত্তিগুলি নেই যা আমাদের আছে,(অনেকটা) ফরাসীদের আছে। কোলের ছেলেকে ভারতবর্ষ থেকে কিংবা হংকং থেকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়, বয়স্ক ছেলের বিয়ের পরে এক শহরে থেকেও কদাচ দেখ্‌তে আসে—এমন মা-বাবা একমাত্র ইংলণ্ডেই সম্ভব। আমাদের যেমন মামা-মামী মাসী-মেসো কাকা-কাকী ও পিসে-পিসীতে ঘরসংসার জমজমাট, এদের তেমন নয়; গার্হস্থ্য বৃত্তিগুলি এদের ভোঁতা। হৃদয়কে চরিতার্থতা দিলে কাজ নষ্ট হয় যে! বিউটির চেয়ে ডিউটিকে ইংরেজ বড় ব'লে মানে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রেমের কবিতা ইংরেজী ভাষায় যত ও যত রকম ও যত গভীর অন্য কোনো ভাষায় তত নয়। এক চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো বাঙালী কবি কোনো দিন সর্বস্ব পণ ক'রে ভালোও বাসেননি, ভালোবাসার কবিতাও

* এ ছাড়া আধা-উপরে আধা-নীচের রেল স্টেশন উনচল্লিশটা।

লেখেননি। গল্পকবিদের মধ্যে শরৎ চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজীতে প্রেমিক কবির সংখ্যা হয় না। দ্বিতীয়ত, love কথাটার সংজ্ঞা কী তা কোনো ইংরেজ জানে না, তবু বিবাহ করবার আগে loveএ পড়তে হবে এ কথা অন্য কোনো সমাজ এতটা জোরের সঙ্গে বলেছে ব'লে আমার মনে হয় না। আমাদের সমাজে ওটা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ—আমাদের বিবাহ ব্রহ্মচর্যের পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবার তোরণ। ধর্মের পরে কাম, তার আগে নয়। ফরাসীরা যদিও প্রেমের নামে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে ও আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরদের মতো সহস্রবিধ প্রেমের লক্ষণ আওড়ায়, তবু ও-প্রেম মস্তিষ্কজাত (cerebral) ও বচন-বহুল। ওরা মাথা দিয়ে অনুভব করে ও কথা দিয়ে তন্ন তন্ন করে; কিন্তু বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের বোবা আকুতি ইংরেজরাই বোঝে। Love-making ও love এক জিনিস নয়। প্রথমটার চর্চা প্যারিসের একচেটে হ'তে পারে, কেননা প্যারিসের লোকের হাতে কাজ নেই, দ্বিতীয়টা ইংরেজের মতো অত্যন্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল-প্রকৃতি কাজের মানুষদের জীবনে অপ্রত্যাশিত রূপে এসে বহু বৎসরের কাজ একদিনে নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়।

১৯

ইউরোপের শরৎকাল। পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। এই তো সেদিন বসন্ত এলো সবুজ পাতার পোশাক পরে, যেন কোনো ফ্যান্সি ড্রেস-পরা নাচের অতিথি। এরি মধ্যে রঙ্গ শেষ হয়েএলো, বাতিনিবু-নিবু, সভা ভাঙে-ভাঙে। এর পরে পোশাক খুলে ফেলে বিছানায় গা মেলে দিতে হবে। এও এক উদ্যোগ-পর্ব।

আমাদের দেশে শীতের জন্যে প্রস্তুত হবার কাল হেমন্ত। শরৎ আমাদের দেশে শীতের অগ্রদূত নয়, আমাদের শরৎ স্বাধীন। আমরা শরতের মুখ চেয়ে দিন গুনি; শরৎ আসছে শুনে তার আগমনী গাই; শরৎ চলে গেলে কাঁদি ও কাঁপি। কিন্তু এদের শরৎ যৌবনের শেষের দিকে প্রথম পাকা চুলটির মতো অনাহুত আগন্তুক, আনন্দের নয় আতঙ্কের পাত্র। এর পিঠ্ পিঠ্ শীত আসবেন। তিনি যেমন তেমন অতিথি নন্, স্বয়ং দুর্বাসা। তাঁর অভিশাপে গুটিকয়েক

evergreen জাতীয় তরু ছাড়া সকল তরু-তরুণীর পত্রসজ্জা নিঃশেষে খসে পড়বে ; তারা লজ্জায় কাঠ হয়ে রইবে।

ইংলণ্ড থেকে থুরিঙ্গিয়ায় এসেছি ; গ্যয়টে শিলার বাখ-এর থুরিঙ্গিয়া বনরাজিনীলা। অঞ্চলটি বিরলবসতি নয়, গ্রামে গ্রামে কারখানায় চিমনী কর্মব্যস্ততার প্রমাণ দিচ্ছে। তবু অঞ্চলটির হাতে অফুরন্ত ছুটি। এতে যেন আকাশের অংশ আছে, আকাশের ব্যাপ্তি। প্রাচীন তপোবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তার সঙ্গে থুরিঙ্গিয়ার এই মাটির আকাশটিকে বেশ মানায়। বনের দ্বারা আকাশ ঢাকা পড়বে না, যদি পড়ে তো তপোবনে ও রাজনগরীতে প্রভেদ কোথায় ? মানবাত্মার সহজ মুক্তিটিকে রাত্রিদিন উপলব্ধি করবার জন্যেই তপোবন। তপোবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ দশদিকব্যাপী স্পেস !

থুরিঙ্গিয়ার হাওয়া সমুদ্রবক্ষের হাওয়ার মতো যুক্ত এবং মুক্তির স্বাদে স্বাদু। ইচ্ছা করে সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে শোষণ করি। শহরে থেকে বাতাস আমরা আধপেটা খাই, আমাদের ক্ষুধা মেটে না। লণ্ডনের মতো শহরে নাক বুঁজেই থাকতে হয়, অভ্যাসের দোষে পার্কের বাতাসও গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বয়ং পঞ্চম জর্জেরও সাধ্য নাই যে লণ্ডনের জল হাওয়া বৃষ্টি কুয়াশার অতীত হন্। অথচ থুরিঙ্গিয়ার চাষীরাও তাঁর তুলনায় ভাগ্যবান।

গ্যয়টের যুগে থুরিঙ্গিয়া আরো বন্য আরো বিজন ছিল, সন্দেহ নেই। তাঁর কর্মস্থল ভাইমার এত ছোট যে প্রায় পল্লীবিশেষ, তখনকার দিনে নিশ্চয়ই ছিল অরণ্য পল্লী। একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীও আছে তাতে। গ্যয়টের দরবারী মনকে অরণ্য সর্বদাই ডাক দিত, তাঁর বাগানবাড়িটি অরণ্যেরই অন্তর্গত একটি কুটির। দরবার থেকে ছুটি নিয়ে সেইখানে তিনি প্রস্থান করতেন। সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করেও যে তিনি মুক্তপুরুষ ছিলেন, অন্তত মুমুক্ষু পুরুষ ছিলেন, তার কারণ তিনি কেবল নাগরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরণ্যকও। গ্যয়টের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে সমন্বয়,—অন্তত যে সমন্বয়প্রয়াস দেখি, সে এমনি করেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি য়্যারিস্টক্র্যাট্ তো ছিলেনই অধিকন্তু প্রকৃতির খুব কাছে কাছে ছিলেন, অন্তত থাকবার জন্যে

প্রাণপণ করেছিলেন।* আমি এতবার "অন্তত" কথাটা ব্যবহার করলুম, তার কারণ সকলের মতো আমার ধারণা গ্যয়টের ভিতরটায় দু'বেলা কুরুক্ষেত্র চলত, সত্য অসত্যে অষ্টপ্রহর সংগ্রাম। তবু আমার বিশ্বাস তাঁর মধ্যে একটি সহজ সর্বজ্ঞতাও ছিল। তিনি ছিলেন অন্তরে ঘটতে থাকা দ্বন্দ্বের অতীত (above the battle)। মহামানবের মতো মহামানবের এই কবিও ছিলেন স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না, নিছক দ্রষ্টা—বিশ্বরূপদ্রষ্টা। গ্যয়টের যতগুলি প্রতিকৃতি আমি দেখেছি সেগুলিতে তাঁর চক্ষু আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর সকল কিছুর চেয়ে। তাঁর দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠযুগ তাঁর চক্ষুরই বাহন; তাঁর চক্ষুরই সংকল্প তাঁর ওষ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে।

বিশুদ্ধ দৃষ্টির তপস্যা ভারতবর্ষের পরে এক জার্মানীই করে এসেছে, তাই জার্মানীর উপর ভারতবাসীর এত পক্ষপাত। ভারতবর্ষের বাইরে মাত্র একটি ভারতবর্ষ আছে, যেখানে মানুষ ইংরেজের মতো নাগরিক মুক্তিকে কাম্য করেনি, একমনে কামনা করেছে আত্মার মুক্তি। তাই ইংরেজ ফরাসীরা যখন বড় বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলো, জার্মানরা তখনো দার্শনিক তর্কে মশগুল এবং সঙ্গীতের সম্মোহনে আবিষ্ট। হোহেন্‌জোলার্নরা জোর করে এদের ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়, বিসমার্ক এদের অত্যন্ত কেজো করে তোলেন। আধ্যাত্মিক একাগ্রতাকে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রয়োগ করে এরা অচিরাৎ এক বিভীষিকা হয়ে উঠল, যেন নৈমিষারণ্যের যোগীরা হঠাৎ ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করে মৃগয়ায় বাহির হলো। গত যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় তার মনে লাগেনি, কেননা আসলে ওটা হোহেন্‌-জোলার্নদেরই পরাজয়। জার্মানরা স্বভাবত যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র দাবী প্রত্যেক জাতিকেই কতকটা স্বভাবভ্রষ্ট হতে বাধ্য করছে, জার্মানীকেও। তাই জার্মানীর অতিকৃষ্ট মন যন্ত্র-শিল্পের দিকে ধাবিত হয়েছে।

* তাঁর অসংখ্য সুপাত্রীর কারুকে বিবাহ না করে মারিষ্টক্রাট্ তিনি বিবাহ করলেন কি না এক চাষানীকে, তাও বহুকাল একসঙ্গে বাস করবার পরে। এর অর্থ কি এই নয় যে তিনি চীনে মাটির পুতুলের কাছে যা পেতেন তার বেশী পেয়েছিলেন মাটির মেয়ের কাছে? প্রকৃতির হাতে গড়া প্রাণময়ী নারীর কাছেই মনোময় পুরুষের পরিপূরকতা।

যন্ত্রশিল্পে জার্মানীর উন্নতি যেমন অদ্ভুত তেমনি কিম্ভূত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছেলে গোয়েন্দা পুলিস হলে যেমন দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এও তেমনি। এর দয়া-মায়া নেই, রুচি-নীতি নেই। বার্লিন শহরটার মতো রাক্ষুসে শহর আমি দেখিনি। মানুষের একটা হাত যদি বাঘের একটা থাবা হয়ে ওঠে তবে ওটাকে ক্রমবিকাশ বলা চলে না। বার্লিনের প্রাণ আছে হৃদয় নেই, রুচি নেই, মাত্রা-জ্ঞান নেই।

বার্লিনের পেছনে দীর্ঘকালের ইতিহাস না থাকায় শহরটা কলকাতার মতো অনভিজাত। লণ্ডন প্যারিস রোম ভিয়েনা—এমন কি মিউনিক ফ্রাঙ্কফোর্ট ড্রেসডেন কোলোনের সঙ্গে ওর নাম করতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়ত, ওর সঙ্গে মানুষের মহত্ত্বের স্মৃতি জড়িয়ে নেই, জড়িয়ে রয়েছে মানুষের দস্যুতার স্মৃতি। হোহেন্‌জোলার্নরা বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করছেন ও তাঁদের শহরটাকে তাঁদের সৈন্যদলের মতো পিটিয়ে মজবুত করছেন। লণ্ডনের নগরবৃদ্ধেরা রাজাদের কাছ থেকে ক্রমাগত নতুন অধিকার আদায় করছেন, ইংলণ্ডের অন্য সর্বত্র যখন যথেচ্ছাচার চলিত ছিল একমাত্র লণ্ডন তখন নিজের নিয়মে নিজে চালিত। প্যারিস্‌ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী কোনোদিন ছাড়েনি, যদিও সে দাবী পূর্ণ হয়েছে কদাচিৎ। জার্মানীর "স্বাধীন নগরগুলো" লণ্ডন প্যারিসের মতো বৃহৎ না হলেও মহৎ। কিন্তু বার্লিন ছিল হোহেন্‌জোলার্নদের খাস সম্পত্তি, সবে সেদিন স্বাধীন হয়েই তার একমাত্র অভিলাষ দাঁড়িয়েছে আমেরিকান হয়ে ওঠা।

প্রাসিয়ানদের দেহের মতো মনও বোধ হয় অত্যন্ত ভারি। বার্লিন যেন একখানা রান্নাঘরের শিল, মাটির উপরে এমন চেপে বসেছে যে ভূমিকম্প হয়ে গেলেও নড়্‌বে না। খুব পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিতও বটে, কিন্তু জলদগম্ভীর। বার্লিন থেকে লাইপৎসীগে এলে মনটা প্রজাপতির মতো লঘুভার হয়ে উড়তে চায়। সঙ্গীতের রাজধানী—সুপ্রাচীন, সুপরিকল্পিত নাতিবৃহৎ। আধুনিকতার দাবী লাইপৎসীগও মেনেছে, কিন্তু ইহকালের জন্যেও পূর্বকাল খোয়ায়নি। লাইপৎসীগ ছাপার রাজধানীও বটে, কিন্তু ছাপাখানার নিনাদ সঙ্গীতকে ও ছাপাখানার কালি নগরসৌষ্ঠবকে ছাপাতে পারেনি।

ড্রেস্‌ডেনকে সুন্দর না বলে সুশ্রী বলা ভালো। আমাদের লক্ষ্ণৌএর সগোত্র।

ওর বাস্তুকলায় তেজ নেই, অলঙ্কার আছে। গির্জে এমন হওয়া উচিত যাতে প্রবেশ করবামাত্র মন ভক্তিতে ভরে উঠে, অহঙ্কার চোখের জলে গলে যায়, মেরীর মাতৃমূর্তি ও যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি জীবনকে বিষাদমধুর করে। ড্রেস্‌ডেনের ফ্রাউয়েন কির্‌খে তেমন গির্জে নয়। মূর্তি আছে বটে, কিন্তু তাতে মূর্ত হয়েছে শিল্পীর কিংবা শিল্পী যাদের ভৃত্য তাদের বাবুয়ানা। গির্জেতে মানুষের হাঁটু পাতবার কথা, কিন্তু থিয়েটারের মতো আয়েস করে বসবার আয়োজন করা হয়েছে উপরে নীচে। ড্রেস্‌ডেন কতকটা ভিয়েনার মতো। লাবণ্যকে এরা করে তুলেছে লালিত্য। পথেঘাটে ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু এমনি তার আড়ম্বরপ্রিয়তা যে কোনো কোনো স্থলে পাথরের উপর সোনার গিল্টি করা। ভঙ্গীতেও সরলতার বদলে সর্পিলতা। কিন্তু সর্বত্র একটি লঘুতা সুপরিলক্ষ্য। প্রাসিয়ার বিপরীত। পাথরের মূর্তি যেন মোমের মূর্তির মতো।

বার্লিন আমাকে হতাশ করেছিল, ড্রেস্‌ডেনও করল; ভ্রমণের খাতিরে ভ্রমণ করতে মোহভঙ্গ নেই, কিন্তু মরীচিকার সন্ধানে ভ্রমণ করা বিড়ম্বনা! কল্পনার আকাশে যা ফোটে মাটির কুসুমে তার আদল কোথায়? মানুষের কল্পনগরী কল্পনাতেই থাকে। তবু কোনো কোনো স্থান আমাকে কল্পনাতীত আনন্দ দিয়েছে। যেমন, প্যারিস, থুরিঙ্গিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া। কল্পনাকে যথাসম্ভব ফাঁকা রেখে বেড়ানো ভালো। তা হলে স্বপ্ন ছুটবে না, স্বপ্ন জুটবে।

কেন ড্রেস্‌ডেনকে সুন্দর বলে কল্পনা করেছিলুম? সেখানকার চিত্রশালায় রক্ষিত Sistine Madonnaর প্রতিলিপি দেখে। ফুল সুন্দর হলে ফুলদানীও সুন্দর হবে এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক। নইলে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয় না—বাস্তবে যাই হোক আদর্শে অসঙ্গতি আসে। ভেবেছিলুম ঐ একখানি ছবি যে সৌন্দর্য বিকীরণ করছে তাই দিয়ে ড্রেস্‌ডেন সুন্দর হয়ে গেছে। তা হয়নি। তবু সুখদৃশ্য হয়েছে, সেই অনেক।

Sistine Madonnaকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। বুঝেছি, মানুষ বংশানুক্রমে মরবে, কিন্তু এমন আনন্দকে মরতে দেবে না। রাজা গেছেন রিপাব্লিক এসেছে, সেও যাবে, কমিউন আসবে। কিন্তু যৌতুকরূপে যে নিধি

একদিন ইটালী থেকে ড্রেস্‌ডেনে এসেছিল পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ তাকে বাঁচিয়ে রাখবেই। রাফেল মানুষের দেশে সাঁইত্রিশ বছর মাত্র ছিলেন। তাঁর চেয়ে দীর্ঘজীবী লক্ষ লক্ষ ছিল ও আছে। কিন্তু সকলে যাকে মর্‌লেও মর্‌তে দেয় না সেই ভাগ্যবান অমর।

তুলি ও রঙ দিয়ে পটের উপর রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি কর্‌তে বিধাতাও পার্‌তেন না। গতিহিল্লোলময়ী ম্যাডোনার বসনের খস্‌ খস্‌ শুন্‌তে পেলুম। শিশু যীশুর সর্বাঙ্গের চপলতা চাউনিতে একীকৃত হয়েছে। তরুণী মা তাঁর দুরন্ত শিশুকে কোল থেকে নাম্‌তে দিচ্ছেন না, তাঁর চাউনিতে ভয়। দেবতা এখানে প্রিয় হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন।

ড্রেস্‌ডেন থেকে এল্‌বে নদী ধরে প্রাগ্‌ যাবার পথটি অতুলনীয়। নদীর বাঁধ যেন উঁচু হতে হতে পাহাড় হয়ে গেছে, তাও দেয়ালের মতো খাড়া। চেকোস্লোভাকিয়া ওরফে বোহেমিয়া পর্বত-বন্ধুর, যদিও প্রাগ অঞ্চলটি সমতল। প্রাগ্‌ নিজে বন্ধুর ও পাষাণ-পিহিত। প্রাগের বিশেষত্ব, প্রাগ্‌ প্রাচীন অথচ অত্যন্ত নবীন। কলকারখানাতে ও সুপরিপাটি বস্তীতে এর প্রাচীন অংশটি ঢাকা পড়ে গেছে। রাজপথের ভিড় ঠেলে (প্রাগের লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে স্বাধীনতার পর থেকে) পুরাতন শহরের খানিকটা দেখা যায়, কিন্তু প্রাগ্‌ যেমন কালের সঙ্গে তাল রেখে ছুটেছে মনে হয় অচিরেই আমেরিকান কলেবর ধারণ করবে।

চেক্‌রা দীর্ঘকাল নাবালক থাকার পর এই সেদিন আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, উৎসাহ তাদের তরুণ বয়সের অরুণ আভার মতো দিগ্‌দিগন্ত উৎসর্পী। অন্যান্য দেশের কোনোটাতে জেতার মোহভঙ্গ, কোনোটাতে পরাজিতের গ্লানি, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ায় ঊর্ধ্বপ্লাবী নির্ঝরের মতো আকাশের সঙ্গে কুস্তি কর্‌বার আগ্রহ। (চেক্‌দের এরোপ্লেন সংখ্যা অনুপাত-অতিরিক্ত।) বোহেমিয়া দেশটি পুরাতন হলেও চেক্‌রা নতুন জাতি, তাদের অতীত বড় নয় বলে তাদের ভবিষ্যতের উপর মন। এই কয়েক বছর তারা বৈষয়িক উন্নতি তো করেছেই শিক্ষা-দীক্ষায় ইউরোপকে নতুন আদর্শ দিয়েছে, নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে এবং

সঙ্গীতে তাদের এত একাগ্রতা দেখে মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে তাদের ভিতর থেকেই ইউরোপের গুণীদের আবির্ভাব হবে।

চেক্‌দের রক্ত নতুন, সেটা তাদের প্রথম সুবিধা। চেক্‌দের মনের জমিতে অষ্ট্রিয়ান-জার্মানরা ভাবের পলিমাটি বিছিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা তাদের পরম সুবিধা। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে দ্বিতীয়টা পেয়েছি, অথচ নিজেদের কাছ থেকে প্রথমটা পাই নি বলেই ভাবনা। এর প্রতিকার বর্ণসাঙ্কর্যের দ্বারা রক্তকে নতুন করা। সভ্যতার প্রাচীনতা ভালো জিনিস, কিন্তু রক্তে প্রাচীনতা মারাত্মক। রক্ত-কৌলীন্যের মোহে যে জাত মজেছে, তার সভ্যতাও মিউজিয়মের মমি হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভারতের নবীনতা আরো জরুরী। আমাদের অতীতের চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে যেদিন দীর্ঘতর বোধ হবে সেইদিন আমাদের নিশাস্ত হবে, আমরা প্রভাতের চাঞ্চল্য সর্বাঙ্গে অনুভব কর্‌ব। স্বাধীনতার বিপুল দায়িত্ব বইবার প্রসন্ন ধৈর্য সেই চাঞ্চল্যের আনুষঙ্গিক।

ন্যুর্নবার্গ সুন্দর। কিন্তু ন্যুর্নবার্গ একটি নয়, ন্যুর্নবার্গ দুটি। পুরাতন ন্যুর্নবার্গের সীমানার বাইরে নতুন ন্যুর্নবার্গ তার অসংখ্য কারখানায় ষ্টীম এঞ্জিন, মোটর গাড়ি, খেলার পুতুল তৈরী কর্‌ছে—পুরাতন ন্যুর্নবার্গ তার স্বকীয়তা রক্ষা করে পৃথিবীর চারুশিল্পামোদীদের তীর্থস্থলী হয়েছে। প্রাচীন রীতির বাস্তুগুলি তেমনি আছে। ভ্রম হয় এ কোন্ শতাব্দীতে এসে পড়লুম। দুর্গ-প্রাচীর, তোরণ, গম্বুজ, পরিখা বিংশ-শতাব্দীর বাস্তবের মাঝখানে মধ্যযুগের স্বপ্নকে ধরে রেখেছে, মধ্যরাত্রির স্বপ্নের জের মধ্যদিবায় চলেছে।

ন্যুর্নবার্গ যে দিক দিয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা চারুশিল্পের নয় যন্ত্রশিল্পের দিক। জার্মানীতে দেখা গেল, যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কেবল যে প্রয়োজনসিদ্ধির সম্বন্ধ আছে সে কথা সত্য নয়, যন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর মমতা আছে। জার্মানীতে যন্ত্রকে মানুষ ততখানি ভালোবেসে সেবা করে ইংলণ্ডে ঘোড়াকে যতখানি কিংবা ভারতবর্ষে গোরুকে যতখানি। বার্লিনের লোক যেন যন্ত্রের আত্মাকে দেখ্‌তে পেয়েছে, যন্ত্র যেন তাদের কাছে যন্ত্র নয়, আত্মীয়। আধুনিক

যুগে যন্ত্র যে সব সমস্যার সূত্রপাত করেছে তাতে যন্ত্রের প্রতি রাগ হবারই কথা। কিন্তু ও যে মানুষের আত্মজ। পুত্র কি পিতামাতাকে কম জ্বালাতন করে ?

হল্যাণ্ড আমাকে অবাক করেছে। দেশটি আমাদের যে কোনো একটা বড় জেলার চেয়ে বড় নয়। তবু তার সাম্রাজ্য আছে তার থেকে বহু সহস্র ক্রোশ দূরে। তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব—হল্যাণ্ড সমুদ্রকে পিছু হঠাতে লেগেছে। সমুদ্র হল্যাণ্ডের বেগার খেটে দিয়ে আসছে কবে থেকে। তার খালে জল ভরে দেয়, ক্ষেতে জল সেচ করে, তার অসংখ্য জাহাজকে পাণ্ডার মতো পৃথিবী পরিক্রমায় নিয়ে যায়। ইংরেজ সমুদ্রের কাছ থেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি আদায় করতে পারেনি, ওলন্দাজ তার বেশীর ভাগ ভূমি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছে।

হল্যাণ্ড এখন বিশ্বজনের শান্তিপঞ্চায়েৎকে চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে দিয়েছে। The Hague শুধু হল্যাণ্ডের রাজধানী নয়, আন্তর্জাতিক রাজধানীগুলোর অন্যতম। আমি যে সময় ছিলুম সে সময় ফরাসী-ইতালিয়ান্-বেল্‌জিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্নোডেনের বচসা চলছিল। হোটেলগুলোতে নানা নেশনের পতাকা উড়ছিল, সমুদ্রের কূলে লোকারণ্য। কত দেশের লোক! সমুদ্রকূলে স্ত্রী স্বাধীনতার মাত্রাটা কিছু বেশী হয়েই থাকে।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্ যেন প্যারিসের শহরতলী। ব্রাসেল্‌সের যেটুকু প্রাচীন সেইটুকু তার বিশেষত্ব। যেমন তার গির্জে এবং টাউন হল (Hotel de ville), প্রাচীন জার্মানীতে প্রতি নগরেই রাট্‌ হাউস ছিল, এগুলি সর্বজনীন ক্রিয়াকর্ম আমোদ-আহ্লাদ আহার-বিহারের কেন্দ্র। ইংলণ্ডের টাউন-হলগুলিতে নাচ গান হয়। আমরা টাউনহল করেছি কিন্তু বক্তৃতার জন্যে। আমাদের নগরগুলি কেন্দ্রহীন।

২০

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে যখন ইংলণ্ডের আকাশ বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, অষ্ট-প্রহর বৃষ্টি ও বৃষ্টির আনুষঙ্গিক শীত, তখনো ইটালীর আকাশ নীল নির্মেঘ সূর্য-করোজ্জ্বল। বনে বনে তখনো পাতা ঝরার দেরি। ছায়াতরুতলে রৌদ্রসমুজ্জ্বল

ধরণীকে তখনো আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয়।

ইটালী যেন আমাদের দেশ। সূর্য যে যে দেশের প্রতি সদয় তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল আছে। গাছপালার মতো মানুষও বেঁটে খাটো এবং প্রভূত সংখ্যক। নারীর মুখে সুকুমার কমনীয়তা এবং বেশে ও কেশে সেকেলে রীতি। ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী ভগবানের মতো সর্বত্র অবস্থিত। চর ও চোর পবনের মতো অদৃশ্য বিহারী। মানুষের মতো ও মদের মতো মাটিও রঙিন মেঘও রঙিন। কোথাও স্রোতবেগহীন নীলসলিল হ্রদের অঙ্কে সৌধশোভিত বিলাসদ্বীপ, হ্রদকে প্রায় বেষ্টন করেছে আল্পস্ পর্বতের শাখা-প্রশাখা। কোথাও দিগন্তপ্রসারী সমতল শস্যক্ষেত্র, তিন হাজার বছরের পুরাতন জমি, তার উপর দিয়ে কত যুগ-যুগান্তরের সৈনিক জয়যাত্রায় গেছে ও তার নীচে কত নগরী প্রোথিত হয়েছে। কোথাও ভগ্ন ক্রীড়াস্থলী, ভগ্নাবশিষ্ট স্নানাগার, ভাঙা মঠ, ভাঙা গির্জা। রাশি রাশি স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করছে। মানুষ তিন হাজার বছরের পাষাণময় চীৎকারে কর্ণক্ষেপ না করে একটা দু'দিনের পুরানো হাল্কা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাজ করছে। লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-মূর্তি দেশটাকে যেন মিউজিয়মে পরিণত করতে চায়, কিন্তু দেশ তাদের প্রতি দৃকপাত করছে না, বিদেশীরা করছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইটালীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করেছেন। আজকের ইটালী দেখলে কাল্কের ভারতবর্ষ দেখা হয়। ইটালী যথাসম্ভব তার স্বধর্মের অনুসরণ করছে। সে যে ইংলণ্ড নয় ইটালী এ-কথা যদি পদে পদে মনে রাখি, তবে ইংরেজের চোখে ইটালী দেখার মতো ভুল দেখা ও ইংরেজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ইটালীকে বিচার করার মতো ভুল বিচার ঘটে না। ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ রোমান ক্যাথলিক চার্চের বংশে জন্মেছে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। একচ্ছত্র অধিনায়কের আজ্ঞাধীন অক্ষৌহিণী ইটালীতে নতুন নয়। সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিকে বিলীন করা ইটালীয়ের চিরাভ্যাস। চার্চ যদি বহির্মুখীন না হতো তবে ইটালী গত সহস্র বৎসরে বহুধা বিভক্ত হতো না এবং আজ তার বিলম্বিত প্রতিকার স্বরূপ ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করত না।

তা করুক, কিন্তু নিজের ঘরের বাইরে পরের ঘরে পদক্ষেপ করতে চায় কেন? বিশ্ব শুদ্ধ সবাই ফাসিস্ট হতে যাবে কোন্ দুঃখে?

এর উত্তর, ইটালীয় চরিত্র বাঙালী চরিত্রের মতো। কল্পনাকে খাটো করলে বল পায় না। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার। কিন্তু বাঙালী চরিত্রে যা নেই কিংবা অল্প আছে, ইটালীয় চরিত্রে সেই অভিনয়শীলতা বিদ্যমান। ইটালীয়রা অভিনয়ের পোশাক পরে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালবাসে। তাদের চুল ছাটা ও টেরি কাটা, তাদের জুলপি ও ভুরু, অভিনয়ের মেক্ আপ। তাদের মুখের মাত্রাহীন অত্যুক্তি তাদের নিজেদের কানে সুধাবর্ষণ ও প্রাণে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করে। সত্যিই তারা জগৎ গ্রাসিতে আশয় করে নি, যদি বা করে থাকে তবে ও জিনিস তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না এ তারা মর্মে মর্মে জানে। তবু ও-কথা থিয়েটারী ঢঙে না বলতে পারলে তারা নিজেদেরকে কাপুরুষ জ্ঞান করে।

বাষ্প থেকে জল হয়, জল থেকে হয় বরফ। বরফের অবয়বে বাষ্পের আদল খুঁজলে নিরাশ হতে হয়। তেমনি আধুনিক ইটালীয়ের চরিত্রে রোমক চরিত্রের আদল। সে ওজস্ নেই, সে ঋজুতা শুধু ইটালীয় চরিত্র থেকে কেন, সভ্য মানবচরিত্র থেকে গেছে, এবং সেই শাসনকৌশল ইংরেজ চরিত্র আশ্রয় করেছে। কিন্তু ততঃ কিম্? মাৎসিনি, গারিবল্ডি, ক্রোচে ও দুজের (Duse) জাতিও নানাগুণে ভূষিত। একটি বৃহৎ আদর্শবাদ ইটালীয় চরিত্রের কোথাও উহ্য আছে। তারই বলে ধীরে ধীরে ইটালী জগৎ-সভায় আসন করে নিচ্ছে, কিন্তু এতটা ঢক্কা-নিনাদ সহকারে যে কান জানে ঢক্কাই সত্য।

যে ইটালী পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে সৌন্দর্যস্রষ্টারূপে শ্রেষ্ঠ এবং অমর সে ইটালী রোমক যুগের নয় আধুনিক যুগের নয়, সে ইটালী দান্তে পেত্রার্কা লেওনার্দো মিকেলাঞ্জেলোর মায়াময় যুগের, যে যুগে রোমান্স ছিল মানুষের জীবনবস্তু। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে ও ব্রাউনিঙের কাব্যে আমরা তার আলেখ্য দেখছি। একই মানুষ পাথর কেটে মূর্তি গড়ছে, প্রাচীরগাত্রে ছবি আঁকছে, শব ব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব চর্চা করছে, নগররক্ষী সৈন্যের নায়ক হচ্ছে, নির্বাসিত হয়ে নানা সঙ্কটের আবর্তে পড়ছে। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'।

এদের প্রেম-কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি বীরত্বপূর্ণ তথা করুণ। আমাদের যুগে সৌন্দর্য সৃষ্টির স্রোত আবর্জনায় মন্থর, নানা জটিল থিওরীর কচকচি শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্তিকে ব্যাহত করছে। মধ্যযুগের সহৃদয়তার পরিবর্তে আধুনিক যুগের সমস্তিষ্কতা হয়েছে শিল্পসৃষ্টির কষ্টিপাথর। মধ্যযুগে সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব ছিল শিল্পী-মাত্রের কাম্য, আমাদের যুগের শিল্পী কেবলমাত্র শিল্পী হয়েই ক্ষান্ত। সেইজন্যে শিল্পে জীবনের সবটার ছাপ পড়ছে না, জীবনে সুগোল সুডৌল রূপটিকে শিল্পের খর্বহীন আলিঙ্গনে আঁটছে না।

মধ্যযুগের ইটালী ধর্মপ্রাণও ছিল। তার সাক্ষী ভারতবর্ষের মতো ইটালীর সর্বঘটে। কিন্তু এই ধর্মপ্রাণতা কেমন সঙ্কীর্ণ ছিল তার একটি নমুনা রোমে পাওয়া যায়। রোমক যুগের সরল উন্নত নিরীশ্বর মন্দিরগুলিকে ভেঙে তাদের থেকে পাথর খুলে নিয়ে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। সে-সব ক্যাথিড্রাল যদি সুন্দর হতো তবে অপরাধের মার্জনা থাকত, কিন্তু দুটি একটিকে বাদ দিলে রোমের বাকী সমস্ত গির্জা জাঁকজমকের জোরে দর্শকের চক্ষুপীড়ন করে এবং লক্ষ লক্ষ ধর্মভীরু তীর্থযাত্রীর মনে সম্ভ্রম জাগায়। ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল তস্করের নয় শিল্পীর কীর্তি। মিলানের ক্যাথিড্রাল বিরাট গম্ভীর বহুশীর্ষ বহুমুখ। ভেনিসের ক্যাথিড্রাল সাড়ম্বর প্রাচ্য-প্রভাব সম্পন্ন।

ভেনিসের গৌরবের দিনে ভেনিস ভাবীকালের জন্যে এমন কিছু রেখে যায়নি যার জন্যে ভাবীকাল তার প্রতি সশ্রদ্ধ হতে পারে। তবে ভেনিস্ নিজেকে দিয়ে গেছে, সে দান সামান্য নয়। সমুদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সেই মাটির উপর ভেনিসের প্রতিষ্ঠা, তার পেছনে সাধনা ছিল এবং সাধনার সম্মান করতে হয়। চন্দ্রালোকিত ভেনিসের খালে খালে গন্দোলায় আন্দোলিত হয়ে আনন্দ আছে, কিন্তু দুর্গন্ধের ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ভেনিসের যৌবনকালে ভেনিস্ কেমন রঙ্গিনী ছিল অনুমান করতে পারি সুসজ্জিত গন্দোলায় নৃত্যগীতের আয়োজন থেকে ও গন্দোলার সঙ্গে গন্দোলার গতি-প্রতিযোগিতা থেকে। গন্দোলায় করে এক বাড়ির থেকে আরেক বাড়িতে ও এক পাড়ার থেকে আরেক পাড়ায় যাবার মোহ উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি কলের গন্দোলা দেখা দিয়েছে। সে

গন্দোলার চলায় ছন্দ নেই, ধীরতা নেই, গাম্ভীর্য নেই। ভেনিসের গন্দোলিয়েরা খাসা মানুষ। তাদের পেশা ও প্রকৃতি বদলালে ভেনিসের অঙ্গহানি ঘটবে। কিন্তু যে নগরী মৃতা তার অঙ্গহানি ঘটলেই বা কী, না ঘটলেই বা কী।

ফ্লোরেন্স এখনো বেঁচে। এখনো সেখানে ও তার অনতিদূরে জীবন্ত শিল্পীরা বাস করে। কিন্তু মৃত শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, না কতকটা তাদের নকল ও বাকীটা তাদের শ্রাদ্ধ করে? ফ্লোরেন্সের মাটির উপরে সৌন্দর্যের খনি। এককালে এ নগরী কেমন "পুষ্পিত" ছিল, কল্পনা করেও আনন্দ, আবার তার এত কিছু স্মারক রয়েছে যে প্রত্যক্ষ করেও আনন্দ। পাছে জার্মানরা লুঠ করে নিয়ে যায় সেই ভয়ে মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা প্যারিস থেকে মোনালিসা ও ভিনাস্ ডি মাইলোকে দক্ষিণ ফ্রান্সে সরিয়ে ফেলে। কিন্তু শত্রু যদি ফ্লোরেন্স আক্রমণ করে তবে তার আগে ফ্লোরেন্সের কয় সহস্র শিল্পসৃষ্টি সরানো সম্ভব হবে? বোধ করি তাই ভেবে সেকালের শিল্পীরা ফ্লোরেন্স রক্ষার জন্যে অস্ত্রহস্তে দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াত।

রোমকে কেন Eternal City বলে তার অর্থ বুঝি, যখন জানি কুলাম পাহাড়ের পিঠে দাঁড়িয়ে রোমের ভিতর ও বাহির পরিক্রমা করি। অনেকগুলি পাহাড় পাহারা দিচ্ছে। কম নয়, তিন হাজার বছরব্যাপী পাহারা। কত দিগ্বিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে, তার পরে বীর এসেছে, নগরী উৎসব-প্রমত্তা ও বিনিদ্রা হয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, এই প্রহরীদের স্মরণে সে সব যেন সেদিনের কথা। একদিন বিজেতারা কতকগুলি খ্রীষ্টান দাস নিয়ে এল। দাসদের ধর্মকে উপহাস করল। বাঘ সিংহদের সামনে দাসদের ছেড়ে দিয়ে তাদের মরণ তামাসা দেখলে। ক্রমে একদিন সম্রাট হলেন খ্রীষ্টান। রাষ্ট্র হলো খ্রীষ্টান। রাজগুরুই হলেন রোমের মালিক। রোমকে কেন্দ্র করে তাঁর দূতেরা ইউরোপের সকল রাজ্যে চারিয়ে গেল, প্রথমে রাজাদের ও পরে প্রজাদের দীক্ষা দিল। এবার রোমের পর্বতপ্রহরীরা দেখল আরেক রকম দিগ্বিজয়ের উৎসব। রোমের পোপ হলেন খ্রীষ্টীয় জগতের পিতা। এককালে যেমন উচ্চাভিলাষীরা সীজার হবার জন্যে তপস্যা ও চক্রান্ত করত, আরেক কালে তেমনি পোপ হবার

জন্যে উঠে পড়ে লাগল। ইউরোপ উজাড় করে যাত্রীরা চল্‌ল রোমের অভিমুখে। তাদের জন্যে ক্যাথিড্রাল খাড়াহলো,সহস্র যুবক সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তাদের জন্যে মঠ তৈরী হলো। দাসদের যাজক প্রাসাদবাসী হয়ে বিস্তীর্ণ জমিদারীর উপর রাজগিরিও করলেন। ভাটিকানো অলঙ্করণ করতে বড় বড়শিল্পীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এলো। রোমের প্রহরীরা আরেক রকম দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হলো।

পোপ যখন থেকে কেবলমাত্র ইটালীর না হয়ে খ্রীষ্টীয় জগতের হলেন তখন থেকে ইটালীর আত্মা প্রতিভূ হারিয়ে রোমের বাইরে ছোট ছোট নগরে ও প্রদেশে প্রতিনিধি খুঁজতে ও পেতে থাক্‌ল। যে ইটালী ধ্যানী ও প্রেমিকদের মনে আইডিয়ারূপে ছিল, নেপোলিয়নের নিষ্ঠুর হস্ত ও কাভুরের চতুর মস্তিষ্ক তাকে মূর্তিমতী করল। মুসোলিনির কাণ্ড দেখে সন্দেহ হচ্ছে সে মূর্তি শিবানী না বানরী, কিন্তু মাৎসিনীর মানসী চিরকাল ভাবলোকে থাক্‌বেন না, ভাবী-কালের আদর্শবাদী এই অসম্পূর্ণ মূর্তিকে নিজের হাতে বাটালি দিয়ে কুঁদে তার মধ্যে সেই মানসীকে অবতরণ করাবে।

২১

ইউরোপ থেকে বিদায়ের দিন নিকট হয়ে এল। দীর্ঘ দুই বছর পরে আমার বিরহী বন্ধুটি তার সুখনীড়ে ফিরছে। ইউরোপ ছিল তার নির্বাসনভূমি। তাই বিদায় দিনটি তার মুক্তির দিন। কিন্তু আমার ?

ইউরোপকে আমি না দেখতেই ভালোবেসেছিলুম, দেখেও ভালোবাসলুম। ইউরোপ আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে এসেছে—অন্য কথায়, চিরকাল ভালোবেসে এসেছে। ইউরোপ থেকে বিদায় আমার পক্ষে বিরহের শেষ নয়, শুরু।

তাই কখনো চোখের পাতা আর্দ্র হয়, কখনো বুকের কাঁপন তীব্র হয়। মনটা বিশ্বাস করতে চায় না যে বিদায়ের দিন সত্যিই আসবে—"একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ।" বিদায়ের ভাবনা যথাসাধ্য ভুলে থাকলুম। তবু যখনি মনে পড়ে যায় তখনি আমার ইটালী-বিহার করুণ হয়ে ওঠে। আহা, আবার কবে দেখব—যদি বেঁচে থাকি, যদি পাথেয় জোটে, যদি এই ভালোবাসা এমনি

থাকে। এতগুলো যদির উপর হাত চলে না গো ইউরোপা। মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা ও দেশের সঙ্গে ভালোবাসা এ দুইয়ের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। তুমি যেখানে থাক্‌লে সেইখানেই থাক্‌লে। মানবী হলে নিশ্চয়ই আমার দেশে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতে। তা যখন তুমি পার্‌বে না তখন আমাকেই আসতে হয়। অন্তত বল্‌তে হয় যে আবার আস্‌ব।

বল্‌লুম, আবার আস্‌ব, ভয় কী! কতই বা দূর! জলপথে পনেরো দিন, স্থলপথে বারো দিন, আকাশপথে সাত দিন মাত্র। কিছু না হোক্, মনের পথে এক মুহূর্ত।

বললুম ওকথা। তবু জানতুম ওকথা মিথ্যা। জীবনে ফিরে আসা যায় না। একবার মাত্র আসা যায় এবং সেই আসাই শেষ আসা। আবার যদি আসি তবে দেখ্‌ব সে ইউরোপ নেই। সেই পুরাতন পদচিহ্ন ধরে মার্সেল্‌স্ থেকে প্যারিস্, প্যারিস্ থেকে লণ্ডন যাব। লণ্ডনের গলিতে গলিতে বেড়াব। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে সুইজার্লণ্ডে, জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়ায়, হাঙ্গেরীতে ও চেকোস্লোভাকিয়ায় স্মৃতির দাগে দাগা বুলাব। ইটালী প্রদক্ষিণ করে চেনা জিনিসগুলিকে খুঁজে বের কর্‌ব। দুটি বছর কাটবে দুটি বছরের পুনরাবৃত্তি করতে। চাইনে নতুন দেখ্‌তে নতুন করে দেখ্‌তে। আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের এই আমি আমার শ্রেষ্ঠ আমি। এই দুটি বছরে যা পেলুম তার বেশী এ জীবনে পাওয়া যাবে না। এই বা ক'জন পায়? এত জ্ঞান এত মান এত প্রীতি এত মমতা। চক্ষু যত দেখ্‌ল লেখনী তার ভাষা পায়নি, আভাস দেবার সাধনা করেছে। শ্রবণ যত শুন্‌ল স্মরণ রাখ্‌তে পারল না।

স্মৃতির দাগ আপনি মুছে যায়। স্মৃতির পথ বেয়ে কত পথিকের আনাগোনা, তাদের চরণতল মৃত্যুর মতো নির্দয়। তবু যদি স্মৃতির দাগ ধরে যাওয়া সম্ভব হয় তবে কোন ইউরোপকে দেখ্‌ব? ইউরোপ তো শুধু স্থান নয়, দৃশ্য নয়, সে মানুষ— ইউরোপের মানুষ। সেই মানুষগুলি কি আমার অপেক্ষায় অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে অচঞ্চলভাবে আমার স্মৃতিনির্দিষ্ট স্থানে কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা টম্‌টম্ হাঁকিয়ে কেউ বা ঠেলাগাড়ি ঠেলে কেউ বা বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে?

পদে পদে পরিবর্তনশীল ইউরোপ। ততোধিক পরিবর্তনশীল মানুষের জীবন যৌবন জীবিকা ও প্রেম। স্মৃতিতে যাদের যে সময়ের যে অবস্থার ফোটো রইল তারা যদি বা জীবিত থাকে তবু তাদের সে বয়স আর থাক্‌বে না, তাদের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল তাদের নাম ঠিকানা আমি হাজার মাথা খুঁড়লেও পাব না। রাইন নদী চিরকাল থাক্‌বে, স্টীমারও তাতে চল্‌তে থাক্‌বে। কিন্তু সেই যে মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী হয়েও মুখে রঙ্‌ মেখেছিল তাকে তার প্রেমিকের স্কন্ধলগ্নরূপে আরএকটিবার দেখ্‌তে পাব কি? না যদি পাই তবে রাইনের উভয়তটের গিরিদুর্গ তেমন সুদৃশ্য বোধ হবে না। লোরেলাইয়ের মায়া-সঙ্গীত শুনে নাবিকেরা যেখানে প্রাণ দিত সেখানে আমার বুকের স্পন্দন হঠাৎ স্থির ও তার পরে প্রবল হয়ে উঠ্‌বে না।

এমনি কত দৃশ্য অঙ্গহীন মনে হবে। সেইজন্যে কি মার্সেল প্রুস্ত্‌ বহির্জগতের প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে স্বেচ্ছাবন্দীরূপে অবস্থান কর্‌তেন? আমাকেও তা হলে শপথ করতে হয় যে আর ইউরোপ আস্‌ব না, পাছে প্রিয়বরাকে অঙ্গহীনা দেখি, পাছে পরিচিতাকে অপরিচিতা বলে ভুল হয়। সে ভুলের সংশোধন নেই। বিরহের পরে প্রত্যেক প্রেমিককে ভয়ে ভয়ে প্রিয়ার দিকে চাইতে হয়—সে মোটা বা রোগা হয়ে যায়নি তো? অপরে তার মন চুরি করেনি তো? নানা অভিজ্ঞতার চাপে পূর্বস্মৃতি কি তার মনে কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে?

একদিন ঘুম থেকে জেগে দেখলুম চারিদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের একটি মাত্র পরিচয় সে সমুদ্র। সে যে ভূমধ্যসাগর ওকথা তার গায়ে লেখা নেই। চীনের সাগরও হতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার সাগরও হতে পারে।

মাটি যে আমাদের কত বড় আশ্রয়স্থল সমুদ্রের উপর অসহায়ভাবে ভাসমান না হলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমুদ্রের কূলে বসে সমুদ্রকে দেখে এক মহান ভাবে আপ্লুত হই, কিন্তু দিনের পর দিন যখন দশদিকের নয়দিকে কেবল সমুদ্রই দেখি আর দশম দিকে দেখি সমুদ্র-বিগলিত আকাশ তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। তবু সঙ্গে লোকজন থাকে বলে ভরসা থাকে। বাইরে যত বড় বিপদ হাঁ করে থাকুক

না কেন ভিতরে তাস খেলার বিরাম নেই, কখনো নাচ চলেছে কখনো বাজি রেখে নকল ঘোড়দৌড়। ঠিক যেন কোনো একটা হোটেলে বাস করছি, পরস্পরের অতি কাছাকাছি, অথচ কারো সঙ্গে কারো গভীর সম্বন্ধ নেই। খাচ্ছি দাচ্ছি গল্প করছি হাসি তামাসায় যোগ দিচ্ছি চট্‌ছি ও মন খারাপ করছি—তবু জানি এ দু'দিনের খেলা। একটা কৃত্রিম অবস্থার চক্রান্ত। ভূপৃষ্ঠে কেউ সমস্তক্ষণ হোটেলেও থাকে না, একাদিক্রমে এত রকম মানুষের সংস্রবেও আসে না, এদের সঙ্গে জীবনের অভিনয়ও করে না। ভূপৃষ্ঠে যা বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে অথচ অল্পসংখ্যক প্রকৃত বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে সত্য, জাহাজে তা সত্যের নকল। তাই জাহাজী সামাজিকতার কথা মনে পড়লে হাসি পায়, ও সম্বন্ধে অত সিরিয়াস না হলেই ঠিক্ হতো।

ইউরোপের অধিকার যখন ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে শেষ হলো তখন ক্রমাগত মনে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের স্মৃতি সযত্নে ভুলেছিলুম, পাছে পুরাতনের মাথায় নূতনকে অবহেলা করি, অতীতের রোমন্থন করতে বর্তমানের স্বাদ না নিই। এখন তো ইউরোপ হলো অতীতের, এবং বর্তমানের জাহাজী জীবন বিস্বাদ লাগছে—এখন ভারতবর্ষ আমাদের সোনার ভবিষ্যৎ, আমি তারই ধ্যান করব।

ভারতবর্ষের এমন একটি মূর্তি দেখতে পেলুম যা একমাত্র আমার মতো মানুষই দেখতে পায়—আমার মতো যে মানুষ ভারতবর্ষকে জন্মসূত্রে ও ইউরোপকে প্রেমসূত্রে চিনেছে, যে মানুষের মন উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে উভয়ের যথার্থ পরিমাণ জেনেছে। সকল কলহ-কোলাহলের ঊর্ধ্বে ভারতবর্ষ তাঁর যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর নিমীলিত নেত্রে হাসির দ্যুতি, প্রাপ্তির আনন্দ তাঁর পার্থিব অভাবকে তুচ্ছ করেছে, সুন্দরী ইউরোপা তার যৌবনের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নূপুর বাজাচ্ছে, তাঁর মন পাচ্ছে না। পাবে, যদি পার্বতীর মতো তপশ্চারিণী হয়। ইউরোপকে ভারতবর্ষের যোগ্য হতে হবে। নইলে সে কেবল ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে বাঁধতে ও বিচার করতে থাকবে এবং সেই কল্পিত আত্মপ্রসাদে স্ফীত হতে থাকবে।

বম্বেতে যখন নামলুম তখন ভারি মিষ্টি লাগ্‌ল মারাঠা কুলিদের কর্মকালীন গোলযোগ। যাই দেখি তাই মিষ্টি লাগে। গাছতলায় মানুষে গোরুতে ছাগলে মিলে শুয়ে আছে। হিন্দু নাপিত মাটিতে বসে মুসলমানকে ক্ষৌরি করে দিচ্ছে। কাছা-দেওয়া মারাঠা মেয়ে মাথায় বিরাট বোঝা ও বগলে শিশু নিয়ে দৃপ্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পথ চল্‌ছে। গুজরাটী মেয়ে ব্রীড়ায় ললিতগতি। ভারতবর্ষে সব প্রদেশের পুরুষ বম্বের রাজপথে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। সকলে সমান গম্ভীর, শান্ত, আত্মস্থ। ভারতবর্ষ এ কী নূতন রূপে দেখা দিল!

ভারতবর্ষে ফিরলুম, কিন্তু এ কোন্ ভারতবর্ষ! যাকে রেখে গেছলুম সে নেই। নবীন ভারতবর্ষ আমাকে না দেখে না জেনে আমার অভাব বোধ না করে কোন্ ফাঁকে জন্মেছে ও বেড়েছে। না সে আমাকে চেনে, না আমি তাকে চিনি। তার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, পাছে তার আত্মাভিমানে ঘা দিয়ে ফেলি। তার কঠিন কথা শুনে মর্মাহত হলে চল্‌বে না। ঘরে তোলার আগে আমাকে পরখ করার অধিকার তার আছে। আমি আগন্তুক। সে গৃহস্বামী।

পুরাতন বন্ধুরা বলে, "কই, কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখছি না তো? যেমন ছিলে তেমনটি আছ!"—যেন মস্ত একটা পরিবর্তন ওরা আমার আকৃতিতে ও আচরণে প্রত্যাশা করছিল; নিরাশ হলো। আমি বলি, "তা হলে তো আমাকে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ। আমি ভেবে মর্‌ছি কী কর্‌লে তোমাদের মন পাব।"

কিন্তু সত্যই সহজ নয়। আমি তো জানি সেই আমি নই। দুটি বছরে প্রত্যেক মানুষের জীবন এক থেকে আরেক হয়ে ওঠে, প্রতিদিন দেখি বলে কোনোদিন লক্ষ্য করিনে। আমার সম্বন্ধে ওদের এবং ওদের সম্বন্ধে আমার ঐ প্রতিদিন দেখাটুকু ঘটেনি বলে অন্তরে অন্তরে আমরা পর হয়ে পড়েছি। দুটো মহাদেশের ব্যবধান সেই বিচ্ছেদকে ঘোরালো করেছে। দু'বছর চোখের আড়ালে বেড়েছি, এইটে প্রধান। দু'বছর বিলেতে থেকেছি, এটা অপ্রধান। কিন্তু কষ্ট করে ওরা বলে বসে, "একেবারে সাহেব বিলেতী হয়ে ফিরেছে!

আমাদের সঙ্গে মিলবে কেন ?"

বিলেত-ফের্তারা যে নিজেদের মধ্যে একটা সমাজ কিংবা সম্প্রদায় কিংবা আড্ডা রচনা করে সেটা এই দুঃখে। এরাও ভুলতে পারে না ওরাও ভুলতে পারে না কয়েক বছর ও কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। তার উপর বিলেত-ফের্তারা সাধারণত ধনী কিংবা উচ্চপদস্থ হয়ে থাকে, অবস্থার ব্যবধান মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ভালোবাসে। বিলেতের সমাজেও ভারত-ফের্তাদের এককালে "নবাব" হতো। ইদানীং তাদের অবস্থার বিপর্যয় হয়েছে বলে তাদের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে পরিহাস করা হয়। ক্রমশ ইঙ্গবঙ্গদের কপালেও পরিহাস জুটছে।

কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইউরোপ। মাঝখানে আরব, তুর্কী, পারস্ত, আফগানিস্থান ইত্যাদি কত দেশ পড়ে রইল। বিধাতা কার সঙ্গে কাকে বেঁধে দিলেন। পরিহাসই করো আর নেতৃত্বই দাও আমাদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়তেই থাকবে। ভাবী ভারত ইউরোপে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ যুবক পাঠাবে ও তারা ফিরলে তাদেরকে ঘরে তুলবে। আমরাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পূর্ব-পুরুষ। সেইজন্মে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকব। শুধু দু'তিন বছর ইউরোপে গিয়ে ফুর্তি করে ফেরা নয়। আমাদের কাজ ইউরোপে ভারত-বর্ষকে ও ভারতবর্ষে ইউরোপকে প্রকৃত ও প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত করা। আমরা দুই মহাদেশের নুন খেয়েছি। দুই মহাদেশের কত লোক আমাদের প্রাণরক্ষা করেছে, আমাদের সেবা করে মূল্য গ্রহণ করেনি, আমাদের পরমাত্মীয় হয়ে দান-প্রতিদানের উর্ধ্বে উঠে গেছে। আমরাও যেন নিন্দা বিদ্বেষ ঘৃণা-অবজ্ঞার উর্ধ্বে উঠে উভয় মহাদেশকে নিকট থেকে নিকটতর করে বিধাতার অভিপ্রায়কে সফল করে তুলি।

যেদিন আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতাতে। দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে দেশের মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর। দেশ দেখতে

ভালো লাগে না, যদি দেশের মানুষকে ভালো না লাগে। কে যেন বলেছেন, দেশের সব সুন্দর, কেবল মানুষ কুৎসিত।" তিনি দূর থেকে মানুষকে দেখে ও কথা বলেছেন, কাছে গিয়ে দেখেননি। যে দেশে যাও সে দেশে দেখ্‌বে মানুষে চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, মানুষের সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগে বুঝি বাকি সব সুন্দ হয়েছে। প্রকৃতি মানুষের হাতে গড়া প্রতিমা না হোক মানুষের প্রাণের র রসায়িত এবং ধ্যানের দ্বারা প্রভাবিত। প্রকৃতি তো মানুষেরই প্রতিকৃতি, বিশেষ করে ইউরোপে।

ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। ইউরোপকে আমি বল্‌ব মহামানবের মানস সরোবর। সাগরে যেমন সকল প্রবাহিণী মিলি হয়, মানস সরোবর থেকে তেমনি সকল প্রবাহিণী নির্গত হয়। ইউরোপের মান থেকে যুগে যুগে কত ভাবধারা মিশ্রিত হয়ে পৃথিবীকে ভাবোর্বরা করেছে পৃথিবী নিজেই তো পৃথিবীর প্রতি ইউরোপের দান, কারণ পৃথিবী ইউরোপে আবিষ্কার। কেই বা জেনেছিল আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকার অস্তিত্ব পৃথিবীর আকার আকৃতি গতি ও অবস্থান ইউরোপই আমাদের জানালে আমরা পরলোকের নাড়ী-নক্ষত্র জান্‌তুম কিন্তু যে-লোকে জন্মেছি তার সম্বন্ধে জোর এই জান্‌তুম যে সেটাকে একটা সাপ নিজের ফণার উপরে অতি ব্যালান্স করে একটা হাতীর পিঠের উপর অতি কষ্টে টাল সাম্‌লাচ্ছে।

সত্যের একটি বিন্দুও নষ্ট হবার নয়। ইউরোপের সত্য ভারতবর্ষকে কর্‌তেই হবে, ভারতবর্ষের সত্য ইউরোপকে। দেশে দেশে জাতিতে জাতি মহামিলনের লগ্ন আসবেই। কালোহ্যয়ং নিরবধি। আজো যা আসেনি কো একদিন তা আসবে বলেই আজ আসেনি। কিন্তু সে আমাদের সকলের ভাব সকলের স্বপ্ন। আমার একার নয়। আমি ভাবি আমার কবে ইউরোপের স মিলিত হব, কথা রাখ্‌ব!

দিনের পর দিন যায়। ইউরোপের স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকে। সত্যি! কোনোকালে ইউরোপে ছিলুম?

(১৯২৭-২৯)